SAHITYA SARA

OR

TYPICAL SELECTIONS

FROM

BENGALI PROSE

FROM THE EARLIEST TIMES TO THE PRESENT

WITH A SHORT HISTORY OF THE BENGALI LANGUAGE AND LITERATURE.

For the use of

Normal, Vernacular and English Schools

COMPILED BY

NRISINHA CHANDRA MUKHERJI M. A.

Third Edition.

সাহিত্যসার।

অর্থাৎ

বাঙ্গালা গদ্যসংগ্রহ।

(বাঙ্গালা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সমেত)

নর্ম্মাল বর্ণাকুলর ও ইংরাজী স্কুলের জন্য

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল,

সংগৃহীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

CALCUTTA.

Printed and Published by B.L. Chakravarti.

The New School-Book Press.

1882.

বিজ্ঞাপন।

সাহিত্যসার প্রকাশিত হইল। ইহাতে বাঙ্গালা গদ্যের প্রারম্ভাবধি অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রকার রচনাপ্রণালীর উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কিঞ্চিদধিক এক শত বৎসর অতীত হইল, বাঙ্গালা গদ্যের লিখিত প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। ইহার কতদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালা গদ্যের প্রথম সমুদ্ভব হয়, তাহার স্থির নিশ্চয় নাই। তবে যতদূর অনুমান করিতে পারা যায়, তাহাতে এইমাত্র প্রতীয়মান হয় যে, বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি অবধি ইহার গদ্যের ও সমুদ্ভব হয়। কিন্তু ইহার লিখিত প্রচার কিঞ্চিৎ ন্যূন একশত বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে এক শত বৎসরের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন রচনাপ্রণালীর উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই গদ্যসমূহের মধ্যে যে গুলি সহজ সুন্দর ও বালক বালিকাদিগের পাঠোপযোগী বোধ হইয়াছে, সেই গুলিই উদ্ধৃত করিয়াছি। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ সংগ্রহ-গ্রন্থ অধিক নাই। যে দুই এক খানি আছে, তাহাতে রীতিমত প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত নানাবিধ রচনার উদাহরণ নাই। কিন্তু এরূপ না হইলে সংগ্রহ গ্রন্থ প্রণয়ন করিবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল বলিতে পারা যায় না। একাধারে সকল প্রকার রচনার উদাহরণ প্রদত্ত না হইলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রন্থ পাঠ করাই বিধেয়। আমি এই উদ্দেশ্যসাধনের উদ্দেশে যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়াছি, কিন্তু কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের বিষয়

বিশেষ রূপে অবগত করাইবার অভিপ্রায়ে ইহার উপক্রমণিকা-বিভাগে এই বিষয়ের পুরাবৃত্তঘটিত একটী সংক্ষিপ্ত প্রস্তাব রচনা করিয়া দিয়াছি। এটী পাঠ করিলে সুকুমারমতি বালক-বালিকারা বাঙ্গালা ভাষার পুরাবৃত্তের বিষয় এক প্রকার অবগত হইতে পারিবে। প্রাচীনতম রচনাগুলি অপেক্ষাকৃত কঠিন, অতএব শিক্ষক মহাশয়েরা ইচ্ছা করিলে ঐ গুলি শেষে পড়াইতে পারেন।

পরিশেষে, যে সকল মহোদয়দিগের রচনা হইতে আমি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাঁহাদিগের নিকট আনন্দসহকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। তাঁহাদিগের প্রতি আমার অগণ্য ধন্যবাদ। ইতি

৯ ই জানুয়ারি }
১৮৭৫ }

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

সাহিত্যসার দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হইল। এবারে ইহা সবিশেষ যত্ন সহকারে সংশোধন করিয়াছি। দুই একটী বিষয় অপেক্ষাকৃত কঠিন ও অনাবশ্যক বোধ হওয়াতে উহাদের পরিবর্ত্তে কয়েকটী নূতন ও আবশ্যক বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইতি ১ লা এপ্রেল ১৮৭৭

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র শর্ম্মা।

সাহিত্যসার।

উপক্রমণিকা।

বাঙ্গলা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বাঙ্গলাদেশের প্রাকৃতিক সীমাচতুষ্টয়ের অন্তবর্ত্তী প্রদেশসকলের অধিবাসীরা যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে, তাহারই নাম বাঙ্গলা ভাষা। "বঙ্গ" এই সংস্কৃত নামের অপভ্রংশে "বাঙ্গলা" এই শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহাদ্বারা আপাততঃ এরূপ সংস্কার হইতে পারে, যে "বঙ্গ" এই দেশবাচক নামটী যতকালের, বঙ্গদেশপ্রচলিত আধুনিক ভাষাও তদ্রূপ প্রাচীন হইবে। কিন্তু এরূপ সংস্কার ভ্রান্তিমূলক। বঙ্গদেশ এই নামটী বহুকাল অবধি বিদ্যমান আছে। প্রায় দুই তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বের রচিত গ্রন্থাদিতেও বঙ্গদেশের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বাঙ্গলা ভাষা তদপেক্ষা অনেক আধুনিক। কত দিন পূর্ব্বে ও কি প্রকারে এই ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে

তাহা নির্ণয় করিবার প্রকৃত উপায় কিছুই নাই। তবে এসম্বন্ধে যাহা কিছু নির্দ্দেশ করা যায়, সমুদয়ই অনুমানমূলক। অনেকে অনুমান করেন, যে বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা অক্ষর উভয়ই এক সময়েই উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। একথা যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই প্রতীতি হয়। আমাদের অনেকানেক তন্ত্রশাস্ত্রে বাঙ্গলা বর্ণমালার সবিস্তর বর্ণনা আছে। কতকগুলি তন্ত্র নিতান্ত আধুনিক বটে, কিন্তু আবার কতকগুলি ৭। ৮ শত বৎসর পূর্ব্বের রচিত, এবং ঐ সকল তন্ত্রেও বাঙ্গলা অক্ষরের উল্লেখ আছে। সুতরাং বাঙ্গলা ভাষা যে অন্ততঃ ৭। ৮ শত বৎসর পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা এক প্রকার নির্ব্বিবাদে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। লক্ষ্মণসেন ও বল্লালসেন প্রভৃতি গৌড়ীয় রাজারা প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। অদ্যাপি মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগের প্রদত্ত দান ও অনুশাসনপত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎসমুদায় দেবনাগর ও বাঙ্গলার মধ্যবর্ত্তী এক প্রকার অক্ষরে লিখিত। এতদ্দ্বারা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে যে, উহাঁদের সময়ে অর্থাৎ এখন হইতে প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষা ও অক্ষরের সূত্রপাত হইয়া থাকিবে।

বাঙ্গলা একটী স্বতন্ত্র ভাষা, না অন্য কোন ভাষার অপভ্রংশে বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, এ বিষয়ের মীমাংসা সহজেই হইতে পারে। বাঙ্গলা একটী স্বতঃসিদ্ধ ভাষা নহে, ইহা সংস্কৃত ভাষা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ফলতঃ সংস্কৃতই যবনভাষাব্যতীত ভারতবর্ষপ্রচলিত অন্যান্য যাবতীয় ভাষারই

মূল ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তবে বাঙ্গলা, হিন্দী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, উড়িয়া প্রভৃতি আধুনিক ভাষাসকল সাক্ষাৎসম্বন্ধে সংস্কৃত হইতেই উৎপন্ন নহে। বোধ হয় সংস্কৃত ভাষা কোন কালেই আপামর সাধারণ সকলেরই কথাবার্ত্তা কহিবার ভাষা ছিল না। পণ্ডিত ও উচ্চতর শ্রেণীস্থ লোকেরাই সংস্কৃতে কথা-বার্ত্তা কহিতেন। স্ত্রীলোক ও আপামর সাধারণ সকল লোকে সংস্কৃতানুযায়ী অপর একটী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত। ঐ সর্ব্ব-সাধারণ ভাষার নাম প্রাকৃত ভাষা। প্রাকৃত ভাষাও সংস্কৃতেরই অপভ্রংশে উৎপন্ন। প্রাকৃত ভাষাও বহুকালের প্রাচীন ভাষা। বোধ হয় সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে অন্য প্রকার ভাষার প্রচার ছিল। সেই ভাষারই সংস্কার করিয়া সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি হয়, ও তাহার কিছুকাল পরেই সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারার্থ প্রাকৃত ভাষার সৃজন হয়। এই প্রাকৃত ভাষার সহিত বাঙ্গলা, হিন্দী, উড়িয়া প্রভৃতি তাবৎ অধুনাতন ভাষার এতদূর ঘনিষ্ঠতা লক্ষিত হয়, যে প্রাকৃত ভাষা হইতেই সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে এই সমস্ত ভাষার উৎপত্তি ইহা নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হয়। বাঙ্গলার বর্ণমালাও দেবনাগরের রূপান্তরমাত্র। বাঙ্গলা-ভাষায় এরূপ কথা অনেক আছে, যাহা সংস্কৃত ও প্রাকৃত কোন ভাষা হইতেই উৎপন্ন নহে। "ধুচনি" "কুলা" প্রভৃতি বাক্য ইহার দৃষ্টান্তস্থল। ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে প্রাকৃত ভাষা ও তৎকালপ্রচলিত পার্ব্বতীয় আদিমনিবাসী-দিগের কোনপ্রকার ভাষা এই উভয়ের পরস্পর সংস্রবে বাঙ্গলা

তাহা নির্ণয় করিবার প্রকৃত উপায় কিছুই নাই। তবে এসম্বন্ধে যাহা কিছু নির্দ্দেশ করা যায়, সমুদয়ই অনুমানমূলক। অনেকে অনুমান করেন, যে বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা অক্ষর উভয়ই এক সময়েই উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। একথা যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই প্রতীতি হয়। আমাদের অনেকানেক তন্ত্রশাস্ত্রে বাঙ্গলা বর্ণমালার সবিস্তর বর্ণনা আছে। কতকগুলি তন্ত্র নিতান্ত আধুনিক বটে, কিন্তু আবার কতকগুলি ৭। ৮ শত বৎসর পূর্ব্বের রচিত, এবং ঐ সকল তন্ত্রেও বাঙ্গলা অক্ষরের উল্লেখ আছে। সুতরাং বাঙ্গলা ভাষা যে অন্ততঃ ৭। ৮ শত বৎসর পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা এক প্রকার নির্ব্বিবাদে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। লক্ষ্মণসেন ও বল্লালসেন প্রভৃতি গৌড়ীয় রাজারা প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। অদ্যাপি মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগের প্রদত্ত দান ও অনুশাসনপত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎসমুদায় দেবনাগর ও বাঙ্গলার মধ্যবর্ত্তী এক প্রকার অক্ষরে লিখিত। এতদ্দ্বারা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে যে, উহঁাদের সময়ে অর্থাৎ এখন হইতে প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষা ও অক্ষরের সূত্রপাত হইয়া থাকিবে।

বাঙ্গলা একটী স্বতন্ত্র ভাষা, না অন্য কোন ভাষার অপভ্রংশে বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, এ বিষয়ের মীমাংসা সহজেই হইতে পারে। বাঙ্গলা একটী স্বতঃসিদ্ধ ভাষা নহে, ইহা সংস্কৃত ভাষা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ফলতঃ সংস্কৃতই যবনভাষাব্যতীত ভারতবর্ষপ্রচলিত অন্যান্য যাবতীয় ভাষারই

মূল ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তবে বাঙ্গলা, হিন্দী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, উড়িয়া প্রভৃতি আধুনিক ভাষাসকল সাক্ষাৎসম্বন্ধে সংস্কৃত হইতেই উৎপন্ন নহে। বোধ হয় সংস্কৃত ভাষা কোন কালেই আপামর সাধারণ সকলেরই কথাবার্ত্তা কহিবার ভাষা ছিল না। পণ্ডিত ও উচ্চতর শ্রেণীস্থ লোকেরাই সংস্কৃতে কথা-বার্ত্তা কহিতেন। স্ত্রীলোক ও আপামর সাধারণ সকল লোকে সংস্কৃতানুযায়ী অপর একটী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত। ঐ সর্ব্ব-সাধারণ ভাষার নাম প্রাকৃত ভাষা। প্রাকৃত ভাষাও সংস্কৃতেরই অপভ্রংশে উৎপন্ন। প্রাকৃত ভাষাও বহুকালের প্রাচীন ভাষা। বোধ হয় সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে অন্য প্রকার ভাষার প্রচার ছিল। সেই ভাষারই সংস্কার করিয়া সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি হয়, ও তাহার কিছুকাল পরেই সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারার্থ প্রাকৃত ভাষার সৃজন হয়। এই প্রাকৃত ভাষার সহিত বাঙ্গলা, হিন্দী, উড়িয়া প্রভৃতি তাবৎ অধুনাতন ভাষার এতদূর ঘনিষ্ঠতা লক্ষিত হয়, যে প্রাকৃত ভাষা হইতেই সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে এই সমস্ত ভাষার উৎপত্তি ইহা নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হয়। বাঙ্গলার বর্ণমালাও দেবনাগরের রূপান্তরমাত্র। বাঙ্গলা-ভাষায় এরূপ কথা অনেক আছে, যাহা সংস্কৃত ও প্রাকৃত কোন ভাষা হইতেই উৎপন্ন নহে। "ধুচনি" "কুলা" প্রভৃতি বাক্য ইহার দৃষ্টান্তস্থল। ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে প্রাকৃত ভাষা ও তৎকালপ্রচলিত পার্ব্বতীয় আদিমনিবাসী-দিগের কোনপ্রকার ভাষা এই উভয়ের পরস্পর সংস্রবে বাঙ্গলা

ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। মুসলমানদিগের বাঙ্গলাদেশ অধিকার করিবার সময় বাঙ্গলাভাষার, বাল্যকাল। সুতরাং মুসলমানদিগের ভাষা হইতেও অনেকানেক কথা বাঙ্গলাভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। "দপ্তর" "জমি" "আইন" প্রভৃতি বাক্য মুসলমানদিগের ভাষা হইতে গৃহীত। এক্ষণে ইংরাজশাসনের অধীনে "চেয়ার" "গেলাস" "বাক্স" প্রভৃতি অনেক ইংরাজী শব্দও ইহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পুষ্টিসাধন করিতেছে।

অনেকে বলিয়া থাকেন, প্রাকৃত হইতে হিন্দী ও হিন্দী হইতে বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত তাঁহারা বলেন যে, বাঙ্গলা ভাষার সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তারা যেরূপ ভাষা প্রয়োগ করিতেন তাহাতে হিন্দীর ভাগ অধিকাংশ। কিন্তু ইহা দ্বারা কখনই সিদ্ধান্ত হইতে পারে না যে, বাঙ্গলা ভাষা হিন্দী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যে সকল প্রাচীন গ্রন্থকার বহুলপরিমাণে হিন্দী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের সমকালীন অন্যান্য গ্রন্থকর্ত্তারা আবার হিন্দী শব্দ অতি অল্প মাত্রায় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তৎকালে রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক গ্রন্থাদি লিখিতে হইলে অধিক পরিমাণে হিন্দী শব্দ ব্যবহার করাই রীতি ছিল। কারণ এরূপ গ্রন্থ ভিন্ন অন্য কোন বিভিন্নবিষয়ক গ্রন্থেই হিন্দীর তাদৃশ প্রাচুর্ভাব দেখা যায় না। ইহা ব্যতীত বাঙ্গলা ও হিন্দী এই উভয়ের ব্যাকরণাদিগত বিভিন্নতার বিষয় পর্য্যালোচনা

করিলেও আমাদেরই অনুমান যুক্তিসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে

বাঙ্গলা ভাষার তিনকাল বা অবস্থা।

বাঙ্গলার উৎপত্তিকাল অবধি অধুনাতন কালপর্য্যন্ত তাবৎ কালকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া তদনুসারে ভাষার, শৈশব, বাল্য ও প্রৌঢ় অবস্থার নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বাঙ্গলা ভাষার প্রথম সংঘটন হইতে চৈতন্যদেবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ইংরাজী ১৪৮৫ পর্য্যন্ত আদ্যকাল। চৈতন্যের সময় হইতে ভারতচন্দ্র রায়ের পূর্ব্ব অর্থাৎ ইং ১৭৫২ অব্দ পর্য্যন্ত সমুদয়কাল মধ্যকাল। আর ভারতচন্দ্রের সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত সময়কে ইদানীন্তন কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। নিম্নে এই তিন কালের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইতেছে।

আদিমকাল।

আদিমকালে বাঙ্গলাভাষার কিরূপ অবস্থা ছিল বিশেষ জানিবার উপায় নাই। তৎকালে দুইজন গ্রন্থকারের লিখিত গ্রন্থ ভিন্ন অন্যান্য গ্রন্থ পাওয়া যায় না। সকল ভাষারই নিয়ম এই, গদ্যরচনার পূর্ব্বে পদ্য রচিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত, লাটিন, গ্রীক প্রভৃতি তাবৎ ভাষাতেই এই নিয়ম। বাঙ্গলা-ভাষাও এই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত নহে। এক্ষণে আদ্য-

কালের যে দুই একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়, তৎসমুদয়ই পদ্যে রচিত। গদ্যরচনা না দেখিতে পাইলে কোন ভাষারই বিশেষ তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। কারণ গদ্যরচনায় ভাষার প্রকৃতি যেরূপ বিবৃত হয়, পদ্যরচনায় তাহা হয় না। পদ্যরচনা সম্পূর্ণরূপে ভাষাবিষয়ক নিয়মসমূহের অনুসরণ করে না, বরং অনেক স্থলেই উহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই আদ্যকালের বাঙ্গলার প্রকৃতি বিশেষরূপে অবগত হইবার উপায় নাই। কারণ তৎকালীন যে কয়খানি গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, সমুদয়ই পদ্যে রচিত। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বাঙ্গলাভাষায় পুরুষপরীক্ষা নামে যে গ্রন্থখানি প্রচলিত আছে, উহা বাঙ্গলার আদিকবি বিদ্যাপতির রচনা। কিন্তু পুরুষপরীক্ষার ভাষা দেখিলে কখনই ওরূপ অনুমান হইতে পারে না। পরন্তু আমরা বিশেষ অনুসন্ধানপূর্ব্বক অবগত হইয়াছি যে, বিদ্যাপতি সংস্কৃতভাষায় পুরুষপরীক্ষা নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এখনকার প্রচলিত বাঙ্গলা পুরুষপরীক্ষা ঐ সংস্কৃত গ্রন্থেরই অনুবাদ। বাঙ্গলা পুরুষপরীক্ষা ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের অধ্যক্ষগণের নিয়োগানুসারে হরপ্রসাদ রায় নামক কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক প্রণীত হইয়া ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত হয়।* এতাবতা সপ্রমাণ হইতেছে যে, আদিমকালে বাঙ্গলাগদ্যে বোধ হয় কোন গ্রন্থই রচিত হয় নাই। তৎকালের লোকে বাঙ্গলা গদ্যে কথাবার্ত্তা কহিত এই মাত্র।

---

* কলিকাতা রিভিউ ১৩ ভলম, ১৮৯ পৃষ্ঠা।

আদিমকালের রচনার মধ্যে বিদ্যাপতি ঠাকুর ও চণ্ডীদাস এই উভয়ের প্রণীত কতকগুলি পদাবলী অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রায় এক সময়েই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বাঁকুড়া বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্যে কোন স্থানে ইহঁাদের জন্ম হয়। চৈতন্যদেবের প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে ইহাঁরা বর্ত্তমান ছিলেন।

আদিমকালের ভাষা কিরূপ ছিল তাহা অনুমান করা সহজ নহে, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। তবে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনাদৃষ্টে এই পর্য্যন্ত বোধ হয় যে, তৎকালীন বাঙ্গলা অধুনাতন বাঙ্গলা হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন ছিল। তৎকালে এখন অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে হিন্দীশব্দ ভাষার অন্তর্ভূত ছিল। সে সময়ে বাঙ্গলার ব্যাকরণ না থাকাতে রচনার পরিপাটী ছিল না, পয়ার ও ত্রিপদী ভিন্ন অন্য কোন ছন্দই তৎকালে বর্ত্তমান ছিল না, এ সকল মধ্য ও ইদানীন্তনকালের সৃষ্টি। ফলতঃ অধুনাতন ভাষা হইতে তদানীন্তন ভাষার যে কত প্রভেদ ছিল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। নিম্নে আদিকালিক রচনার একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে।

"সখি কি পুছ্ছসি অনুভব মোর।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নূতন
হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত
ভেল।

সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু শ্রুতিপথে পরশ না
গেল ॥
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়ায়নু না বুঝিনু কৈছন
কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখিনু তবু হিয়া জুড়ন না
গেল ॥
যত যত রসিক জন রসে অনুগমন অনুভব কাহুনা
পেখ।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলিল এক ॥”

মধ্যকাল।

চৈতন্যদেবের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতচন্দ্র রায়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাবৎকাল মধ্যকাল বলিয়া পরিগণিত। চৈতন্য-দেব ১৪৮৫ খৃঃ অব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়া ১৫৩৩ অব্দে লোকান্তর গমন করেন। নবদ্বীপ চৈতন্যদেবের জন্মস্থান। চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্ত্তয়িতা। ইনি সংসারবিরাগী হইয়া সন্ন্যাসা-শ্রম গ্রহণপূর্ব্বক দেশে দেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার করিয়া জীবন অতিবাহিত করেন। চৈতন্যদেব জাতিভেদ স্বীকার করিতেন না। ইহাঁর মৃত্যুর পর ইহাঁর শিষ্যগণ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার করেন। ইহাঁরা চৈতন্য প্রভুর জীবনবৃত্ত অবলম্বনপূর্ব্বক বাঙ্গলাভাষায় অনেকানেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ফলতঃ চৈতন্যদেবের শিষ্য ও অনুশিষ্যদিগের নিকট বাঙ্গলাভাষা

অনেকাংশে ঋণী, এমন কি, অনেকে এই সময়কেই বাঙ্গলা-ভাষার প্রকৃত আদিকাল অর্থাৎ উৎপত্তির কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উল্লিখিত বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে তিন জন প্রধান গ্রন্থকার ছিলেন। জীবগোস্বামিপ্রণীত কড়চা, বৃন্দাবনদাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত ও কৃষ্ণদাস কবিরাজবিরচিত চৈতন্যচরিতামৃত এই তিন খানিই অদ্যাপি বৈষ্ণবতন্ত্রের পরমারাধ্য গ্রন্থ। চৈতন্যের মৃত্যুর সময় হইতে আরম্ভ করিয়া অনুমান ইং ১৫৭৩ অব্দের মধ্যে উক্ত গ্রন্থসকল রচিত হয়। উল্লিখিত ও অন্যান্য তাবৎ বৈষ্ণব গ্রন্থই চৈতন্যদেবের জীবনবৃত্তাদিবর্ণনায় পরিপূর্ণ। ইহাদিগের ভাষা যদিও তাদৃশ সুন্দর ও মনোহর নহে, কিন্তু ইহাদিগের নিকট বাঙ্গলাভাষা অনেকাংশে ঋণী। অনেকে উক্ত গ্রন্থাদির প্রাদুর্ভাবের কালকেই বাঙ্গলাভাষার উৎপত্তির প্রকৃত কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মধ্যকালে আর আর যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হয়, তন্মধ্যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কাশীরামদাসের মহাভারত, রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর, কালীকীর্ত্তন প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। কৃত্তিবাস ফুলিয়ানামক গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি আনুমানিক ১৫৭৭ খৃঃ অব্দে রামায়ণ রচনা করেন। রামায়ণের ভাষা নিতান্ত প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহিণী। দুর্ভাগ্যক্রমে এক্ষণে বিশুদ্ধ রামায়ণ গ্রন্থ পাওয়া যায় না। মুদ্রাকর ও প্রকাশকদিগের দোষে উহা এক্ষণে প্রকৃত অবস্থায় নাই। যিনি যেরূপ ইচ্ছা করিয়াছেন

পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছেন। কৃত্তিবাসের পর চণ্ডীরচয়িতা মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী প্রাদুর্ভূত হয়েন। কৃত্তিবাসের ন্যায় ইহাঁরও সময়নিরূপণ করা সহজ ব্যাপার নহে। ইহাঁর গ্রন্থপাঠে এই মাত্র অবগত হওয়া যায় যে, ইনি বাঁকুড়া বা মেদিনীপুর জেলার অধিবাসী রঘুনাথ রায় নামক কোন রাজোপাধিক ভূস্বামীর সভাপণ্ডিত ছিলেন। এই রঘুনাথ রায়ের সময় অনুসারে বোধ হয় কবিকঙ্কণ খৃঃ ১৫৭৩ অব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৬০৩ অব্দ পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে প্রদুর্ভূত হন। চণ্ডীর ভাষা ভাবপূর্ণ ও সুমধুর হইলেও কৃত্তিবাসের রচনার ন্যায় প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য নহে। ইহার অনেক স্থানে অনেক দুরূহ সংস্কৃত শব্দ ও বাঙ্গলা অপভ্রংশ শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, কবিকঙ্কণ চণ্ডী যে বাঙ্গলাভাষার একখানি প্রধান প্রাচীন গ্রন্থ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহা পাঠ করিলে তদানীন্তন কালের রীতি নীতি আচার ব্যবহারের বিষয় অনেক জানিতে পারা যায়। চণ্ডীরচনার কিছুকাল পরেই ক্ষেমানন্দনামক কোন কবি মনসার ভাষান নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ অদ্যাপি সাদরে পঠিত হইয়া থাকে। ক্ষেমানন্দের পরেই কাশীরাম দাস মহাভারত রচনা করেন। ইনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ইন্দ্রাণীনামক পরগণায় কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁদের পূর্ব্ববর্ত্তী কৃত্তিবাস প্রভৃতির ন্যায় ইহাঁরও প্রকৃত সময় নিরূপণ করিবার কিছুমাত্র উপায় নাই। অনুসন্ধান করিয়া যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহাতে

বোধ হয় ইনি এখন হইতে প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কাশীরাম একজন প্রকৃত কবি ছিলেন, তিনি আপন গ্রন্থে তাঁহার কবিত্বের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। মহাভারতের ভাষা রামায়ণ ও চণ্ডীর ভাষা অপেক্ষা অনেকাংশে মার্জ্জিত। ইহাদ্বারা স্পষ্টই বোধ হয়, কাশীরামের সময় হইতে বাঙ্গলা ভাষার অপেক্ষাকৃত অধিক অনুশীলন আরম্ভ হয়। কাশীরামের প্রায় ৮০ বৎসর পরে রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য নামক এক জন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ শিবসঙ্কীর্ত্তন নামক শিবলীলাবিষয়ক এক গ্রন্থ রচনা করেন, ইহাঁর পর রামপ্রসাদ সেন প্রাদুর্ভূত হন। শিবসঙ্কীর্ত্তনরচয়িতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন এক সময়েরই লোক ছিলেন। তবে রামেশ্বর রামপ্রসাদ অপেক্ষা অধিকবয়স্ক ছিলেন। হালিসহর গ্রামে বৈদ্যকুলে রামপ্রসাদের জন্ম হয়। রামপ্রসাদ বাল্যকালে সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হন। তিনি চিকিৎসাব্যবসায় অবলম্বন করেন নাই। কিঞ্চিৎ বয়ঃক্রম হইবার পর কলিকাতাবাসী কোন ধনীর ভবনে মুহুরিগিরি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তিনি বিষয়কর্ম্মে তাদৃশ মনোনিবেশ করিতেন না। তাঁহার মন নিরন্তর পরমার্থচিন্তাতেই ব্যাপৃত থাকিত। দৈবক্রমে তাঁহার প্রভু তাঁহার মনের ভাব ও কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে মাসিক ৩০ টাকা বৃত্তিস্বরূপে দান করিতে অঙ্গীকার করিয়া অনুক্ষণ অভীষ্ট পরমার্থ চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে অনুরোধ করিলেন। ইহার পর রামপ্রসাদ গীত ও

পুস্তক রচনায় ব্যাপৃত থাকিয়াই জীবন অতিবাহিত করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় রামপ্রসাদের কবিত্বশক্তিতে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে কবিরঞ্জন উপাধি ও ১০০ বিঘা নিষ্কর ভূমি প্রদান করেন। রামপ্রসাদ সেনের অসাধারণ কবিত্বশক্তি ছিল। তিনি তৎপ্রণীত বিদ্যাসুন্দর, কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন ও পদাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে তাহার সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন।

চৈতন্যদেবের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া রামপ্রসাদ সেনের সময় পর্য্যন্ত তাবৎকাল মধ্যকাল বলিয়া পরিগণিত। আদি-কাল অপেক্ষা মধ্যকালের ভাষা অনেক মার্জ্জিত ও বিষদ। কিন্তু মধ্যকালে ও পদ্যভিন্ন গদ্যগ্রন্থ পাওয়া যায় না। সুতরাং ভাষার প্রকৃত অবস্থা বিশেষরূপে অবগত হইবার উপায় নাই। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে ত্রিপুরার রাজাবলী ও রামরাম বসুর প্রণীত প্রতাপাদিত্যচরিত এই দুই খানি গদ্যগ্রন্থ মধ্য-কালেই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ উহার একখানিও পাওয়া যায় না। তবে মধ্যকালে যে গদ্যগ্রন্থ লিখিবার সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পরে ক্রমশঃ গদ্যের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা জন্মে ও ইদানীন্তনকালে ক্রমশঃ ইহার সমূহ উন্নতি হইতেছে। ফলে গদ্যরচনাবিষয়ে আদিকাল ও মধ্যকাল এই উভয়ের মধ্যে কোন বিশেষ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না। এই কালে পূর্ব্বাপেক্ষা ছন্দের অনেক উন্নতি হয়। মধ্য-কালের রচনাপ্রণালী ও ভাষা কিরূপ তাহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত নিম্নে কয়েকটী উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে।

"এইরূপ কর্ণপূর লিখে স্থানে স্থানে।
প্রভুকৃপা কৈলা যৈছে রূপসনাতনে ॥
মহাপ্রভুর যত বড় বড় ভক্ত মাত্র।
রূপসনাতন সবার কৃপাগৌরব পাত্র ॥
কেহ যদি দেশ যায় দেখি বৃন্দাবন।
তারে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ ॥"

ইত্যাদি

চৈতন্যচরিতামৃত।

"বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে।
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে।
কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ।
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ ॥
মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী।
লুকাইয়া আছেন লক্ষ্মণ দেখ দেখি ॥
গোদাবরীনীরে আছে কমল কানন।
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ ॥
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া।
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া ॥"

কৃত্তিবাস-রামায়ণ।

"বসিয়া চণ্ডীর পাশে কহে দুঃখবাণী,
ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর তালপাতের ছাউনী।

ভেরেণ্ডার খুঁটী তার আছে মধ্যঘরে,
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে।
বৈশাখে বসন্ত ঋতু খরতর খরা,
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা।
পদ পোড়ে খরতর রবির কিরণ,
শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঞার বসন।
বৈশাখ হইল বিষ, বৈশাখ হইল বিষ,
মাংস নাহি খায় লোকে করে নিরামিষ!"

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

"কেহ বলে ব্রাহ্মণেরে না কহ এমন,
সামান্য মনুষ্য বুঝি না হবে এ জন।
দেখি দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি,
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি।
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা,
নখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা।"

কাশীদাস-মহাভারত।

" গিরিবর! আর আমি পারিনে হে প্রবোধ দিতে
উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তনপান, নাহি খায়
ক্ষীর ননী সরে॥
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী, বলে উমা ধরে
দে উহারে।

কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি, মায়ে উহা
সহিতে কি পারে ॥”

রামপ্রসাদ সেনের কালীকীর্ত্তন।

ইদানীন্তন কাল।

কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর হইতে আরম্ভ করিয়া অধুনাতন সময় পর্য্যন্ত ইদানীন্তন কাল। এই কালেই বাঙ্গলা-ভাষার প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ হইয়া উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে। যদিও বাঙ্গলাভাষা ইহার অনেককাল পূর্ব্ব অবধি কথোপকথনের ভাষা ছিল, তথাপি বাঙ্গলা গদ্যরচনার প্রতি লোকের তাদৃশ আস্থা ছিল না। সুতরাং এতদিন ভাষার উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধির দ্বার উদ্ঘাটিত হয় নাই। কিন্তু ভারতচন্দ্রের পর হইতে ক্রমশঃ গদ্যরচনার সবিশেষ প্রাচুর্ভাব হইতে আরম্ভ হয়। ক্রমে ইংরাজ মিসনরী ও দেশীয় মহাপুরুষগণের যত্নে বাঙ্গলা গদ্যে অনেকানেক পুস্তক ও পত্রিকা প্রচারিত হয়। এই সময়েই বাঙ্গলাভাষার ব্যাকরণ সর্ব্বপ্রথম লিখিত হয়। রাজা রামমোহন রায় ও শ্রীরামপুরের মিসনরীগণ সর্ব্বপ্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন। কিন্তু বাঙ্গলাভাষার প্রকৃত সংস্কার অতি অল্পদিন হইয়াছে বলিতে হইবে। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ই এই সংস্কারের প্রবর্ত্তয়িতা। ইহাঁর পূর্ব্বে বাঙ্গলাগদ্য অতিশয় কদর্য্য অবস্থায় ছিল, ইনিই উহার প্রকৃত সংস্কার করিয়া উন্নতির পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। এক্ষণে বাঙ্গলা-

ভাষার যে দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তজ্জন্য বিদ্যাসাগরকে অগণ্য ধন্যবাদ দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। বিদ্যাসাগরের পরেই অক্ষয়কুমার দত্ত, রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকানেক মহাত্মা বাঙ্গলাভাষার সম্যক্ শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছেন ও অদ্যাপি করিতেছেন। ফলতঃ এক্ষণে আমাদের ভাষা যেরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় ভবিষ্যতে ইহা প্রকৃতরূপে উজ্জ্বল ও উন্নত হইয়া দেশবিখ্যাত হইয়া উঠিবে।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, ভারতচন্দ্রের সময় হইতেই ইদানীন্তন কালের আরম্ভ। কবিবর ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ সেনের সমকালেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী ভুরসুট পরগণার মধ্যে পেঁড়োনামক গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ব্রাহ্মণকুলে মুখোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ভারত বাল্যকালে সংস্কৃত ও পারসী ভাষা অধ্যয়নপূর্ব্বক উহাতে বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়াছিলেন। হুগলীতে মুন্সীবাবুদিগের বাটীতে অবস্থানপূর্ব্বক পারসীভাষা অধ্যয়নকালে ইনি ত্রিপদীছন্দে সত্যনারায়ণবিষয়ক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করেন। এই তাঁহার সর্ব্বপ্রথম রচনা। যৎকালে সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করেন, তখন ভারতের বয়ঃক্রম পঞ্চদশবর্ষ মাত্র হইয়াছিল। হুগলী হইতে বাটী প্রত্যাগমন করিবার পর ভারত কিছুদিন বর্দ্ধমানে অবস্থিতি করেন। তাহার

পর ভ্রাতৃবর্গের অনুচিত ব্যবহারে উৎপীড়িত হইয়া সংসার পরিত্যাগ করিবার উদ্দেশে কটক প্রভৃতি নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। কিছুদিন পরে তদানীন্তন ফরাসী গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও কবিত্বশক্তিদর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র ভারতের প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মাসিক ৪০ টাকা বেতনে আপনার অন্যতম সভাসদ্ নিযুক্ত করিলেন, ও "গুণাকর" উপাধি প্রদান করিলেন। ভারতচন্দ্র এইরূপে কৃষ্ণনগরবাসী হইলেন। কৃষ্ণনগরে থাকিয়াই তিনি অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি রচনা করেন। ১৬৭৪ শকে অন্নদামঙ্গল রচিত হয়, ও ইহার কিছুদিন পরেই রসমঞ্জরী নামক অপর একখানি গ্রন্থ রচিত হয়। আট বৎসর কাল কৃষ্ণনগরে বাস করিবার পর ৪৮ বৎসর বয়সে ১৬৮২ শকাব্দে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয়। এক্ষণে বাঙ্গলাভাষা যে এতদূর মার্জ্জিত ও পরিষ্কৃত হইয়া আসিয়াছে, ভারতচন্দ্রই তাহার মূল। ভারতের ভাষা অতি সুললিত ও মনোহর। তাঁহার কবিত্বশক্তি ও বিলক্ষণ ছিল। ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদামঙ্গলে বিলক্ষণ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। ইনি নানাবিধ নূতন ছন্দ বাঙ্গলায় প্রণয়ন করিয়াছেন। নিম্নে ভারতচন্দ্রের লেখার একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

"ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী,
বুঝহ ঈশ্বরি! আমি পরিচয় করি।

বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি,
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী।
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত,
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত।
পিতামহ দিলে মোরে অন্নপূর্ণা নাম,
সকলের পতি তেঁই পতি মোর বাম।"

"শিবের কপালে রয়ে, প্রভুরে আহুতি লয়ে,
না জানি বাড়িল কি বা গুণ।
একের কপালে রহে, আরের কপাল দহে,
আগুনের কপালে আগুন।
অরে নিদারুণ প্রাণ, কোন্ পথে পতি যান,
আগে যা রে পথ দেখাইয়া!
চরণ রাজীবরাজে, মনঃশিলা পাছে বাজে,
হৃদে ধরি লহরে বহিয়া।"

ইত্যাদি।

অন্নদামঙ্গলের অব্যবহিত পরেই উলাগ্রামনিবাসী দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উহাতে ভগীরথকর্ত্তৃক গঙ্গার পৃথিবীতে আনয়ন সবিস্তরে বর্ণিত আছে। যদিও গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীগ্রন্থে উৎকৃষ্ট কবিত্বশক্তির কিছুমাত্র পরিচয় নাই, তথাপি উহা মনসার ভাসান প্রভৃতির ন্যায় সাদরে পঠিত ও গীত হইয়া থাকে। দুর্গাদাস এখন হইতে প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

যৎকালে গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী প্রচারিত হয়, তখন ইংরাজেরা বাঙ্গলা, বিহার, ও উড়িষ্যার দেওয়ানী ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তৎকালে তাঁহাদের বাঙ্গলাভাষা শিক্ষা করিবার বিশেষ প্রয়োজন হয়। এই শিক্ষাসূত্রে উক্ত ইংরাজ মহাপুরুষদিগের দ্বারা আমাদের ভাষার সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠে। এই সময়কেই বাঙ্গলাগদ্যরচনার আদিকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও করা যাইতে পারে।

১৭৭৮ খৃঃ অব্দে পণ্ডিতবর হালহেড সাহেব সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলাভাষার একখানি ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। হালহেড ও উইলকিন্স এই দুই মহোদয়ের প্রযত্নে ঐ সময়েই শ্রীরামপুরে একটী মুদ্রণযন্ত্র সংস্থাপিত হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই করষ্টার সাহেব লর্ড কর্ণোয়ালিসকর্ত্তৃক সংগৃহীত আইন সকলের বাঙ্গলা অনুবাদ করেন, ও বাঙ্গলাভাষায় সর্ব্বপ্রথম অভিধান প্রস্তুত করেন। ইহার পর কিছু দিন বিলম্বে মার্সমান, কেরী প্রভৃতি মিসনরী মহোদয়গণ খৃষ্টধর্ম্মের বহুলপ্রচার করিবার উদ্দেশে অনেকানেক বাঙ্গলা পুস্তক রচনা করেন। ১৮০০ খৃঃ অব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ সংস্থাপিত হয়। ঐ সময় ঐ বিদ্যালয়ে ব্যবহারার্থ কয়েক জন সাহেব ও বাঙ্গালীমহোদয় কর্ত্তৃক কয়েক খানি বাঙ্গলা পুস্তক রচিত হয়। উক্ত পুস্তকসমূহের মধ্যে পুরুষপরীক্ষা ও মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার প্রণীত প্রবোধচন্দ্রিকা এই দুইখানি গ্রন্থ সর্ব্বপ্রধান। এই সকল গ্রন্থে যদিও নানাবিধ প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবেশিত আছে, যথার্থ বটে, কিন্তু এই গুলির ভাষা ও রচনাপ্রণালী কোন

মতে রুচিকর নহে। প্রবোধচন্দ্রিকার রচয়িতা মৃত্যুঞ্জয় উৎকল-দেশীয় লোক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার লিখিত বাঙ্গলাকে কিরূপে বিশুদ্ধ বাঙ্গলা রচনা বলা যাইতে পারে? ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে প্রবোধচন্দ্রিকা প্রথম মুদ্রিত হয়। এই সময়েই মার্সমান প্রভৃতি মহোদয়দিগের চেষ্টায় বাঙ্গলাভাষায় সাময়িক পুস্তক ও পত্রিকা প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। ১৮১৬ খৃঃ অব্দে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্যক্তি বেঙ্গলগেজেট নামে এক সাময়িক পুস্তক প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। উহাতে বেতাল পঞ্চ-বিংশতি প্রভৃতি পুস্তকসকল চিত্রের সহিত মুদ্রিত হইত। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে মার্সমান সাহেব শ্রীরামপুর হইতে দিগ্দর্শন নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। উহাতে সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি নানাবিষয়ের সমাবেশ থাকিত। কিন্তু দিগ্-দর্শন প্রথম খণ্ডের পর আর প্রকাশিত হয় নাই। ঐ বৎসরেই মার্সমান সাহেব সমাচারদর্পণ নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রচার করেন। এই পত্র ১৮৪১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। ১৮২২ খৃঃ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সমাচার চন্দ্রিকা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৩০ খৃঃঅব্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক সংবাদ প্রভাকর প্রচারিত হয়। ১৮৩৯ অব্দে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য সংবাদ ভাস্কর প্রচার করেন। এই কয় খানি পত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, কিন্তু কোন খানিরই সেরূপ প্রভা নাই।

১৮২৮ হইতে ১৮৩৩ এই কয় বৎসরের মধ্যে রাম বসু, হরু-

ঠাকুর, রামনিধি গুপ্ত প্রভৃতি অনেক মহাত্মা নানাবিধ গান রচনা করেন। এই সকল গীতাদিদ্বারা অনেকাংশে বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন হয়, সুতরাং বাঙ্গলাভাষা ইহঁাদের নিকটও যথেষ্ট পরিমাণে ঋণী। উপরি উল্লিখিত মার্সমান প্রভৃতি ইংরাজ মহাপুরুষদিগের সমকালেই মহাত্মা রামমোহন রায় প্রাদুর্ভূত হয়েন। তিনি বাঙ্গলাদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের উদ্দেশে এত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, যে তাঁহার নাম আমাদের দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সাদরে স্মরণ করিয়া থাকে। ইনি ইং ১৭৭৪ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৩৩ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। এই কালের মধ্যে রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মস্থাপন, সহমরণনিবারণ প্রভৃতি নানাবিধ কল্যাণকর কার্য্য করিয়া আপনাকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। ইহঁার রচিত প্রায় তাবৎ গ্রন্থই ধর্ম্মঘটিত। অন্যান্যবিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে ইঁহার রচিত একখানি বাঙ্গলা ব্যাকরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

রামমোহন রায়ের পর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নাম উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। ১৮০৯ খৃঃ অব্দে কাঁচড়াপাড়া গ্রামে বৈদ্যকুলে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জন্ম হয়। বাল্যাবস্থা হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। কবিতারচনাবিষয়ে তাঁহার কিছু স্বতঃসিদ্ধ ক্ষমতা ছিল বলিয়া বোধ হয়, কারণ তিনি বাল্যকালে রীতিমত লেখাপড়া শিখিয়া কৃতবিদ্য ও মার্জ্জিতবুদ্ধি হইতে পারেন নাই, তথাপি কবিতারচনাবিষয়ে তাঁহার অদ্ভুত শক্তি ছিল। ইং ১৮৩০ অব্দে তিনি সংবাদ প্রভাকর নামে এক

খানি দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। উহাতে গদ্য ও পদ্য উভয়ই লিখিত হইত। প্রভাকরেই ঈশ্বরচন্দ্রের কবিত্বশক্তির প্রকাশ হয়। ইনি প্রভাকর ভিন্ন প্রবোধপ্রভাকর, হিতপ্রভাকর, বোধেন্দুবিকাশ প্রভৃতি অন্যান্য কয়েক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইং ১৮৫৮ অব্দে ৪৯ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যু হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের রচনাপ্রণালী নিতান্ত প্রাঞ্জল ও বিষদ। তিনি অনেকানেক নীতিগর্ভ বিষয় রচনা করিয়া বাঙ্গলাভাষার ভূয়সী উন্নতি করিয়া গিয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সময়েই সুপ্রসিদ্ধ মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রাদুর্ভূত হয়েন। ইংরাজী ১৮১৫ অব্দে নদিয়া জেলার অন্তঃপাতী বিল্বগ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে প্রবিষ্ট হইয়া ১৮৪২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান পূর্ব্বক ব্যাকরণ, সাহিত্য,অলঙ্কার, দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সম্যক্ ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। মদনমোহন শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহাধ্যায়ী। পঠদ্দশাতেই ইনি বাসবদত্তা নামক বাঙ্গলা কাব্যগ্রন্থের রচনা করিয়া স্বীয় কবিত্বের পরিচয় প্রদান করেন। ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে মদনমোহন সংস্কৃত কালেজে সাহিত্যাধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। সুপ্রসিদ্ধ বেথুন সাহেব যৎকালে কলিকাতায় বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন মদনমোহনই তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সময় মদন নানাবিধ প্রমাণ প্রয়োগপূর্ব্বক স্ত্রীশিক্ষার শাস্ত্রীয়তা সম্পাদন করিবার উদ্দেশে বাঙ্গলাভাষায় একখানি প্রবন্ধ

রচনা করেন। প্রবন্ধখানি সর্ব্বত্র সমাদৃত হয়। ইং ১৮৫০ অব্দে তর্কালঙ্কার মুর্শিদাবাদের জজ পণ্ডিত হয়েন। কিছুদিন কর্ম্ম করিবার পর তিনি উক্ত জেলাতেই অন্যতম ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হয়েন। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে ওলাউঠারোগে ইঁহার মৃত্যু হয়। মদনমোহন বাসবদত্তা ও রসতরঙ্গিণী এই দুই খানি কাব্যগ্রন্থ ও শিশুদিগের শিক্ষার্থ তিন ভাগ শিশুশিক্ষা রচনা করেন। শিশু-শিক্ষার পূর্ব্বে সুকুমারমতি বালকবালিকাদিগের পাঠোপযোগী কোন ক্ষুদ্র গ্রন্থই ছিল না। মদনমোহন শিশুশিক্ষা রচনা করিয়া এই অভাব নিরাকরণ করেন। ফলতঃ এক্ষণে বাঙ্গলা ভাষার যে এতদুর উন্নতি হইয়াছে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার ইঁহারা উভয়েই তাহার সূত্রপাত করেন।

মদনমোহনের পর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহুসংখ্যক পুস্তক রচনা করিয়া বাঙ্গলা ভাষার প্রকৃত সংস্কার করিয়াছেন এক্ষণে বাঙ্গলা ভাষা যেরূপ লক্ষিত হইতেছে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ই তাহার প্রবর্ত্তয়িতা। বিদ্যাসাগরের ন্যায় অসীমক্ষমতা-শালী লেখক অতি বিরল। ফলতঃ ইঁহাকে অধুনাতন বাঙ্গলা ভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইঁহার পর অক্ষয়-কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যো-পাধ্যায়, রামগতি ন্যায়রত্ন, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, শশিভূষণ

চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অনেকানেক মহাত্মা প্রাদুর্ভূত হইয়া, বাঙ্গলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এক্ষণে বাঙ্গলা ভাষার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে বোধ হয় উক্ত ও অন্যান্য মহাত্মগণ অবিরত চেষ্টা করিলে ইহা অতি অল্পকালের মধ্যেই একটী প্রধান ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠিবে। উল্লিখিত মহাত্মাদিগের মধ্যে দুই একজন ভিন্ন সকলেই বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রস্বরূপ শোভা পাইতেছেন। ইহাঁদের সকলেরই নিকট বাঙ্গলা ভাষা যে কতদূর ঋণী তাহার ইয়ত্তা নাই। সে যাহা হউক, ইহাঁরা অদ্যাপি জীবিত, সুতরাং ইহাঁদের বৃত্তান্ত অনেকেই অবগত আছেন। অতএব ইহাঁদের রচনার সমালোচন করাও তাদৃশ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এই সকল কারণে ইহাঁদের বিষয় সবিস্তরে উল্লেখ করিতে ক্ষান্ত রহিলাম, তবে আবশ্যকমত যথাস্থানে কিছু কিছু বলা যাইবে এই মাত্র।

সাহিত্যসার।

হরপ্রসাদ রায়।

সুবুদ্ধিকথা।

যে পুরুষের মেধা এবং প্রতিভা ও বুদ্ধি এই সকল গুরুতরা হয় এবং যিনি সন্দেহভঞ্জনক্ষম হন, তিনিই সুবুদ্ধি রূপে খ্যাত হন। তাহার উদাহরণ।

মিথিলা নগরীতে কর্ণাটকুলসম্ভব হরসিংহ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সভাতে সাংখ্য শাস্ত্রবেত্তা এবং দণ্ডনীতিশাস্ত্রে কুশল গণেশ্বরনামা এক মন্ত্রী ছিলেন। দেবগিরির রাজা রামদেব ঐ মন্ত্রীর নানাপ্রকার সুবুদ্ধিতা শুনিয়া অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া চিন্তা করিলেন, যে কি হেতু ভূমিনিবাসী গণে-শ্বরের বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধি শুনিতে পাই, ভাল সকল নিরূপণ করিতেছি। ইহা ভাবিয়া রামদেব নরপতি হরসিংহ রাজার সহিত মিত্রতা করিলেন, যে হেতুক যাঁহাদের ক্রিয়ার স্থিরতা থাকে এবং যাঁহারা শূর ও মহাত্মা হন, তাঁহাদিগের যে পরস্পর প্রীতি সে কল্পলতার ন্যায় আচরণ করে। অপর, কোষ এবং সৈন্য নষ্ট হইলে আর ভৃত্য বিকার প্রাপ্ত হইলে ও যদি সদ্বংশ-জাত লোকের সহিত মিত্রতা থাকে, তবে সেই মিত্রতা কল্প-

বৃক্ষের মত ব্যবহার করে অর্থাৎ মিত্রের অভিলষিতফলপ্রদ হয়। অনন্তর উভয় পক্ষের উপঢৌকনদ্বারা সৌহৃদ্য হইলে রাজা রামদেব হরসিংহরাজার নিকটে লিখন দ্বারা এই প্রার্থনা করিলেন, যে সন্দেহনিরাসার্থ এক বুদ্ধিমান এবং মূর্খ এই দুই লোককে আমার নিকটে পাঠাইবেন। হরসিংহ রাজা সেই লিখন দেখিয়া পাঠ করিয়া চিন্তাযুক্ত হইলেন, যে হেতুক মিত্রের বাক্য অলংঘ্য, সম্প্রতি কোন্ বুদ্ধিমানকে এবং কোন্ মূর্খকে পাঠাইব? এতদ্রূপ চিন্তাব্যাকুল রাজাকে দেখিয়া গণেশ্বর মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রাজন! তোমার কি চিন্তা? রাজা উত্তর করিলেন, মিত্রের আজ্ঞা নির্ব্বাহকরণের অসঙ্গতি, দেখিয়া লজ্জা হইতেছে, কোন্ বুদ্ধিমান পুরুষকে ও কোন্ মূর্খকেই বা পাঠান যাইবেক ইহা চিন্তা করিতেছি। মন্ত্রী কহিলেন, হে মহারাজ! কোন পুরুষকে পাঠাইতে হইবে না। রাজা কহিলেন, আঃ মিত্রের প্রার্থনা কি ভঙ্গ হইবেক। মন্ত্রিরাজ কহিলেন হে ভূপাল! তোমার মিত্রের প্রার্থনা নিষিদ্ধ হইবে, যে হেতুক রামদেব রাজার দেবগিরি রাজ্যেতে কি দুর্লভ সামগ্রী আছে, অনেক পণ্ডিত আছেন, অনেক মূর্খও আছে, সেই হেতুক এখান হইতে পণ্ডিত কিম্বা মূর্খ লোককে পাঠাইলে তাঁহার কি প্রয়োজন সিদ্ধি হইবে? আমি এই বিতর্ক করি যে রামদেব রাজা পণ্ডিত এবং অতিশয় কৌতুকী, ঐ প্রকার দুই পুরুষ যাচ্ঞাচ্ছলে তোমার মন্ত্রী যে আমি আমার এই পরীক্ষা করিবেন যে, আমি পণ্ডিতকে আর মূর্খ কে জানিতে পারি কি না। অতএব

হে নরেন্দ্র! আপনি এই উত্তর লিখিবেন যে বুদ্ধিমান লোক এ রাজ্যে নাই এবং তোমার অধিকার মধ্যেও দেখি না, বারাণসীতে এবং অন্য অন্য পুণ্যতীর্থে বুদ্ধিমানের অনুসন্ধান করিবেন। উত্তম বুদ্ধির ফল এই যে তাহাতে তত্ত্বজ্ঞান হয়, অতএব ইন্দ্রজালসদৃশ যেসাংসারিক ব্যাপার তাহার মধ্যে বুদ্ধিমান লোক কি নিমিত্ত অবস্থিতি করিবেন; তিনি কোন নির্জ্জন স্থানে আর গিরিগহ্বরে যোগাবলম্বন করিয়া থাকিবেন, তদ্ভিন্ন যে মূর্খ লোক, সে সর্ব্বত্র সুলভ, সেই অবস্তুর প্রেরণে কি ফল অতএব তাহার পরিচায়ক চিহ্ন লিখিতেছি, ঈশ্বরেচ্ছাপ্রযুক্ত সকল মনুষ্যের হস্তপদাদি সমান হয়, ইহাতে যে ব্যক্তি সকল লোক কর্ত্তৃক নিন্দিত হয় সেই মূর্খ, অপর, মানবজন্ম প্রাপ্ত হইয়া যে লোক পুণ্যসঞ্চয় না করে এবং যশঃ উপার্জ্জন না করে, তাহাকেই মূর্খ কহা যায়। রাজা হরসিংহ এই কথা শুনিয়া কহিলেন তাহাই কর। গণেশ্বর মন্ত্রী ঐ পরামর্শপূর্ব্বক রামদেব রাজাকে সেইরূপ উত্তর লিখিলেন। রাজা রামদেব সেই পত্র পাইয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন এবং সভাসদ্ সমাজের মধ্যে হরসিংহ রাজাকে এবং গণেশ্বর মন্ত্রীকে এইরূপ অনেক প্রশংসা করিলেন, সাধু রাজা সাধু, যে রাজার রাজনীতিরূপা যে নদী, তাহার কর্ণধারস্বরূপ এবং ধর্ম্মজ্ঞ এই গণেশ্বর মন্ত্রী আছেন।

দিগ্‌দর্শন—মার্স্‌ম্যান সাহেব।

বিদ্যুৎ ও বজ্র।

সকল আকাশ বিদ্যুৎ পদার্থে পরিপূর্ণ। ঝড়ের সময়ে মেঘ পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইলে পৃথিবীস্থ কোন বস্তু বিদ্যুৎকে আকর্ষণ করে, তাহাতে সেই বিদ্যুৎ মেঘ ছাড়িয়া অতিবেগে আইসে, তৎপ্রযুক্ত মেঘ ফাটে, তাহাতে বৃহৎ শব্দ হয়, তাহাকেই বজ্র কহে। যে সময়ে বিদ্যুৎ মেঘ হইতে নির্গত হয়, তখনি শব্দ উৎপন্ন হয়। কিন্তু আমাদিগের নিকটে তৎক্ষণাৎ শব্দ না পঁহুছিয়া কখন কখন কিছু কাল বিলম্বে পঁহুছে। যে হেতুক শব্দ আড়াই পলের মধ্যে ছয় ক্রোশ চলে, কিন্তু আলোক ইহা হইতে অতি শীঘ্র চলে, অতএব আলেক ও শব্দ এককালে নির্গত হয় বটে, কিন্তু শব্দ হইতে আলোক অগ্রে আইসে। যদি কেহ নিশ্চয় করেন যে, বিদ্যুতের আলোকদর্শনের কতক্ষণ পরে শব্দ শুনা যায়, তবে তিনি এইরূপে গণনা করিলে জানিতে পারিবেন, যে তাহা হইতে বিদ্যুৎ কত অন্তর আছে। যদি আলোকদর্শনের আড়াই পল পরে তিনি শব্দ শুনেন, তবে ছয় ক্রোশ অন্তর বিদ্যুৎ নির্গত হইয়াছে জ্ঞাত হইবেন।

বিদ্যুৎ প্রায় উচ্চ বস্তুর উপরে পড়ে। এই কারণ ঝড়ের সময়ে বৃক্ষের নীচে থাকা অকর্ত্তব্য। কোন কোন বস্তুর এমত স্বভাব যে, তাহারা অন্য বস্তু হইতে বিদ্যুতীয় অগ্নিকে অতিশয় আকর্ষণ করে। সকল ধাতু এই প্রকার স্বভাবপ্রাপ্ত, এই হেতুক খাপ সমেত তলোয়ারের উপরে বিদ্যুৎ পড়িলে কখন

কখন মধ্যের তলোয়ার দগ্ধ হয়, উপরে খাপের কাষ্ঠ দগ্ধ হয় না।

পণ্ডিতেরা এই মত কল সৃষ্টি করিয়াছেন, যে, তাহা হইতে বিদ্যুতীয় অগ্নি নির্গত হয়, তাহার স্বভাব বিদ্যুতীয় অগ্নির মত। যখন সেই কল ঘুরাণ যায়, তখন তাহা হইতে বিদ্যুতীয় স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, এবং যদি কেহ তাহাকে স্পর্শ করে, তবে তাহার সর্ব্বাঙ্গে তৎক্ষণাৎ ঝিঞ্জিনী লাগে। এই কলের দ্বারা যে ঝিঞ্জিনী হয়, সে বিদ্যুতীয় ঝিঞ্জিনীর সমান, কেবল বিদ্যুত হইতে ইহার বল অল্প, এই মাত্র বিশেষ। যখন এই কল সৃষ্টি হইল, তখন পণ্ডিতেরা ইহা জানিতে চেষ্টা করিলেন, যে কল হইতে যে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় সে স্ফুলিঙ্গ বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গের স্বভাব মত কি না।

অনেক উদ্যোগের পর ফ্রাঙ্কলিন সাহেব, আমেরিকা দেশের একজন জ্ঞানবান, এই বিষয় নিশ্চয় করিলেন। তিনি ভাবিলেন যে যদি মেঘের সহিত কোন বস্তু সংলগ্ন করা যায়, ও যদি সেই বস্তু পৃথিবীর উপরে কোন বস্তুতে বদ্ধ থাকে, তবে বিদ্যুতীয় অগ্নি মেঘ ছাড়িয়া সেই বস্তুর উপরে লাগিবেক, এবং তাহা বাহিয়া বিদ্যুতীয় অগ্নি পৃথিবীস্থ সেই বস্তুতে আসিবেক, এই নিমিত্ত ঐ সাহেব ১৭৫২ সনে এক মাঠে একটা লৌহশলাকা মৃত্তিকাতে গাড়িলেন, এবং মেঘ হইলে তিনি একটা ঘুড়ী উড়াইলেন, ও সেই লৌহশলাকাতে ঘুড়ীর রজ্জু বান্ধিয়া রাখিলেন। কিছুকাল পরে দেখা গেল যে সেই রজ্জু হইতে কতক

স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল, তাহাতে তিনি জানিলেন যে বিদ্যুতীয় অগ্নি লৌহশলাকাতে পঁহুছিয়াছে। অতএব ঐ লৌহ-শলাকার দ্বারা তিনি ও আর আর পণ্ডিতেরা বিদ্যুতীয় অগ্নির নিশ্চয় স্বভাব জানিতে পারিলেন।

ঐ ফ্রাঙ্কলিন সাহেব বিদ্যুতের ভয়নিবারণার্থ প্রথম ঘরে লৌহশলাকা দিতে লোকেরদিগকে শিক্ষাইলেন। ঘর হইতে উচ্চ একটা লম্বা লৌহশলাকা ঘরের নিকটে মৃত্তিকাতে পোতা যায়, তাহার অগ্রভাগ অতিসূক্ষ্ম। যখন বিদ্যুৎ ঘরের নিকটে আইসে, তখন কোন অপচয় না করিয়া ঐ লৌহশলাকাতে পড়ে, এবং তাহা বাহিয়া মৃত্তিকাতে প্রবেশ করে। সেই লৌহ-শলাকা স্থানে স্থানে ঘরের সহিত কাষ্ঠদ্বারা বদ্ধ থাকে, কিন্তু কাষ্ঠ অনাকর্ষক বস্তু, এই নিমিত্ত কাষ্ঠদ্বারা ঘরে প্রবেশ করিতে পারে না। যদি সেই সময়ে ঐ লৌহশলাকা কেহ স্পর্শ করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণবিয়োগ হয়। যখন ফ্রাঙ্কলিন সাহেব প্রথম এই বিষয় নিরূপণ করিলেন, তখন রুশিয়া দেশে এক জ্ঞানবান লোক এতদ্রূপ করণার্থে আপন ঘরে একটা লম্বা লৌহশলাকা এক কাচের বাটীতে রাখিল, যে বিদ্যুতের অগ্নি সেই শলাকাতে থাকে, এবং সেই শলাকাতে অন্য এক পাতলা-শলাকা বান্ধিয়া আপন কুঠরীতে আনিয়া রাখিল। পরে ঝড় বৃষ্টি আইলে বিদ্যুৎ ঘুড়ীর উপরে পড়িয়া তাহার দ্বারা সেই শলাকার উপরে আইল, ও সে সাহেব অকস্মাৎ তাহার নিকটে যাইবামাত্র বিদ্যুতের দ্বারা মরিল।

দশম ন্যায়ের বিবরণ।

দশ জন একত্র হইয়া কোন দেশে যাইতেছিল, পথিমধ্যে এক নদী ছিল, তাহা পার হইয়া পরপারে বসিয়া সকলে কহিল আমরা দশ জনা পার হইয়াছি, কিম্বা দশজনের মধ্যে কেহ পার হয় নাই ইহা জানা ভাল। এই পরামর্শতে প্রথমতঃ এক জন অন্য নয় (জন) লোককে গণিয়া, আপনাকে না গণিয়া কহিল যে ওরে ভাইরা নয় জন যে হয়, আর এক জন কম্‌নে গেল? ইহা শুনিয়া অন্য জন কহিল এমন হবে না, থাক আমি গণিয়া দেখি, এরূপ কহিয়া সেও স্বভিন্ন নয় লোককে সংখ্যা করিয়া সশঙ্ক হইয়া কহিল হে বটেত, নয় জনই যে হয়, দশম কি হইল। এইরূপে দশজন একে একে আত্মবিস্মরণে বাহ্য-মাত্রাভিনিবিষ্টচিত্ততাতে কেবল বাহ্যগণনা করিয়া দশম নাই এই নিশ্চয় করিল। অনন্তর সকলেই হাত তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল, ওহে দশম কোথা আছ শীঘ্র আইস, আমরা সকলেই তোমাকে না পাইয়া বড়ই ব্যাকুল হইতেছি, তোমাকে পাইলেই সুখী হই, অতএব যেথা থাক শীঘ্র আইস। এইরূপ পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিয়া কিছুই উত্তর না পাইয়া পুনরায় সকলে যুক্তি করিয়া এই নিষ্কর্ষ করিল যে বুঝি আমাদের সঙ্গে পরিহাস করিয়া এই বনে লুকাইয়া আছে। চল সকলে বনের মধ্যে গিয়া তত্ত্ব করি সে বড় দুষ্ট; যদি পাই আমাদিগের বড় দুঃখ দিতেছে ভাল বুঝিব। ইহা কহিয়া সেই কণ্টকিত নানা-

জাতীয় লতাবেষ্টিত নিবিড় বিপিনমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। পরে সেই অরণ্যে গাছের আড়ে, কুঞ্জমধ্যে, পর্ব্বতে, উপত্যকাতে, কন্দরে, গুহাতে, সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়া কোথাও কিছু তত্ত্ব না পাইয়া পুনর্ব্বার ঐ নদীতীরে আসিয়া মন্ত্রণা করিল, যে বুঝি নদীপার হইতে হইতে ডুবিয়া মরেছে, আইস দেখি, খুঁজি। ইহা মনে করিয়া নদীর মাঝে খুঁজিয়া কোথাও কিছু টের না পাইয়া পাঁক কাদা সেওলামাখা গায়ে নদীর পাড়ে বসিয়া আর্ত্তস্বরে রোদন ও গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে কাকুক্তি বিলাপ করিয়া কেহ বা বুক চাপড়ায়, কেহ বা মাথা কুড়ে, কেহ বা ধূলাতে গড়াগড়ি পাড়ে, কেহ বা আছাড় খাইয়া পড়ে। ইতিমধ্যে আত্মদর্শী নামে একজন তথাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত করুণান্বিত হইয়া তাহারদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, তোমরা এ দুর্দশাগ্রস্ত কি কারণে হইয়াছ তাহা আমাকে কহ। ইহা শুনিয়া তাহারা আদ্যোপান্ত সকল বৃত্তান্ত কহিল। তদনন্তর আত্মদর্শী বিবেচনা করিয়া বুঝিলেন যে ইহারা সকলেই আত্মবিস্মৃত। আত্মস্বরূপ বিস্মরণ সর্ব্বানর্থের নিদান হয়। ধন্য জগন্মোহিনী পারমেশ্বরী শক্তি যে আত্মজ্ঞানাধীন সর্ব্ববিজ্ঞান হয়, তিনি স্বয়ং প্রকাশমান আত্মাকেও বিস্মৃত করান। আহা এ জীবেরা আত্মাকে ভুলিয়া না গুণিয়া এতাদৃশ দুঃখ পাইতেছে। ইহা মনে মনে করিয়া কহিলেন যে হে আত্মবিস্মৃতেরা উঠ মোহ শোক রোদন ত্যাগ কর। তোমাদের দশম মরে নাই, আছে, আমি দেখাইয়া দিতেছি, স্থির হও অন্তঃকরণ সুস্থ কর।

আত্মদর্শীর এই বাক্য শুনিয়া আত্মবিস্মৃতেরা অস্তব্যস্তে উঠিয়া কহিলেন কই কই আমারদের দশম কোথায় আছে, তুমি যদি আমারদের দশমকে দেখাইতে পার তবে যার পর নাই এমন উপকার কর। আত্মদর্শী কহিলেন ভাল ভাল কিন্তু তোমরা বাহ্যবিষয়মাত্রেই অত্যন্ত অভিনিবেশ করিও না। আত্মজ্ঞানে জাগরূক হও, বাহ্যগণনা করিয়া আত্মগণনা করিলে কিম্বা আত্মাকে গণিয়া বাহ্যগণনা করিলে তোমরা সকলেই দশম হইবা। আদি মধ্য শেষ সকলেই দশম। তোমরা সব শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াও, আমি দেখাইয়া দি। এ বাক্য শুনিয়া তাহারা সব একশারি হইয়া দাঁড়াইল। পরে আত্মদর্শী প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত দ্বিতীয়াবধি প্রথম পর্য্যন্ত তৃতীয়াবধি দ্বিতীয় পর্য্যন্ত, এবং চতুর্থাদ্যবধি তৃতীয়াদিপর্য্যন্ত মালার ন্যায়ে গণনা করিয়া সকলকে দশমরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দিলেন। তদনন্তর তাহারা সকলেই সংশয়াপন্ন হইয়া কহিল যে আপনারা মনে বুঝিয়া দেখতো ইনি আপনি আমারদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমারদিগকে ভুলান তো নাই। ইহা কহিয়া আত্মদর্শীকে কহিল আপনি সরিয়া যাওতো, আমরা আপনারা মনে যুক্তি করিয়া বুঝি, তবে আমারদের প্রামাণ্য হইবেক। ইহা কহিয়া সকলেই প্রত্যেক মনন করিয়া সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষরূপে স্ব স্ব স্বরূপ দশমকে পাইয়া মোহ শোক দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া কৃতকৃত্য ও অতি সন্তুষ্ট হইয়া নিরতিশয় সুখ পাওত স্বাস্থ্য পাইল।

রাজা রামমোহন রায়—বেদান্তগ্রন্থের অনুষ্ঠানপত্র।

প্রথমতঃ বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহব্যাপার নির্ব্বাহের যোগ্য কেবল কতকগুলিন শব্দ আছে। এভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয়, তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে, দ্বিতীয়তঃ এভাষার গদ্যতে অদ্যাপি কোন শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে নাই। ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাসপ্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে হঠাৎ পারেন না; ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থ বোধের সময় অনুভব হয়। অতএব বেদান্তশাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ কেহ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন, এনিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। যাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক, আর যাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধুভাষা কহেন, আর শুনেন, তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক। বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যে যেস্থানে, যখন, যাহা, যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন, তাহা, সেইরূপ, ইত্যাদিকে পূর্ব্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করি-

বেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন, যেহেতু এক বাক্যে কখন কখন কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে, ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থজ্ঞান হইতে পারে না। তাহার উদাহরণ এই। "ব্রহ্ম যাঁহাকে সকল দেবে গান করেন, আর যাঁহার সত্তার অবলম্বন করিয়া জগতের নির্ব্বাহ চলিতেছে সকলের উপাস্য হয়েন।" এ উদাহরণে যদ্যপি ব্রহ্ম শব্দকে সকলের প্রথমে দেখিতেছি, তত্রাপি সকলের শেষে 'হয়েন' এই যে ক্রিয়াশব্দ তাহার সহিত ব্রহ্মশব্দের অন্বয় হইতেছে। আর মধ্যেতে "গান করেন" যে ক্রিয়া শব্দ আছে তাহার অন্বয় দেব শব্দের সহিত আর "চলিতেছে" এ ক্রিয়া শব্দের সহিত "নির্ব্বাহ" শব্দের অন্বয় হয়। অর্থাৎ যেখানে যেখানে বিবরণ আছে, সেই বিবরণকে পর পূর্ব্ব পদের সহিত অন্বিত যেন না করেন, এই অনুসারে অনুষ্ঠান করিলে অর্থবোধ হইবাতে বিলম্ব হইবেক না। আর যাঁহাদের ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো নাই, এবং ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস নাই, তাঁহারা পণ্ডিত ব্যক্তির সহায়তাতে অর্থ-বোধ কিঞ্চিৎকাল করিলে পশ্চাৎ স্বয়ং অর্থবোধে সমর্থ হইবেন। বস্তুত মনোযোগ আবশ্যক হয়। এই বেদান্তের বিশেষ জ্ঞানের নিমিত্ত অনেক বর্ষ উত্তম পণ্ডিতেরা শ্রম করিতেছেন। যদি দুই তিন মাস শ্রম করিলে এ শাস্ত্রের এক প্রকার অর্থবোধ

হইতে পারে, তবে অনেক সুলভ জানিয়া ইহাতে চিত্ত নিবেশ করা উচিত হয়।

কেহ কেহ এশাস্ত্রে প্রবৃত্তি হইবার উৎসাহের ভঙ্গ নিমিত্ত কহেন যে বেদের বিবরণ ভাষায় করাতে এবং শুনাতে পাপ আছে, এবং শূদ্রের এভাষা শুনিলে পাতক হয়, তাঁহাদিগে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে যখন তাঁহারা শ্রুতিস্মৃতি জৈমিনিসূত্র গীতা পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র ছাত্রকে পাঠ করান, তখন ভাষাতে তাহার বিবরণ করিয়া থাকেন কি না, আর ছাত্রেরা সেই বিবরণকে শুনেন কি না, আর মহাভারত যাহাকে পঞ্চম বেদ আর সাক্ষাৎ বেদার্থ কহা যায় তাহার শ্লোক সকল শূদ্রের নিকট পাঠ করেন কি না, এবং তাহার অর্থ শূদ্রকে বুঝান কি না, শূদ্রেরাও সেই বেদার্থের অর্থ এবং ইতিহাস পরস্পর আলাপেতে কহিয়া থাকেন কি না, আর শ্রাদ্ধাদিতে শূদ্র নিকটে ঐ সকল উচ্চারণ করেন কি না? যদি এইরূপ সর্ব্বদা করিয়া থাকেন তবে বেদান্তের এ অর্থের বিবরণ ভাষাতে করিবাতে দ্বেষের উল্লেখ কিরূপে করিতে পারেন? সুবোধ লোক সত্যশাস্ত্র আর কাল্পনিক পথ ইহার বিবেচনা অবশ্য করিতে পারিবেন। কেহ কেহ কহেন ব্রহ্মপ্রাপ্তি যেমন রাজপ্রাপ্তি হয়। সেই রাজপ্রাপ্তি তাহার দ্বারীর উপাসনা ব্যতিরেকে হইতে পারে না, সেইরূপ রূপগুণবিশিষ্টের উপাসনা বিনা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবেক না। যদ্যপিও এবাক্য উত্তরযোগ্য নহে, তথাপি লোকের সন্দেহ দূর করিবার নিমিত্ত লিখিতেছি। যে ব্যক্তি রাজপ্রাপ্তি নিমিত্ত

দ্বারীর উপাসনা করে, সে দ্বারীকে সাক্ষাৎ রাজা কহে না, এখানে তাহার বিপরীত দেখিতেছি, যেরূপ গুণবিশিষ্টকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম কহিয়া উপাসনা করেন। দ্বিতীয়তঃ রাজা হইতে রাজার দ্বারী সুসাধ্য, এবং নিকটস্থ, সুতরাং তাহার দ্বারা রাজপ্রাপ্তি হয়, এখানে তাহার অন্যথা দেখি। ব্রহ্ম সর্ব্ব-ব্যাপী, আর যাঁহাকে তাঁহার দ্বারী কহ, তেঁহো মনের অথবা হস্তের কৃত্রিম হয়েন, কখন তাঁহার স্থিতি হয় কখন স্থিতি না হয়, কখন নিকটস্থ, কখন দূরস্থ, অতএব কিরূপে এমত বস্তুকে অন্তর্যামী সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা হইতে নিকটস্থ স্বীকার করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন কহা যায়। তৃতীয়তঃ চৈতন্যাদিরহিত বস্তু কি রূপে এই মত মহৎসহায়তার ক্ষমতাপন্ন হইতে পারেন। মধ্যে মধ্যে কহিয়া থাকেন যে পৃথিবীর সকল লোকের যাহা মত হয়, তাহা ত্যাগ করিয়া দুই এক ব্যক্তির কথা গ্রাহ্য কে করে, আর পূর্ব্বে কেহো পণ্ডিত কি ছিলেন না, এবং অন্য কেহ পণ্ডিত কি সংসারে নাই, যে তাঁহারা এই মতকে জানিলেন না এবং উপদেশ করিলেন না। যদ্যপিও এমত সকল প্রশ্নের শ্রবণে কেবল মানস দুঃখ জন্মে, তত্রাপি কার্য্যানুরোধে উত্তর দিয়া যাইতেছে। প্রথমত একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর যে সীমা আমরা নির্দ্ধারণ করিয়াছি এবং যাতায়াত করিতেছি, তাহার বিংশতি অংশের এক অংশ এই হিন্দোস্থান না হয়। হিন্দুরা যে দেশেতে প্রচুররূপে বাস করেন, তাহাকে হিন্দোস্থান কহা যায়। এই হিন্দোস্থান ভিন্ন অর্দ্ধেক হইতে অধিক পৃথিবীতে

এক নিরঞ্জন পরব্রহ্মের উপাসনা লোকে করিয়া থাকেন, তবে কিরূপে কহেন যে তাবৎ পৃথিবীর মতের বহির্ভূত এই ব্রহ্মোপাসনার মত হয়। আর পূর্ব্বেও পণ্ডিতেরা যদি এই মতকে কেহো না জানিতেন এবং উপদেশ না করিতেন, তবে ভগবান বেদব্যাস এই সকল সূত্র কিরূপ করিয়া লোকের উপকারের নিমিত্ত প্রকাশ করিলেন, এবং বশিষ্ঠাদি আচার্য্যেরা কি প্রকারে এইরূপ ব্রহ্মোপদেশে প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তবে আমি যাহা না জানি সে বস্তু অপ্রসিদ্ধ হয়, এমত নিয়ম যদি করহ তবে ইহার উত্তর নাই। এতদ্দেশীয়েরা যদি অনুসন্ধান আর দেশভ্রমণ করেন, তবে কদাপি এসকল কথাতে যে পৃথিবীর এবং সকল পণ্ডিতের মতের ভিন্ন হয় এমত বিশ্বাস করিবেন না। আমাদিগের উচিত যে শাস্ত্র এবং বুদ্ধি উভয়ের নির্দ্ধারিত পথের সর্ব্বথা চেষ্টা করি এবং ইহার অবলম্বন করিয়া ইহ লোকে পর লোকে কৃতার্থ হই।

প্রভাকর।

ঢাকা, বিক্রমপুর এবং রাজনগর প্রভৃতির পুরাতন উজ্জ্বল এবং নূতন মলিন অবস্থা বর্ণনা।

আমরা "দাউদকাঁদি" হইতে নৌকা চালনাপূর্ব্বক 'পদ্মা, ও কীর্ত্তিনাশা অতিক্রম করত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পরে রাজনগরের খালের ভিতর প্রবেশ করিয়া রাত্রি দশ ঘটিকা সময়ে রাজনগরের বাজারের ঘাটে অতি উচ্চ সুদৃশ্য কাষ্ঠনির্ম্মিত পুলের নীচে আগমন করিলাম, ঐ রাত্রি তথায় অবস্থান করত পরদিবস প্রত্যূষে বৈদ্যকুলোদ্ভব মহারাজা রাজবল্লভের রাজভবন ও আর আর প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ দর্শনার্থ গমন করিলাম, বেলা দেড়প্রহর পর্য্যন্ত গুরুতর পরিশ্রমপূর্ব্বক ক্রমশই ভ্রমণ করি, তথাচ সমুদয় দেখিয়া শেষ করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ সর্ব্বনাশা কীর্ত্তিনাশা বিশেষ বিশেষ কয়েকটী কীর্ত্তি নাশ করাতে অতিশয় দুঃখের বিষয় হইয়াছে। একজন পুরুষ হইতে এক সময়ে এত কীর্ত্তি স্থাপনা হওয়াই অত্যাশ্চর্য্য কহিতে হইবে। রাজনগর প্রকৃতই রাজনগর ছিল, ইহার মধ্যভাগে ক্ষুদ্র এক নদী, তাহার দুই পার্শ্বেই ভদ্রলোকের বসতি। রাজনগরে ব্রাহ্মণ প্রায় এক সহস্র ঘর হইবে, ইহার মধ্যে অনেকেই কুলীন ও পণ্ডিত। ব্রাহ্মণের ভিতরে রাজপুরোহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরাই সর্ব্বাপেক্ষা ধনী। মহারাজ আপনার ঐ পুরোহিতদিগ্যে জিলা

ভুলুয়া ও বরিসালের মধ্যে বিস্তর ভূমি দান করিয়াছিলেন, অধুনা তাহার বার্ষিক উৎপন্ন প্রায় এক লক্ষ মুদ্রা হইবে। এই ভট্টাচার্য্যেরা অতি সৎক্রিয়ান্বিত, সুপণ্ডিত, সুশীল, বহুলোক প্রতিপালক।—এখানে বৈদ্য অনেক, তাবতেই সূত্র-ধারণ ও পক্ষাশৌচ গ্রহণ করেন, ইহাঁরা সদাচারী সদ্বিদ্বান, সম্ভ্রান্ত।—ভূমির উপস্বত্ব, রাজকর্ম্ম এবং চিকিৎসা এই তিন প্রকার উপায় দ্বারা উপজীবিকা নির্ব্বাহ করেন। বিক্রমপুর ও চাঁদপ্রতাপ ও অন্যান্য পরগণার মধ্যে বৈদ্য কত আছেন তাহার সংখ্যা হয় না। কিন্তু তাঁহারা সকলেই আচারভ্রষ্ট, সূত্র-ধারণ করেন না, এবং মাসাশৌচ গ্রহণ করেন।—ক্রিয়া কর্ম্মের সময়ে সংপূর্ণরূপেই শূদ্রবৎ ব্যবহার করেন, ফলে আশ্চর্য্য এই, যে, উক্ত রাজনগরস্থ ন্যায়াচারী বৈদ্যবৃন্দের সহিত উল্লেখিত বিরুদ্ধাচারী বৈদ্যব্যুহের বৈবাহিক ক্রিয়ার কিছুমাত্রই ব্যাঘাত ঘটেনা, অনায়াসেই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়, সম্প্রদান সময়ে এক পক্ষ "দেবী" এক পক্ষ "দাসী" এইরূপ হাস্যজনক মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন।

এই নগরে কায়স্থ ও অন্যান্য জাতি অনেক দেখিলাম, এখানকার কায়স্তের মধ্যে ধনী ও মান্য অত্যল্প।

এখানে আমোদ প্রমোদের সমুদয় ব্যাপার আছে, যাত্রাকর, বাদ্যকর অনেক।

রাজনগরের "রাজদীঘী" বর্দ্ধমানের "কৃষ্ণসাগরের" ন্যায় বৃহৎ হইবে, এপার হইতে ও পারের মানুষকে মানুষ বলিয়া বোধ হয় না, ঐ দীঘীর ধারেই রাজার বাজারের দীর্ঘতা প্রায়

অর্দ্ধ ক্রোশ হইবে।—দোকান পশার বিস্তর।—সকল প্রকার দ্রব্যই প্রাপ্ত হওয়া যায়।—ফল, মূল তরকারি, মৎস্য, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, ক্ষীর, যথেষ্ট ও অত্যন্ত সুলভ।—দুই সন্ধ্যা বাজার বসিয়া থাকে।—রবিবার ও বুধবারে হাট হয়।—বহুদূরের লোক এই বাজারে বাজার করিতে আইসে।—বাজারের কাঁশারিপটিতে অনেক বাসোনের দোকান, তথায় নানাপ্রকার বাসন প্রস্তুত হয়।—কাপুড়েপটি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে —বঙ্গদেশের ভিতরে যেমন ঢাকা জিলা সর্ব্বপ্রধান, ঢাকা জিলার মধ্যে যেমন বিক্রম-পুর পরগণা সকল পরগণার প্রধান, সেইরূপ বিক্রমপুরের মধ্যে রাজনগর গ্রাম সকল গ্রামের প্রধান।

রাজনগরে "রাজসাগর" সরোবর যেমন, সেই প্রকার বড় বড় সরোবর আরো অনেক আছে, যথা "রাণীসাগর" "আনন্দসাগর" "কৃষ্ণসাগর" ও "সুখসাগর" প্রভৃতি, উহার কোনোটীই ক্ষুদ্র নহে, প্রায় তুল্য, অতি মনোহর। কি পরি-তাপ! সুখসাগর-প্রভৃতি কয়েকটা ডাগর সাগর কীর্ত্তিনাশায় গ্রস্ত হইয়া অধুনা তাহারি হৃদয়ে বিহার করিতেছে, এবং তৎ-সঙ্গে সঙ্গে নদীর ভঙ্গে অনেক রম্য হর্ম্ম্য ও সুচারু উদ্যান সকল তনুত্যাগ করিয়াছে।—সংপ্রতি তাহারদিগের কোনরূপ চিহ্নও আর দেখা যায় না, ঐ কীর্ত্তিনাশা পৃথ্বীপালের কত কীর্ত্তি ও কত বৃত্তি নাশ করিয়াছে তাহার সংখ্যা হয় না।—এই দুর্ঘটনা কিছু বহুদিন হয় নাই, অত্যল্প দিবস হইল,—যাঁহারা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন তাঁহারদিগের প্রমুখাৎ সবিশেষ শ্রবণ করত যখন

চমৎকৃত হইলাম, তখন প্রত্যক্ষে সমুদয়টি দৃষ্টি করিলে না জানি চক্ষের আরো কত সার্থকতা হইত ?

মহারাজ রাজবল্লভের পিতা ৺ কৃষ্ণজীবন মজুমদারের প্রতিষ্ঠিত এক পুরাতন পুষ্করিণী দৃষ্ট হইল, তাহা কলিকাতার লালদীঘী হইতে বড় হইবে, কৃষ্ণজীবন মজুমদার সামান্য কর্ম্ম করিতেন, তৎপুত্র রাজবল্লভ স্বীয় বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা দ্বারা নবাবের দেওয়ানী করিয়া অদ্বিতীয় সম্ভ্রান্ত ও সৌভাগ্যশালী হইয়াছিলেন, ইনি এত ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন, যে ইহাঁর মরণের পর নবাবের লোকেরা ক্রমশঃ এক মাস বাটী লুঠ করিয়াও সমুদয় শেষ করিতে পারে নাই।—আহা! জগদীশ্বরের কি বিচিত্র লীলা! যে ব্যক্তি এক যজ্ঞসূত্রের সূত্রে কোটি মুদ্রার অধিক অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়াছিলেন, পুরোহিতকে যে ভূমি দান করেন তাহার বার্ষিক আয় লক্ষ মুদ্রা, যে ব্যক্তি দেবালয় প্রভৃতিতে কত অর্থ ব্যয় করেন, তাহার সংখ্যাই হয় না, যে ব্যক্তি নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরকে দক্ষিণা স্বরূপ, তিন লক্ষ টাকা অনায়াসেই দান করেন, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সেই দক্ষিণা পাইয়া রাজস্বঘটিত ঋণজাল হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়েন।

অনন্তর, শতরত্নের উপর চতুর্থতল পর্য্যন্ত আরোহণ করিলাম। এই শতরত্ন অদ্যাপি হতরত্ন হয় নাই, ইহাতে কত রত্ন ব্যয় হইয়াছে নির্ণয় করিতে পারিলাম না। এক এক রত্নেই এক একটী ঘর ও প্রত্যেক ঘরেই এক এক বারাণ্ডা। নীচে

উপরের সমুদয় ঘরে ভ্রমণ করিলে অতিশয় শ্রম বোধ হয়, ইহার গাঁথুনির পারিপাট্য কি ব্যাখ্যা করিব! এত প্রাচীন হইল, জন্মাবধি কখনই মেরামত হয় নাই, তথাচ এপর্য্যন্ত কোনঘরেই এক-বিন্দু জল পড়েনা, আশ্চর্য্য থিলেন, ও চুণ সুর্কির আশ্চর্য্য জমাট।

তৎপরে একুশরত্ন, নবরত্ন, সপ্তরত্ন, পঞ্চরত্ন রাসমঞ্চ, দোল-মঞ্চ, আর আর দেবমন্দির, পূজার বাটী, নৃত্যাগার, বৈঠকখানা দেওয়ানখানা, ও বসতি বাটী প্রভৃতি একে একে দর্শন করিলাম। একুশরত্নের কথাই নাই, অদ্যাপি তাহা অবিকল নূতন রহিয়াছে, কিছুমাত্র রূপান্তর হয় নাই। এই রত্নটী পঞ্চতল। দ্বিতীয়তলে পঞ্চ, তৃতীয়তলে পঞ্চ, চতুর্থতলে পঞ্চ, পঞ্চতলে পঞ্চ এবং সর্ব্ব উর্দ্ধে এক রত্ন। প্রত্যেক রত্নেই এক এক ঘর ও বারাণ্ডা এবং বেদি।—এই রত্নই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, ইহার উপরে উঠিলে চতুর্দ্দিক বিচিত্ররূপে বিলোকিত হয়. ঐ সর্ব্বনাশা সমুদ্র-বিশেষ কীর্ত্তিনাশাকেও ক্ষুদ্র এক খালের ন্যায় দেখা যায়।

সকল রত্নেরি শোভাই এইরূপ মনোলোভা।—বৈঠকখানা প্রভৃতি ঘরসকল জনশূন্য অরণ্যময়। তাহার উপর বড় বড় বৃক্ষ হইয়াছে, কোন কোন গৃহের কড়ি, বরগা, ছাদ নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু প্রাচীর সকল সমভাবেই রহিয়াছে, তাহার কোন অংশই ধ্বংস হয় নাই, একখানি ইট্ খসে নাই, ইট হইতে বিন্দুমাত্র চুণ খসে নাই, বৃষ্টির জলে কিছুই ঢসে নাই, পোস্তা বসে নাই, জমাট রসে নাই! পুনর্ব্বার ছাদ প্রস্তুত করিয়া দিলেই স্বচ্ছন্দে আবার একশত বৎসর সুখে বাস হইতে পারে।

বহির্ব্বাটীর কতিপয় প্রকোষ্ঠ এবং অন্তঃপুরের অনেকাংশ অদ্যাপি নাশ হয় নাই, সমভাবেই আছে, রাজপরিবারেরা এইক্ষণে তন্মধ্যেই বিরাজ করিতেছেন।

পরন্তু আহারান্তে নৌকারোহণ পূর্ব্বক আগমন করিতে করিতে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত নদীর উভয় তীরে স্থানে স্থানে শুদ্ধ রাজবল্লভের প্রতিষ্ঠিত দেবালয় সকল দেখিতে পাইলাম। এবং নদীর উপরে কিঞ্চিৎ দূরে ও অধিক দূরে স্থানে স্থানে আর আর অনেক কীর্ত্তি অদ্যাপি সজীব, মৃতকল্প, ও ভগ্ন হইয়া রহিয়াছে, সময়ের স্বল্পতা ও পথশ্রান্তি জন্য তৎসমুদয়ে অধিকাংশ দেখিতে পাইলাম না, একারণ অন্তঃকরণে অতিশয় খেদ রহিয়া গেল।

উক্ত মহাত্মা যত কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, অধুনা তাহার অর্দ্ধেক নাই, পদ্মা তাহা নাশ করত কীর্ত্তিনাশা নাম ধারণ করিয়াছে।

রাজা রাজবল্লভ সংস্কৃত, বাঙ্গালা, পারস্য, আরবী, হিন্দি প্রভৃতি কতিপয় ভাষায় অতিশয় যোগ্য ও রাজকর্ম্মে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন, তাঁহার ন্যায় পরোপকারী ও দাতা ব্যক্তি প্রায় কাহাকেই দেখা যায় না।

আমি বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছি, বঙ্গবাসী যে সকল মহাশয় নৌকাযোগে ঢাকা, বিক্রমপুর, কমিল্যা, সুধারাম ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি প্রদেশে আগমন করেন, তাঁহারা যেন একবার রাজনগরে আসিয়া মহারাজ রাজবল্লভের কীর্ত্তিকলাপ দর্শন করেন। বরিশাল হইতে রাজনগর হইয়া উল্লেখিত সমুদয় স্থানে

গমন করিতে হইলে কেবল এক দিবসের পথের বিলম্বমাত্র হয়। কিন্তু রাজনগরের পথ অতি সুপথ, নদী অতি ক্ষুদ্র, কোন আশঙ্কাই নাই, সর্ব্বত্রই খাদ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, জল নির্ম্মল ও মিষ্ট। অতএব অধিক লেখা বাহুল্যমাত্র।

পরন্তু ঢাকানগরের প্রাচীন-কীর্ত্তি সকল দেখিতেও যেন কেহ আলস্য না করেন।

ঢাকার মধ্যে যবন রাজাদিগের এবং বিক্রমপুরে মহারাজ বল্লালসেনের প্রাচীন কীর্ত্তির যে সকল চিহ্ন দেখা যায়, তাহাতে এককালেই ঘোরতর দুঃখে দুঃখিত ও অত্যাশ্চার্য্যে অভিভূত হইতে হয়। আহা!—তাহা কি বিচিত্ররূপে বিনির্ম্মিত হইয়াছিল? আমি বিশেষ যত্নপূর্ব্বক ঐ দুইটী বিষয়ের পুরাতন ও আধুনিক অবস্থা বর্ণনা করত সময়ক্রমে পাঠকপুঞ্জের নয়নাগ্রে সমার্পিত করিব। সংপ্রতি রাজনগর ঢাকানগর, বিক্রমপুর, সুবর্ণগ্রাম প্রভৃতির অবস্থাদর্শনে মনের অবস্থা যদ্রূপ হইল, অদ্য আন্তরিক আক্ষেপে কেবল তাহাই উল্লেখ করিলাম।

ঢাকার নবাবদিগের পুরাতন প্রাসাদ প্রভৃতি দুর্গের দুর্গতি-দৃষ্টে কেবল নয়ননীরে নিমগ্ন হইতে হয়। যদিও পূর্ব্বানুরূপ কিছুই নাই, তথাচ অবশিষ্ট যাহা আছে, তাহাই দেখিয়া নয়নের নিমিষ ফেলিতে ইচ্ছা হয় না।—আহা! কি পরিতাপ! এইক্ষণে বিক্রমপুরের সে বিক্রম নাই, সেই কীর্ত্তিকুশল পৃথ্বীপতি বিরাজমান নাই, সেই রাজবংশের সেই রাজমর্য্যাদা আর কিছুই নাই, রাজনগরের সে শোভাই নাই, কিছুই নাই, কিছুই নাই।

মধুহীন মধুচক্রের ন্যায় শুষ্ক স্থান মাত্র রহিয়াছে, তদ্দৃষ্টে অতি নিষ্ঠুর পাষণ্ড ব্যক্তির পাষাণময় হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হইতে থাকে। যে রাজপরিবার পূর্ব্বে পারীন্দ্রবৎ প্রচুরপরাক্রম প্রচার পূর্ব্বক মহাবল পরাক্রান্ত কুঞ্জরের উচ্চ গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেন, অধুনা গ্রহ-বৈগুণ্য জন্য তাঁহারা সর্ব্বোতোভাবে সামর্থ্যশূন্য হইয়া কুরঙ্গ অপেক্ষাও হীনবল হইয়াছেন। ফণীর মণি নাই, ফণা নাই, ধরাধর ধরাতলে পতিত হইয়াছে, তাহার উপর গোষ্পদের জল প্রবল হইয়া তরঙ্গরঙ্গ বিস্তার করিতেছে। মহাসমুদ্র শুষ্ক হই-য়াছে, তাহার বক্ষে বিশাল-বিজন-বিরল-বিপিন বিরচিত হইবায় ভয়ঙ্কর হিংস্রজন্তুব্যূহ বিচরণ করিতেছে। কালের ধর্ম্মই এইরূপ, কালের কর্ম্মই এইরূপ। কালে কিছুই থাকেনা, কাল সকলি করিতেছেন, কাল সকলি হরিতেছেন, অতএব বিলাপ করা বৃথা হইতেছে, কারণ এইকাল কালস্বরূপ হইয়া কালে ঐ কীর্ত্তি-নাশাকে কীর্ত্তিনাশা করত সমস্ত রাজকীর্ত্তি নাশ করিয়াছে।

সংবাদ ভাস্কর।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য।

দেশীয় ভাষানভিজ্ঞের প্রতিফল।

যে দেশে যে ভাষার চলন থাকে, সে দেশীয় মনুষ্যদিগের সকল অভিপ্রায় সেই ভাষায় ব্যক্ত হয়, কিন্তু ঐ সকল ভাষার শব্দ অগণ্য এবং তাহার অর্থও নানা প্রকার আছে, দেশীয় লোকেরাই সকল শব্দের সকল অর্থ বুঝিতে পারেন না, অন্যের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হয়, অতএব জ্ঞানী লোকেরা কহেন, যদি ভিন্নদেশীয় লোকেরা অপর দেশের ভাষার ব্যবহার করেন, তবে তাহার শব্দ এবং শব্দার্থ শিক্ষায় বিলক্ষণ মনোযোগ করিবেন। কারণ আপনারা শব্দবোধে অনভিজ্ঞ হইলে, অজ্ঞের নিকট এক শব্দ অন্য প্রকার বলিবার সম্ভাবনা, এবং শব্দার্থ না জানিলে এক শব্দের তাৎপর্য্য অন্যরূপে বলেন, তাহাতে শ্রোতারা এক বিষয় অন্যপ্রকার বুঝিয়া যদ্যপি বিপরীত ব্যবহার করেন, তবে অনিষ্টসম্ভাবনাও আছে, ইহার এক উদাহরণ বলি মনোযোগ কর।

ধান্য নগরে মাধবদাস নামে এক ক্ষত্রিয় ছিলেন, তিনি প্রথমাবস্থায় যুদ্ধশিক্ষা করিয়া অস্ত্রশস্ত্র চালননিপুণ হইলেন, এবং ঐ বিদ্যার প্রভাবেই অনেক রাজ্য হস্তগত করিলেন তৎপরে যখন দেখিলেন, রাজ্যসাধনবিষয়ে অভিলাষের শেষ হইয়াছে, তখন কমলপুরনামক সুশোভিত রাজধানীতে অবস্থান

করিতে লাগিলেন, এই সময়ে ধান্য নগর হইতে মাধবদাসের আত্মীয় পরিবারাদির আগমন হইল এবং জ্ঞাতিকুটুম্বেরাও ক্রমে কমলপুরে আইলেন। অনন্তর এক দিবস মাধবদাসের গুরু পুরোহিত একত্র হইয়া পরামর্শ করিলেন, মাধবদাস কমল-পুরে রাজা হইয়াছেন, তাঁহার আত্মীয় পরিবার জ্ঞাতি কুটু-ম্বেরাও সেই স্থানে গেলেন, তবে আমরা ধান্য নগরে কি অবলম্বনে রহিলাম, চল কমলপুরে গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি, তিনি অবশ্য আমাদিগকেও নিকটে রাখিবেন। এই পরামর্শ করিয়া গুরু পুরোহিত কমলপুরে গমন করিলেন, কিন্তু তৎকালীন মাধবদাসের দ্বারে অনেক দ্বারী ছিল, তাহারা বিদেশীয় লোক, সংস্কৃত ভাষার কিছুই জানে না, তথাচ ঐ গুরু পুরোহিত সংস্কৃত ভাষায় কহিলেন, "রাজাকে সমাচার বল, ধান্যনগর হইতে গুরু পুরোহিত আসিয়াছেন।" দৌবারিক-দিগের নিকট বারম্বার এই কথা বলেন, তাহারা তাহা বুঝিতে পারে না অতএব দৌবারিকেরা মহা বিরক্ত হইয়া ভাবিতে লাগিল, রাজার নিকট সমাচার না দিলে তাহাদিগের দণ্ড হইবে, অতএব এক ব্যক্তি ঐ কথা শুনিয়া রাজসমীপে বলিতে গেল, কিন্তু যাইতে যাইতে আনুপূর্ব্বিক ভুলিয়া গিয়া হিন্দী ভাষায় কহিল, মহারাজ গুরুনগর হইতে ধান্য আসিয়াছে, কি আজ্ঞা হয়। রাজা ভাবিলেন তাঁহার এক গ্রামের নাম গুরুনগর বটে, সেই স্থান হইতে ধান্য আসিয়া থাকিবে, অতএব কহি-লেন, ধান্য নিয়া গোলায় রাখ, পরে বিবেচনা হইবে। এই

কথা শ্রবণে দৌবারিক নীচে গিয়া কহিল, তোমাদিগকে গোলায় রাখিতে আজ্ঞা দিলেন, চল, সেই স্থানে রাখিয়া আসি। তাহাতে গুরু পুরোহিত ভাবিলেন, গোলা নামে কোন উত্তম গৃহ আছে, সেই স্থানে আমাদিগকে লইয়া যাইতেছে, ইহার পরে রাজা আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন, এবং গোলার কপাট খুলিয়া যখন ধান্যের উপর বসিতে কহিল, তৎকালেও মনে করিলেন এ দেশের এই ব্যবহার থাকিবে যে, গুরু পুরোহিত আসিলে তাঁহাদিগকে প্রথমতঃ লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে বসাইতে হয়, এই জন্যই বুঝি গোলায় লইয়া আসিল। কিন্তু যখন চাবি দিয়া দৌবারিক চলিয়া গেল, সন্ধ্যা পর্য্যন্তও কেহ জিজ্ঞাসা করিল না, তখন তাঁহারা মনে করিলেন আমাদিগের দুঃখের কোন কারণ ঘটিয়াছে, নতুবা মাধবদাস যথার্থ জানিতে পারিলে কদাচ এরূপ হইত না; অতএব গুরু পুরোহিত এবং ভৃত্য তিন জনে মহা কোলাহল করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতেও দৌবারিকেরা কপাট খুলিয়া দিলেক না, বরং বাহিরে থাকিয়া আরো তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। পরে ঐ কোলাহল রাজার কর্ণগোচর হইল, যে, ধান্যের গোলায় লোক বদ্ধ রহিয়াছেন, অতএব রাজা দৌবারিকগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ধান্যের গোলার মধ্যে কেন গোলমাল হইতেছে? তাহাতে দৌবারিক কহিল, আমি তখন বলিয়াছি গুরুপুর হইতে ধান্য আসিয়াছে, কি আজ্ঞা হয়, তাহাতে মহারাজ ধান্য গোলাতে রাখিতে অনুমতি করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে সেই

স্থানে রাখিয়াছি, এইক্ষণে তাহারাই চীৎকার করিতেছে। ইহাতে রাজা কহিলেন, ওরে মূর্খ! এ যে মনুষ্যের চীৎকার শুনিতেছি, ধান্য কি মনুষ্যের ন্যায় চীৎকার করিতে পারে? কেমন ধান্য রাখিয়াছিস, এই স্থানে লইয়া আয়, বিবেচনা করি। তৎপরে দৌবারিক গিয়া গোলার কপাট খুলিয়া গুরু, পুরোহিত, ভৃত্য তিন, ব্যক্তিকে আনয়ন করিলে মাধবদাস মহালজ্জিত হইলেন এবং নানাপ্রকার স্তুতিবাক্যে তাঁহাদিগকে শান্ত করিয়া ঐ দৌবারিককে তাড়না দিলেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি সে দেশের ভাষার পদপদার্থজ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞ হইলে তাহার এ দশা হইত না এবং গুরু পুরোহিতেরাও দুঃখ পাইতেন না।

সক্রেটিসের উপদেশ দিবার বৃত্তান্ত।

সক্রেটিসের চরিত্র যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়া তিনি সাধারণের বিশেষতঃ স্বদেশীয় যুবকদের উপদেশার্থে যে কি পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ এক্ষণে লেখা যাইতেছে, কেন না তাহাদিগকে সৎশিক্ষা দেওয়াতেই তাঁহার নাম প্রকৃতরূপে উজ্জ্বল হয়।

লিবেনিয়স* কহিয়াছেন যে তিনি স্বদেশী লোকের সুখ ও সৌভাগ্যবৃদ্ধির নিমিত্ত এমত উদ্যোগী ছিলেন যে, জনসাধারণে তাঁহাকে পিতার ন্যায় জ্ঞান করিত। কিন্তু বৃদ্ধলোকদের ব্যবহারশোধন দুষ্কর, কেন না যাহারা আজন্মকাল মিথ্যাজ্ঞানের বিড়ম্বনায় প্রবীণ হয়, তাহারা পূর্ব্ব সংস্কার ত্যাগ করিয়া সহজে নূতন মত গ্রহণ করিতে পারে না, একারণ তিনি যুবকদের শিক্ষাতেই বিশেষ যত্নবান হয়েন, ফলতঃ উর্ব্বরা ভূমিতেই ধর্ম্মের বীজ রোপণ করা পরামর্শসিদ্ধ।

অন্যান্য দার্শনিক পণ্ডিতেরদের ন্যায় সক্রেটিসের কোন নির্দ্দিষ্ট প্রকাশ্য পাঠশালা ছিল না, এবং শিক্ষা দিবারও নিয়মিত কাল ছিল না, তিনি ছাত্রবর্গের জন্য বেঞ্চ প্রভৃতি বিশেষ উপ-

---

* লিবেনিয়স—এক জন গ্রীসদেশীয় আলঙ্কারিক। ৩২৪ খৃঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়।

বেশন প্রস্তুত করেন নাই, এবং আপনিও অধ্যাপনার সময় কোন প্রশস্ত আসন গ্রহণ করিতেন না, উপদেশের দেশ কাল পক্ষে কোন নিয়ম ছিল না, সকল স্থানে, সকল কালেই এবং রণস্থল, শিবির, রাজকীয় সমাজ, কারাগারাদি সকল স্থানেই বিদ্যাবিতরণের যত্নপ্রকাশ করিতেন। প্লুটার্ক † কহেন যে, অবশেষে বিষপানকালীনও তিনি জ্ঞানের কথা বিস্তারকরণে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার এই ব্যবহারের প্রসঙ্গে বিচক্ষণ গ্রন্থকর্ত্তা রাজনীতিবিষয়ক এক উত্তম নিয়মের বর্ণনা করিয়াছেন। যথা "সাধারণের উপকারকরণার্থে রাজকর্ম্মে বাস্তবিক নিযুক্ত হওয়া, অথবা বিবাদনিষ্পত্তির নিমিত্ত বিচারকের পরিচ্ছদ গ্রহণপূর্ব্বক উচ্চতর বিচারাসনে উপবিষ্ট হওয়া নিতান্ত আবশ্যক নহে, অনেকে এপ্রকার পদ প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু তাহারা সেনেটর বক্তা ইত্যাদ সুচারু উপাধি প্রাপ্ত হইলেও যদি তৎসম্বন্ধীয় ধর্ম্মে ও কার্য্যসাধনে তৎপর না হয়, তবে তাহাদিগকে সামান্য লোক মাত্র জ্ঞান করা কর্ত্তব্য, এমত লোককে বরং পামর ও ইতর জনতামধ্যেও গণ্য করাতে হানি নাই। যে ব্যক্তি পৃষ্ট হইলে সৎপরামর্শ দানে সমর্থ, এবং পৌরজনগণকে ধর্ম্মানুযায়ী ও দয়াসত্যন্যায়ানুরাগী এবং স্বদেশীয়হিতার্থে যত্নশালী করিতে যাহার ক্ষমতা আছে, সে ব্যক্তি যেমত পদ কিম্বা অবস্থাতে থাকুক, তাহাকেই সত্যবিচারক ও সত্যশাসক কহিতে হয়।"

† এক জন গ্রীসদেশীয় জীবনবৃত্তরচয়িতা।

সক্রেটিসও এই প্রকার লোক ছিলেন। তিনি নব্য পুরুষদিগকে হিতোপদেশ দ্বারা সৎশিষ্য করিয়া রাজ্যের কি পর্য্যন্ত উপকার করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনাতে লেখনী সমর্থা হয় না। কোন উপদেশক তাঁহা অপেক্ষা অধিক শিষ্যকে একত্র করিতে কখন পারে নাই, আর তাঁহার ন্যায় অন্য কাহারও শিষ্য মহোদয় ছিলেন না। প্লেটো* একাকীই সহস্রগুণরাশি, তিনি মরণকালে এই বলিয়া করুণানিধান ঈশ্বরের স্তব করিয়াছিলেন যে, বিবেকশক্তিবিশিষ্ট জীব হইয়া ম্লেচ্ছভূমিতে না জন্মিয়া গ্রীসদেশে জন্মলাভ করিয়াছেন, এবং অন্যকালে সংসারযাত্রা না করিয়া সক্রেটিসের পবিত্র জীবনকালে জন্মপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব বিধাতাকে ধন্য! জেনফনও† তাঁহার উপদেশে কৃতার্থম্মন্য হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, সক্রেটিস তাঁহাকে এক দিন রাজমার্গে দেখিয়া যষ্টিনোদন দ্বারা স্থগিত করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "খাদ্যদ্রব্য কোথায় বিক্রয় হয়, তাহা জান?" জেনফন হট্টের পথ দেখাইয়া এ প্রশ্নের উত্তর সহজেই দিয়াছিলেন,পরে সক্রেটিস পুনশ্চ জিজ্ঞাসিলেন "সুনীতির শিক্ষা কোথায় পাওয়া যায়?" এ কথায় জেনফন কিয়ৎক্ষণ নিরুত্তর হইলে ঐ পণ্ডিত স্বয়ং কহিলেন, "সুনীতিশিক্ষার স্থল যদি জানিতে চাহ, তবে আমার সহিত আইস, আমি দেখাইব?"

* প্লেটো—এক জন গ্রীসদেশীয় সুবিখ্যাত দার্শনিক। ইনি সক্রেটিসের অন্যতম শিষ্য।

† এক জন গ্রীসদেশীয় ইতিহাসরচয়িতা।

জেনফন তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত গমন করিলেন। পরে ঐ জেনফন সর্ব্বাগ্রে গুরুর উপদেশ সংগ্রহ করিয়া লোকশিক্ষার্থ প্রকাশ করেন।

আরিষ্টিপস † একবার সক্রেটিসের কথা যৎকিঞ্চিৎ শ্রবণ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকারে এত ব্যগ্র হইয়াছিলেন যে, ঐ জ্ঞানসিন্ধুর নিকট গিয়া সদসৎ বিবেকের সূত্র এবং অনর্থনিরসনের পথলাভের চিন্তায় শীর্ণশরীর ও ক্লিষ্টাঙ্গ হইয়াছিলেন, পরে তদুপদেশ অর্জ্জন করিয়া জন্ম সফল করিয়াছিলেন।

মেগারা দেশীয় ইউক্লিডের বিষয়ে যাহা লিখিত আছে, তাহাতে আরো স্পষ্ট বোধ হয় যে, সক্রেটিসের শিষ্যেরা তাঁহার উপদেশ প্রাপ্ত্যর্থে বিজাতীয় ব্যগ্র হইত। এথেন্স এবং মেগারাদেশীয় লোকদের মধ্যে সে কালে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে উভয় দলস্থ সৈন্যের পরস্পর এবম্বিধ দ্বেষ ও হিংসা জন্মিয়াছিল যে এথেন্স নগরের পৌরজনেরা নিজ সেনানীগণকে বৎসরে বৎসরে দুইবার মেগারা রাজ্যে উপদ্রব করিতে শপথ করাইয়াছিল, এবং নিয়ম করিয়াছিল যে, শত্রুপক্ষের কেহ আটিকাদেশে পদার্পণ করিলেই শমনভবন গত হইবে। তথাপি সক্রেটিসের উপদেশ গ্রহণার্থে ইউক্লিডের মনোবাসনা শিথিল হয় নাই। তিনি সায়ংকালে মুখে অবগুণ্ঠন দিয়া নারীর বেশে সক্রেটিসের বাটীতে আসিতেন, পরে রাত্রি প্রবাস করিয়া প্রত্যূষে পুনশ্চ ঐরূপে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেন।

---

† এক জন গ্রীসদেশীয় দার্শনিক। সক্রেটিসের শিষ্য।

সক্রেটিসের শিষ্য হওনার্থে এথেন্স নগরীর নব্য লোক-দের কি পর্য্যন্ত প্রয়াস ছিল, তাহা বর্ণনা করিলে আপাততঃ উৎকট বোধ হইবে। তাহারা তাঁহার নিকটস্থ হইয়া উপদেশ শুশ্রূষায় পিতামাতা ও ক্রীড়া কৌতুকাদি সমস্ত পরিহার করিত। ইহার এক উদাহরণ আল্‌কিবায়েডিসের চরিত্রেতে দৃষ্ট হই-য়াছে। আল্‌কিবায়েডিস অতি প্রচণ্ডস্বভাবপ্রযুক্ত স্বজাতীয় লোকের মধ্যে সদা অহঙ্কারে আস্ফালন করিতেন। সক্রেটিস কখনও তাঁহার ঐ গর্ব্ব ও আস্ফালন দমনে ত্রুটি করেন নাই। উদারবংশ্য যুবকেরা ধন গৌরবে যে প্রকার স্ফীত হইয়া থাকে, আল্‌কিবায়েডিস এক দিবস তদ্রূপ স্ফীত হইয়া ধনসম্পত্তির দর্প করিতেছিলেন, সক্রেটিস তাহা দেখিয়া উহাঁকে এক ধরাতলের মেপ অর্থাৎ নক্‌সাতে আটিকাদেশ লক্ষিত করিতে কহিয়া-ছিলেন। কিন্তু অতি ক্ষুদ্রতাহেতুক ঐ দেশ প্রথমতঃ উহাঁর দৃষ্টিগোচর হয় নাই, পরে বহু ক্লেশে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, "এদেশ অতি ক্ষুদ্র, নক্‌সাতে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না।" সক্রে-টিস উত্তর করিলেন "তবে দেখ তুমিও কেমন ক্ষুদ্রপরিমাণ ভূমির জন্য অভিমান করিয়া থাক।" একথা আরো বাহুল্যরূপে বিস্তার করিলে হানি হইত না, কেননা এথেন্স যেমত সমস্ত গ্রীশ দেশের সহিত তুলনাতে বিন্দুমাত্র বোধ হয়, তদ্রূপ গ্রীশ-দেশ ইউরোপের পক্ষে, ও ইউরোপ পৃথিবীর পক্ষে, এবং পৃথিবী ও দশদিক্‌স্থ অপরিচ্ছিন্ন খগোলের পক্ষে অণুমাত্র, অতএব অতি পরাক্রান্ত রাজাও এই অপার ব্রহ্মাণ্ড এবং অনন্ত আকাশের মধ্যে ক্ষুদ্র কীট ও নগণ্য।

অপর এথেন্স নগরীয় যুবকেরা থেমিষ্টক্লিস, সাইমন, এবং পেরিক্লিশের মহত্ত্বদর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিল এবং আপনার ও যশঃস্পৃহাতে মুগ্ধ হইয়া ভাক্ত তার্কিকেরদের উপদেশ গ্রহণানন্তর আপনাদিগকে সর্ব্ববিষয়ে সক্ষম জ্ঞান করিয়া উচ্চ পদের আকাঙ্ক্ষা করিত, কেননা ঐ তার্কিকেরা স্বশিষ্যগণকে উত্তম রাজনীতিজ্ঞ করিবেন বলিয়া আড়ম্বর করিতেন। ঐ যুবকদের মধ্যে গ্লাকো নামে একজন বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমেই রাজকীয় কার্য্যের ভার প্রাপ্ত্যর্থ এমত দৃঢ়তর আকাঙ্ক্ষী হইয়াছিলেন যে, তাঁহার জ্ঞাতি কুটুম্বের মধ্যে কেহই ঐ দুরাগ্রহ ও অসঙ্গত স্পৃহা হইতে তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারেন নাই, কেবল সক্রেটিস ঐ বালকের ভ্রাতা প্লেটোর অনুরোধে নানাবিধ প্রবোধবাক্যে উক্ত অভিলাষ হইতে তাহাকে ক্ষান্ত করাইয়াছিলেন।

সক্রেটিস এক দিবস উহাঁর সাক্ষাৎকার পাইয়া এমত সারল্যের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন যে, সে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে লাগিল। সক্রেটিস কহিলেন, "তুমি কি রাজ্যশাসনের ভার লইতে অভিলাষ করিতেছ?" গ্লাকো উত্তর করিল, "হাঁ তাহাই বটে। সক্রেটিস পুনশ্চ কহিলেন, "অভিলাষ মহোদয়ের পক্ষে উচিত বটে, কেননা, এমত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলে বন্ধুবর্গের মহোপকার করিতে পারিবেন। এবং পরিজনের শ্রীবৃদ্ধি ও দেশের উন্নতিসাধনেরও সক্ষম হইবেন,তাহাতে আপনার সুখ্যাতি এথেন্স নগরেও সমস্ত গ্রীক দেশে ব্যাপিবার সম্ভাবনা, এবং থেমিষ্টক্লিশের ন্যায় ম্লেচ্ছ জাতিদের মধ্যে ও

তোমার যশোবিস্তার হইবে, আর তুমি যেখানে থাক, পৃথিবীর সকল লোকেরই প্রতিষ্ঠাভাজন হইবে।”

সক্রেটিসের এমন মধুর মনোরম্য উক্তিতে ঐ গর্ব্বিত যুবক অত্যন্ত আমোদিত ও মোহিত হইয়া ঔৎসুক্যপূর্ব্বক তাঁহার সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইল, শুশ্রূষা জন্মাইবার নিমিত্ত আর অধিক অনুরোধ করিতে হইল না, পরে এইরূপ কথোপকথন হইতে লাগিল। সক্রেটিস বলিলেন, “তুমি যশ ও সুখ্যাতির স্পৃহা করিতেছ, অতএব সাধারণের উপকার করিতেও অবশ্য তোমার বাসনা আছে।” গ্লাকো, “হাঁ অবশ্য।” সক্রেটিস, “ভাল, তবে প্রথমতঃ দেশের কি উপকার করিতে বাসনা কর, ইহা করিলে পরমাপ্যায়িত হইব।” গ্লাকো এ কথার উত্তর শীঘ্র প্রদানে অক্ষম হইয়া বক্তব্য কি তাহা ভাবিতে লাগিলেন। পরে সক্রেটিস কহিলেন, “বোধ করি, তুমি স্বদেশকে ধনাঢ্য করিতে অর্থাৎ রাজস্ববৃদ্ধি করিতে মানস করিতেছ।” গ্লাকো “যথার্থ অনুমান করিয়াছ।” সক্রেটিস, “তবে বোধ করি, রাজস্ববিষয়ে তোমার বিশেষ অবগতি আছে, তাহার যথার্থ গণনা অবশ্য করিয়া থাকিবে, এবং সমস্ত বৃত্তান্ত তোমার কণ্ঠাগ্রে আছে, দৈবাৎ কোন বিষয়ে উৎপত্তির ব্যাঘাৎ হইলে প্রকারান্তরে অপ্রতুল নিবারণের ক্ষমতাও থাকিবে।” গ্লাকো, “না এ বিষয় আমি কখন চিন্তা করি নাই।” সক্রেটিস “তথাপি রাজ্যের ব্যয় কত, নিতান্ত পক্ষে তাহাও জান, কেননা যে যে বিষয়ে অপব্যয় হইয়া থাকে, তাহা স্থগিত করা আব-

শ্যক।” গ্লাকো, “ইহাও আমি জানি না।” সক্রেটিস, “তবে দেশকে ধনাঢ্যকরণের প্রতিজ্ঞাসাধনে এক্ষণে বিলম্ব করিতে হইবে, কেননা, রাজ্যের আয় ব্যয় কত তাহাতে অবগত না হইয়া ইহা করিতে পারিবে না।”

গ্লাকো পুনশ্চ কহিল, “দেশের উপকার করিবার অন্য ধারা আছে, আপনি তাহার উল্লেখ করেন নাই, শত্রুকুলধ্বংস করিয়াও রাজ্যের উপকার করা যায়।” সক্রেটিস, “যথার্থ বটে, কিন্তু রাজ্য বলবত্তম না হইলে শত্রুধ্বংস হইতে পারে না, কেননা বল অল্পতর হইলে যাহা আছে, তাহাও নষ্ট হইতে পারে, একারণ যুদ্ধের প্রসঙ্গ করিলে উভয় পক্ষের সৈন্য গণনা করিতে হয়, রাজ্যের বল অধিক দেখিলেই যুদ্ধোদ্যোগের পরামর্শ দেওয়া যাইতে পারে। আর রাজ্যের বল অল্প হইলে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত থাকিবার মন্ত্রণা দেওয়া কর্ত্তব্য। তুমি কি আমাদের রাজ্যের বল গণনা করিয়াছ? এবং জলপথে বা স্থলপথে বিপক্ষসৈন্যের সংখ্যাও কি অবগত আছ? এ বিষয়ের কোন লিখন কি তোমার নিকটে আছে? যদি থাকে, তবে আমাকে একবার দেখাইলে বাধিত হইব।” গ্লাকো, “এক্ষণে আমার নিকট সে গণনা নাই।” সক্রেটিস, “তবে দেখিতেছি, তুমি রাজ্যভার লইলে দেশে সম্প্রতি যুদ্ধ হইবে না, কেননা এখনও তোমাকে অনেক পরিশ্রমপূর্ব্বক এ বিষয়ের তথ্যাতথ্যের অনুসন্ধান করিতে হইবে, তাহা না করিয়া তুমি কখনও যুদ্ধ করিবে না।’

সক্রেটিস এই প্রকারে অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রশ্ন করিলে তাহাতেও গ্লাকোর অনভিজ্ঞতা প্রকাশ পাইল। অবশেষে সে আপনি স্বীকার করিল যে, কোন বিষয়ের তথ্যাতথ্য না জানিয়া কেবল আত্মশ্লাঘা এবং উচ্চতর পদ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা প্রযুক্ত রাজ্যশাসনের ভার লইতে ব্যগ্র হওয়া অত্যন্ত উপহাসের কথা। পরে সক্রেটিস কহিলেন, "হে সৌম্য! সাবধান হইও, যশের অত্যন্ত তৃষ্ণাতে এমত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না, যাহাতে তোমার অসামর্থ্য ও সামান্য ব্যুৎপত্তি প্রকাশ পাইয়া তোমাকে অপ্রতিভ ও লজ্জিত করিবে।"

গ্লাকো সক্রেটিসের সৎপরামর্শে চেতনা পাইয়া সাধারণ সমাজে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে গোপনভাবে সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। উক্ত বৃত্তান্ত সকল কালের লোককে উপদেশ দেওয়া সর্ব্ববিধ মনুষ্যের হিতকারী হইতে পারে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

সর আইজাক নিউটন।

যে বৎসর গালিলিয় কলেবর পরিত্যাগ করেন, সেই বৎসরে আইজাক নিউটনের জন্ম হয়। এই মহাপুরুষ, লিঙ্কলনসায়রের অন্তঃপাতী কোল্টস্‌ওয়ার্থনামক গ্রামে, ১৬৪২ খৃঃ অব্দের ২৫ শে ডিসেম্বর শরীরপরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতা তাদৃশ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না, কেবল যৎকিঞ্চিৎ ভূমিকর্ষণ দ্বারা জীবিকাসম্পাদন করিতেন। বোধ হয়, নিউটন কোপর্নিকসের ও গালিলিয়ের উদ্ভাবিত বিষয় সমূহের প্রামাণ্যসংস্থাপনার্থেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনি, প্রথমতঃ মাতৃসন্নিধানে কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়া, দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে, গ্রস্থামনগরে লাটিন পাঠশালায় প্রেরিত হন। তথায়, শিল্পবিষয়ক নব নব কৌশল প্রকাশ দ্বারা, তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধির লক্ষণ প্রদর্শিত হয়। ঐ সকল শিল্পকৌশল দর্শনে তত্রত্য লোকেরা চমৎকৃত হইয়াছিল। পাঠশালার সকল বালকই, বিরামের অবসর পাইলে, খেলায় আসক্ত হইত; কিন্তু তিনি সেই সময়ে নিবিষ্টমনা হইয়া, ঘরট্টপ্রভৃতি যন্ত্রের প্রতিরূপ নির্ম্মাণ করিতেন। একদা, তিনি একটা পুরাণ বাক্স লইয়া জলের ঘড়ি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ ঘড়ীর শঙ্কু, বাক্স মধ্য হইতে অনবরতবিনির্গতজলবিন্দুপাত দ্বারা নিমগ্নকাষ্ঠখণ্ড-

প্রতিঘাতে, পরিচালিত হইত; বেলাববোধনার্থ তাহাতে একটী প্রকৃত শঙ্কুপট্ট ব্যবস্থাপিত ছিল।

নিউটন পাঠশালা হইতে বহির্গত হইলে, ইহাই স্থির হইয়াছিল, তাঁহাকে কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইবেক। কিন্তু অতি ত্বরায় ব্যক্ত হইল, তিনি ওরূপ পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপারে কোন ক্রমে সমর্থ নহেন। সর্ব্বদা এরূপ দেখা যাইত, যে সময়ে তাঁহাকে পশুরক্ষণ ও ভৃত্যগণের প্রত্যবেক্ষণ করিতে হইবেক, তখন তিনি নিশ্চিন্তমনে তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া অধ্যয়ন করিতেন। কৃষিলব্ধদ্রব্যজাতবিক্রয়ার্থে গ্রামের আপণে প্রেরিত হইলে, তিনি স্বসমভিব্যাহারী বৃদ্ধ ভৃত্যের উপর সমস্ত কার্য্যনির্ব্বাহের ভার সমর্পণ করিয়া, পরিশুষ্ক তৃণরাশির উপর উপবেশনপূর্ব্বক, গণিতবিষয়ক প্রশ্ন সমাধান করিতেন। জননী, বিদ্যাভ্যাসবিষয়ে তাঁহার এইরূপ স্বাভাবিক অতি প্রগাঢ় অনুরাগ দর্শনে সমুৎসুকা হইয়া, পুনর্ব্বার আর কয়েক মাসের নিমিত্ত,তাঁহাকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলেন। পরে, ১৬৬০ খৃঃ অব্দের ৫ই জুন, তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী ত্রিনীতিনামক বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থিরূপে পরিগৃহীত হইলেন।

নিউটন পরিশ্রম, প্রজ্ঞা, সুশীলতা ও অহমিকাশূন্য আচরণ দ্বারা আইজাক বারো প্রভৃতি অধ্যাপকবর্গের অনুগৃহীত ও সহাধ্যায়িগণের প্রশংসাভূমি ও প্রণয়ভাজন হইয়াছিলেন। তিনি, কেম্ব্রিজে প্রবিষ্ট হইয়া, প্রথমতঃ সন্দর্সনরচিত ন্যায়শাস্ত্র, কেপ্লর প্রণীত দৃষ্টিবিজ্ঞান, ওয়ালিসলিখিত অস্থিতপাটীগণিত এই

কয়েক গ্রন্থ পাঠ করেন; সাতিশয় পরিশ্রমসহকারে ডেকার্ট-রচিত রেখাগণিত গ্রন্থ ও অধ্যয়ন করেন; আর, তৎকালে নক্ষত্র-বিদ্যার কিছু কিছু চর্চ্চা থাকাতে, তাহারও অনুশীলন করিয়াছিলেন। তিনি ইউক্লিডের গ্রন্থ অত্যল্পমাত্র পাঠ করেন। এরূপ প্রসিদ্ধ আছে তিনি, প্রাচীন গণিতজ্ঞদিগের গ্রন্থ উত্তমরূপে পাঠ করা হয় নাই বলিয়া, উত্তর কালে অনুতাপ করিয়াছিলেন।

নিউটন কেম্ব্রিজে অধ্যয়নকালে, আলোকপদার্থের তত্ত্ব-নির্ণয়ার্থ অত্যন্ত যত্নবান হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে এই বিষয়ে লোকের অত্যল্প জ্ঞান ছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত ডেকার্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, অন্তরীক্ষব্যাপী স্থিতিস্থাপকগুণোপেত অতিবিরল পদার্থবিশেষের সঞ্চালনবিশেষদ্বারা আলোকের উৎপত্তি হয়। নিউটন এই মত খণ্ডন করিলেন। তিনি, অন্ধকারাবৃত গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বহুকোণবিশিষ্ট একখণ্ড কাচ লইয়া, কপাটের ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা তদুপরি সূর্য্যের কিরণ পাতিত করিতে লাগিলেন। এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে পাইলেন, আলোক কাচের মধ্য দিয়া গমন করিয়া এপ্রকার ভঙ্গুর হইয়াছে যে, ভিত্তির উপর সপ্তবিধ বিভিন্ন বর্ণ প্রকাশ পাইয়াছে। অনন্তর, অসাধারণ কৌশলপূর্ব্বক অশেষপ্রকারে পরীক্ষা করিয়া, তিনি এই কয়েক মহোপকারক বিষয় নির্দ্ধারিত করিলেন—আলোকপদার্থ কিরণাত্মক, ঐ সকল কিরণকে বিভক্ত করিয়া অণু করা যাইতে পারে; শুক্ল আলোকের

প্রত্যেক কিরণে রক্ত, পীত, নীল এই তিন মূলীভূত কিরণ আছে; এই ত্রিবিধ কিরণ অপেক্ষাকৃত ন্যূনাধিক ভঙ্গুর হইয়া থাকে। নিউটনের এই অসাধারণ অভিনব আবিষ্ক্রিয়াকে দৃষ্টিবিজ্ঞানশাস্ত্রের মূলসূত্রস্বরূপ গণনা করিতে হইবেক।

১৬৬৫ খৃঃ অব্দে, কেম্ব্রিজনগরে ঘোরতর মারীভয় উপস্থিত হওয়াতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদায় ছাত্রকে স্থানত্যাগ করিতে হইয়াছিল। নিউটনও ঐ সময়ে আত্মরক্ষার্থে আপন আলয়ে পলায়ন করিলেন। তথায় পুস্তকালয়ের অসদ্ভাবপ্রযুক্ত ইচ্ছানুরূপ পুস্তক পাঠ করিতে পাইতেন না; এবং পণ্ডিতবর্গের অসন্নিধানপ্রযুক্ত শাস্ত্রীয় আলাপেরও সুযোগ ছিল না, তথাপি তিনি ঐ সময়ে গুরুত্বের নিয়ম অর্থাৎ বস্তুমাত্রের ভূতলাভিমুখে পাতপ্রবণতার বিষয় প্রথম প্রকাশ করিয়াছেন। এই মহীয়সী আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা, নিউটনের অনধ্যায় বৎসর সকল, তাঁহার জীবনের শ্লাঘ্যতম ভাগ ও বিজ্ঞানশাস্ত্রীয় ইতিবৃত্তের চিরস্মরণীয় ভাগ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

এক দিবস, তিনি উপবনমধ্যে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দৈবযোগে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী আত্রবৃক্ষ হইতে এক ফল পতিত হইল। তদ্দর্শনে তিনি তৎক্ষণাৎ বস্তুমাত্রের পতননিয়ামক সাধারণকারণবিষয়িণী পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর, তিনি এই বিষয় পুনর্ব্বার আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন, যে কারণবশতঃ আত্র ভূতলে পতিত হইল, সেই কারণেই চন্দ্র ও গ্রহমণ্ডলী স্ব স্ব কক্ষে ব্যবস্থাপিত আছে, এবং

তাহাই পরমাদ্ভুত শক্তিসহকারে অতি সহজে সমুদয় জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর গতি নিয়মিত করিতেছে। এইরূপে গুরুত্বের নিয়ম আবিষ্কৃত হইল। এই নিয়মের জ্ঞান দ্বারা জ্যোতির্বিদ্যার মহীয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

নিউটন, ১৬৬৭ খৃঃ অব্দে, কেম্ব্রিজে প্রত্যাগমন করিয়া, ত্রিনীতি বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। দুই বৎসর পরে, তাঁহার বন্ধু ডাক্তর বারো গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক পদ পরিত্যাগ করিলে, তিনি তাহাতে নিযুক্ত হইলেন। তিনি দৃষ্টিবিজ্ঞান-বিষয়ে যে সকল অভিনব মহৎ নিয়ম প্রকাশ করিয়াছিলেন, প্রথমতঃ কিছুকাল ঐ সমস্ত লইয়াই অধিকাংশ উপদেশ প্রদান করিলেন। আলোক ও বর্ণ বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকাতে, আপনার নূতন মত এমন স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, শ্রোতৃবর্গ সন্তুষ্টচিত্তে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

১৬৭১ খৃঃ অব্দে, রয়েল সোসাইটী নামক রাজকীয় সমাজের ফেলো অর্থাৎ সহযোগী হইলেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ আছে, অন্যান্য সহযোগীর ন্যায় সভার ব্যয়নির্ব্বাহার্থে প্রতি সপ্তাহে রীতিমত এক এক সিলিং দিতে অসমর্থ হওয়াতে তাঁহাকে অগত্যা অদানের অনুমতি প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। তৎ-কালে বিদ্যালয়ের বৃত্তি ও অধ্যাপকের বেতন এতদ্ব্যতিরিক্ত তাঁহার আর কোন প্রকার অর্থাগম ছিল না; আর, পৈতৃক বিষয় হইতে যে কিছু কিছু উৎপন্ন হইত, তাহা তাঁহার জননী ও অন্যান্য পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনেই পর্য্যবসিত হইত। তাঁহার

ভোগতৃষ্ণা এত অল্প ছিল যে, আবশ্যক পুস্তকের ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ক্রয় এবং অন্যের দারিদ্র্যদুঃখবিমোচন এই উভয় সম্পন্ন হইলেই সন্তুষ্ট হইতেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত বিষয়ে অর্থাভাবের জন্য ক্ষুণ্ণমনা হইতেন না।

১৬৮৩ খৃঃ অব্দে, তিনি প্রিন্সিপিয়ানামক অতি প্রধান গ্রন্থ রচনা করিলেন। ঐ পুস্তকে গণিতশাস্ত্রানুসারে পদার্থ বিদ্যার মীমাংসা করা হইয়াছে। ১৬৮৮ খৃঃ অব্দে, যখন রাজবিপ্লব ঘটে, কেম্ব্রিজ বিদ্যালয়ের প্রতিরূপ হইয়া, পার্লিমেণ্ট নামক সমাজে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত, সকলে তাঁহাকে মনোনীত করিয়াছিল; এবং ১৭০১ খৃঃ অব্দেও ঐ মর্য্যাদার পদ পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে সকল ব্যক্তির যথার্থ উপকার ও পুরস্কার করিবার ক্ষমতা ছিল, নিউটনের অসাধারণ গুণ তাঁহাদের গোচর হওয়াতে, তিনি তদীয় আনুকূল্যবলে টাকশালের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধানবিষয়ে অত্যন্ত সহিষ্ণুতা ও সবিশেষ নৈপুণ্য থাকাতে, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষায় ঐ পদের উপযুক্ত ছিলেন। নিউটন মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যসম্পাদন করিয়া সর্ব্বত্র সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অতঃপর, নিউটন বহুতর প্রশংসা ও পুরস্কার প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। লিবনিজনামক একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, নিউটনের নব নব আবিষ্ক্রিয়ানিবন্ধন অসাধারণ সম্মানদর্শনে ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া, তদভিলোপবাসনায় তাঁহার নিকট এক প্রশ্ন প্রেরণ করেন। তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, নিউটন কোন

রূপেই ইহার সমাধান করিতে পারিবেন না, তাহা হইলে তাঁহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবেক। নিউটন টাকশালের সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সায়াহ্নে ঐ প্রশ্ন পাইলেন এবং শয়নের পূর্ব্বেই তাহার সমাধান করিয়া রাখিলেন। তৎপরে আর কোন ব্যক্তি কখন নিউটনের কীর্ত্তিবিলোপের চেষ্টা করেন নাই। ১৭০৫ খ্রীঃ অব্দে, ইংলণ্ডেশ্বরী অ্যান,নিউটনের মানবর্দ্ধনার্থে, তাঁহাকে নাইট উপাধি প্রদান করেন।

নিউটন উদারস্বভাবতাপ্রযুক্ত সামান্য সামান্য লৌকিক ব্যাপারেও সবিশেষ অবহিত ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন এবং তাঁহারা সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, সমুচিত সমাদর করিতেন; কথোপকথনকালে কখন আত্মপ্রাধান্য প্রখ্যাপন করিতেন না। তিনি স্বভাবতঃ সুশীল, সরল ও প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন; এই নিমিত্ত সকল ব্যক্তি তাঁহার সহবাসবাসনা করিত। লোকের সর্ব্বদা যাতায়াত দ্বারা তাঁহার মহার্ঘসময়ের অপক্ষয় হইত, তথাপি তিনি কিঞ্চিন্মাত্র বিরক্তভাব প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু প্রত্যূষে গাত্রোত্থানের নিয়ম এবং বিশেষ বিশেষ কার্য্যে বিশেষ বিশেষ সময় নিরূপিত থাকাতে, অধ্যয়ন ও গ্রন্থরচনার নিমিত্ত তাঁহার সময়াল্পতানিবন্ধন কোন ক্ষোভ থাকিত না। তিনি অবসর পাইলে হস্তে লেখনী ও সম্মুখে পুস্তক লইয়া বসিতেন।

নিউটন অত্যন্ত দয়ালু ও দানশীল ছিলেন। তিনি কহিতেন, যাঁহারা জীবদ্দশায় দান না করেন, তাঁহাদের দান দানই

নয়। অত্যন্ত বৃদ্ধবয়সে তদীয় অদ্ভুত ধীশক্তির কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। আহারনিয়ম, সর্ব্বকালিক প্রফুল্লচিত্ততা, ও স্বাভাবিক শরীরপটুতাপ্রযুক্ত জরা তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। তিনি নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব, নাতিস্থূলকায় ছিলেন। তাঁহার নয়নে সজীবতা, তীক্ষ্ণতা, ও বুদ্ধিমত্তা স্পষ্ট প্রকাশ পাইত। দেখিলেই তাঁহার আকৃতি সজীবতা ও দয়ালুতাতে পরিপূর্ণ বোধ হইত। অন্তিম ক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার দর্শনশক্তি অব্যাহত ছিল। কেশ সকল শেষ বয়সে তুষারের ন্যায় শুভ্র হইয়াছিল। চরম দশাতে তাঁহার অসহ্য দৈহিক যাতনা ঘটে। কিন্তু তিনি স্বভাবসিদ্ধ সহিষ্ণুতাপ্রভাবে তাহাতে নিতান্ত কাতর হয়েন নাই। অনন্তর, ১৭২৭ খ্রী অব্দের ২০শে মার্চ্চ, চতুরশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে, তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

নিউটনের চরিত্র সাধারণ লোকের চরিত্রের ন্যায় নহে। উহা এমন সুন্দর যে, চরিতাখ্যায়ক ব্যক্তি লিখিতে লিখিতে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন। আর, যে উপায়ে তিনি মনুষ্যমণ্ডলীতে অবিসংবাদিত প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে মহোপকার ও মহার্থলাভ হইতে পারে। নিউটন অত্যুৎকৃষ্ট বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন; কিন্তু তদপেক্ষায় ন্যূনবুদ্ধিরাও তদীয় জীবনবৃত্তপাঠে পদে পদে উপদেশলাভ করিতে পারেন। তিনি অলৌকিক বুদ্ধিশক্তির প্রভাবে গ্রহগণের গতি, ধূমকেতুগণের কক্ষ, সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস, এই সকল

বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। নিউটন আলোক ও বর্ণ এই দুই পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে এই বিষয় কোন ব্যক্তির মনেও উদিত হয় নাই। তিনি সাতিশয় পরিশ্রম ও দক্ষতাসহকারে অদ্ভুত বিশ্বরচনার যথার্থ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন; অধিক তাঁহার সমুদয় গবেষণাদ্বারাই সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমা, প্রজ্ঞা ও অনুকম্পা প্রকাশ পাইয়াছে।

ঈদৃশলোকোত্তরবুদ্ধিবিদ্যাসম্পন্ন হইয়াও, তিনি স্বভাবতঃ এমন বিনীত ছিলেন যে, আপন বিদ্যার কিঞ্চিন্মাত্র অভিমান করিতেন না। তাঁহার এই এক সুপ্রসিদ্ধ কথা ধরাতলে জাগরূক আছে, "আমি বালকের ন্যায় বেলাভূমি হইতে উপলখণ্ড সঙ্কলন করিতেছি, জ্ঞানমহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।"

শকুন্তলা।

রাজা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুনর্ম্মিলন।

এইরূপ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, রাজা শব্দানুসারে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, এক অতি অল্পবয়স্ক শিশু, সিংহশিশুর কেশর আকর্ষণ করিয়া, অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতেছে, দুই তাপসী সমীপে দণ্ডায়মান আছেন। দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া, রাজা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, তপোবনের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! মানবশিশু সিংহশিশুর উপর অত্যাচার করিতেছে,

সিংহশিশু অবিকৃতচিত্তে সেই অত্যাচার সহ্য করিতেছে। অনন্তর কিঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হইয়া, সেই শিশুকে নিরীক্ষণ করিয়া স্নেহরসপরিপূর্ণ চিত্তে কহিতে লাগিলেন, আপন ঔরস পুত্রকে দেখিলে মন যেরূপ স্নেহরসে আর্দ্র হয়, এই শিশুকে দেখিয়া আমার মন সেইরূপ হইতেছে কেন? অথবা আমি পুত্রহীন বলিয়া, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিশুকে দেখিয়া আমার মনে এরূপ প্রগাঢ় স্নেহ রসের আবির্ভাব হইতেছে।

এদিকে, সেই শিশু সিংহশাবকের উপর অত্যন্ত উৎপীড়ন আরম্ভ করাতে, তাপসীরা কহিতে লাগিলেন, বৎস! এই সকল জন্তুকে আমরা আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ করি, তুমি কেন অকারণে উহারে ক্লেশ দাও? আমাদের কথা শুন, ক্ষান্ত হও, সিংহশিশুকে ছাড়িয়া দেও, ও আপন জননীর নিকটে যাউক। আর যদি তুমি উহারে ছাড়িয়া না দাও, সিংহী তোমায় দণ্ড করিবেক। বালক শুনিয়া, কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত না হইয়া, সিংহশাবকের উপর পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর উপদ্রব আরম্ভ করিল, তাপসীরা, ভয়প্রদর্শন দ্বারা তাহাকে ক্ষান্ত করা অসাধ্য বুঝিয়া, প্রলোভনার্থে কহিলেন, বৎস! তুমি সিংহশিশুকে ছাড়িয়া দাও, তোমায় একটী ভাল খেলানা দিব।

রাজা, এই কৌতুক দেখিতে দেখিতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া, তাহাদের অতি নিকটে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সহসা তাহাদের সম্মুখে না আসিয়া, এক বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া সস্নেহনয়নে সেই শিশুকে অবলোকন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সেই বালক, কই কি খেলানা দিবে, দাও, বলিয়া হস্তপ্রসারণ করিল। রাজা, বালকের হস্তে দৃষ্টিপাত করিয়া চমৎকৃত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! এই বালকের হস্তে চক্রবর্ত্তিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। তাপসী-দিগের সঙ্গে কোন খেলানা ছিল না, সুতরাং তাঁহারা তৎক্ষণাৎ দিতে না পারাতে, বালক কুপিত হইয়া কহিল, তোমরা খেলানা দিলে না, তবে আমি উঁহারে ছাড়িব না। তখন এক তাপসী অপর তাপসীকে কহিলেন, সখি! ও কথায় ভুলাবার ছেলে নয়; কুটীরে মাটীর ময়ূর আছে, ত্বরায় লইয়া আইস। তাপসী মৃণ্ময় ময়ূরের আনয়নার্থ কুটীরে গমন করিলেন।

প্রথমে সেই শিশুকে দেখিয়া, রাজার অন্তঃকরণে যে স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সেই স্নেহ গাঢ়তর হইতে লাগিল। তখন তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন এই অপরিচিত শিশুকে ক্রোড়ে করিবার নিমিত্ত আমার মন এমন উৎসুক হইতেছে। পরের পুত্র দেখিলে মনে এত স্নেহোদয় হয়, আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। আহা! যাহার এই পুত্র, সে ইহাকে ক্রোড়ে লইয়া যখন ইহার মুখচুম্বন করে, হাস্য করিলে যখন ইহার মুখমধ্যে অর্দ্ধবিনির্গত কুন্দসন্নিভ দন্তগুলি অবলোকন করে, যখন ইহার মৃদু মধুর আধ আধ কথাগুলি শ্রবণ করে, তখন সেই পুণ্যবান ব্যক্তি কি অনির্ব্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হয়। আমি অতি হতভাগ্য! সংসারে আসিয়া এই পরম সুখে বঞ্চিত রহিলাম। পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, তাহার

মুখচুম্বন করিয়া সর্ব্বশরীর শীতল করিব; পুত্রের অর্দ্ধবিনির্গত দন্তগুলি অবলোকন করিয়া, নয়নযুগলের সার্থকতাসম্পাদন করিব; এবং অর্দ্ধোচ্চারিত মৃদু মধুর বচনপরম্পরাশ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা লাভ করিব; এ জন্মের মত আমার সে আশালতা নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে।

ময়ূরের আনয়নে বিলম্ব দেখিয়া, কুপিত হইয়া বালক কহিল এখনও ময়ূর দিলে না, তবে আমি ইহাকে ছাড়িব না; এই বলিয়া সিংহশিশুকে অত্যন্ত বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাপসী বিস্তর চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু তাহার হস্তগ্রহ হইতে সিংহশিশুকে ছাড়াইতে পারিলেন না। তখন তিনি বিরক্ত হইয়া কহিলেন, এমন সময়ে এখানে কোন ঋষিকুমার নাই যে ছাড়াইয়া দেয়। এই বলিয়া পার্শ্বে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবামাত্র, রাজাকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন মহাশয়! আপনি অনুগ্রহ করিয়া সিংহশিশুকে এই বালকের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া দেন। রাজা, তৎক্ষণাৎ নিকটে আসিয়া সেই বালককে ঋষিপুত্রবোধে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অহে ঋষিকুমার! তুমি কেন তপোবনবিরুদ্ধ আচরণ করিতেছ। তখন তাপসী কহিলেন, মহাশয়! আপনি জানেন না, এ ঋষিকুমার নয়। রাজা কহিলেন, বালকের আকার প্রকার দেখিয়া বোধ হইতেছে ঋষিকুমার নয়, কিন্তু এ স্থানে ঋষিকুমারব্যতীত অন্যবিধ বালকের সমাগম সম্ভাবনা নাই, এজন্য আমি এরূপ বোধ করিয়াছিলাম।

এই বলিয়া, রাজা সেই বালকের হস্তগ্রহ হইতে সিংহ-

শিশুকে মুক্ত করিয়া দিলেন, এবং স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, পরের পুত্রের গাত্র স্পর্শ করিয়া আমার এরূপ সুখানুভব হইতেছে, যাহার পুত্র, সেব্যক্তি ইহার গাত্র স্পর্শ করিয়া কি অনুপম সুখ অনুভব করে, তাহা বলা যায় না।

বালক অত্যন্ত দুরন্ত হইয়াও রাজার নিকট অত্যন্ত শান্ত স্বভাব হইল, ইহা দেখিয়া এবং উভয়ের আকারগত সৌসাদৃশ্য দর্শন করিয়া, তাপসী বিস্ময়াপন্ন হইলেন। রাজা, সেই বালককে ক্ষত্রিয়সন্তান নিশ্চয় করিয়া, তাপসীকে জিজ্ঞাসিলেন, এই বালক যদি ঋষিকুমার না হয়, কোন্ ক্ষত্রিয়বংশে জন্মিয়াছে, জানিতে ইচ্ছা করি। তাপসী কহিলেন, মহাশয়! এ পুরুবংশীয়। রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমি যে বংশে জন্মিয়াছি, ইহারও সেই বংশে জন্ম। পুরুবংশীয়দিগের এই রীতি বটে, তাঁহারা প্রথমতঃ অশেষ সাংসারিক সুখভোগে কালযাপন করিয়া, পরিশেষে সস্ত্রীক হইয়া অরণ্য বাস আশ্রয় করেন।

পরে রাজা তাপসীকে জিজ্ঞাসিলেন, এ দেবভূমি, মানুষের অবস্থিতির স্থান নহে; অতএব এ বালক কি সংযোগে এখানে আসিল? তাপসী কহিলেন, ইহার জননী অপ্সরাসম্বন্ধে এখানে আসিয়া এই সন্তান প্রসব করিয়াছেন। রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, পুরুবংশ ও অপ্সরাসম্বন্ধ দুই কথা শুনিয়া, আমার হৃদয়ে পুনর্ব্বার আশার সঞ্চার হইতেছে। যাহা

হউক, ইহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলেই সন্দেহ ভঞ্জন হইবেক।

এই বলিয়া, তিনি তাপসীকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলেন, আপনি জানেন এই বালক পুরুবংশীয় কোন্ রাজার পুত্র? তখন তাপসী কহিলেন, মহাশয়! কে সেই ধর্ম্মপত্নীপরিত্যাগী পাপাত্মার নাম কীর্ত্তন করিবেক! রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই কথা আমারেই লক্ষ্য করিতেছে। ভাল, ইহার জননীর নাম জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলেই এককালে সকল সন্দেহ দূর হইবেক, অথবা পরস্ত্রীসংক্রান্ত কোন কথা জিজ্ঞাসা করা অবিধেয়। আমি যখন মোহান্ধ হইয়া স্বহস্তে আশালতার মূলচ্ছেদ করিয়াছি, তখন সে আশালতাকে বৃথা পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা পাইয়া, পরিশেষে কেবল সমধিক ক্ষোভ পাইতে হইবেক। অতএব ও কথায় আর কাজ নাই।

রাজা মনে মনে এই আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে অপর তাপসী কুটীর হইতে মৃণ্ময় ময়ূর আনয়ন করিলেন এবং কহিলেন, বৎস! কেমন শকুন্তলাবণ্য দেখ। এই বাক্যে 'শকুন্তলা' শব্দ শ্রবণ করিয়া বালক কহিল, কই আমার মা কোথায়? তখন তাপসী কহিলেন, না বৎস! তোমার মা এখানে আইসেন নাই। আমি তোমায় শকুন্তের লাবণ্য দেখিতে কহিয়াছি। ইহা বলিয়া রাজাকে কহিলেন, মহাশয়! এই বালক জন্মাবধি জননী ভিন্ন আর কাহাকেও দেখে নাই, নিরন্ত জননীর নিকটেই থাকে, এই নিমিত্ত অত্যন্ত মাতৃবৎসল। শকুন্তলাবণ্য-

শব্দে জননীর নামাক্ষর শ্রবণ করিয়া, উহার জননীকে মনে পড়িয়াছে। উহার জননীর নাম শকুন্তলা।

সমুদায় শ্রবণ করিয়া, রাজা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ইহার জননীর নাম শকুন্তলা! কি আশ্চর্য্য! উত্তরোত্তর সকল কথাই আমার বিষয়ে ঘটিতেছে। এই সকল কথা শুনিয়া আমার আশাই বা না জন্মিবে কেন? অথবা আমি মৃগতৃষ্ণিকায় ভ্রান্ত হইয়াছি, নামসাদৃশ্যশ্রবণে মনে মনে বৃথা এত আন্দোলন করিতেছি; এরূপ নামসাদৃশ্য শত শত ঘটিতে পারে।

শকুন্তলা অনেক ক্ষণ অবধি পুত্রকে দেখেন নাই, এ নিমিত্ত অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া, অন্বেষণ করিতে করিতে সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। রাজা, বিরহকৃশা মলিনবেশা শকুন্তলাকে সহসা সেই স্থানে উপস্থিত দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইয়া একদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন; নয়নযুগলে জলধারা বহিতে লাগিল; বাক্‌শক্তিরহিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, একটিও কথা কহিতে পারিলেন না। শকুন্তলাও অকস্মাৎ রাজাকে দেখিয়া, স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ করিয়া স্থিরনয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন; নয়নযুগল বাষ্পবারিতে পরিপ্লুত হইয়া আসিল। বালক, শকুন্তলাকে দেখিবামাত্র, মা মা করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসিল, মা! ও কে, ওকে দেখে তুই কাঁদিস্ কেন? তখন শকুন্তলা গদ্গদবচনে কহিলেন বাছা! ও কথা আমায় জিজ্ঞাসা কর কেন? আপন অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর।

কিয়ৎক্ষণ পরে, রাজা মনের আবেগ সংবরণ করিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমার প্রতি যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছি, তাহা বলিবার নয়। তৎকালে আমার মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছিল, তাহাতেই অবমাননা করিয়া তোমায় বিদায় করিয়াছিলাম। কয়েক দিবস পরেই, আমার সকল বৃত্তান্ত স্মরণ হইয়াছিল; তদবধি আমি কি অসুখে কালহরণ করিয়াছি, তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানেন। পুনর্ব্বার তোমার দর্শন পাইব আমার সে আশা ছিল না। এক্ষণে তুমি প্রত্যাখ্যানদুঃখ পরিত্যাগ করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।

রাজা এই বলিয়া উন্মূলিত তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে শকুন্তলা অস্তে ব্যস্তে রাজার হস্তে ধরিয়া কহিলেন, আর্য্যপুত্র! উঠ উঠ তোমার দোষ কি, আমার অদৃষ্টের দোষ। এতদিনের পর দুঃখিনীকে যে স্মরণ করিয়াছ, তাহাতেই আমার সকল দুঃখ দূর হইয়াছে। এই বলিতে বলিতে শকুন্তলার চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। রাজা গাত্রোত্থান করিয়া বাষ্পপূর্ণ নয়নে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! প্রত্যাখানকালে তোমার নয়নযুগল হইতে যে জলধারা বিগলিত হইয়াছিল, তাহা উপেক্ষা করিয়াছিলাম, পরে সেই দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে তোমার চক্ষের জলধারা মুছিয়া দিয়া সকল দুঃখ দূর করি। এই বলিয়া স্বহস্তে শকুন্তলার চক্ষের জল মুছিয়া দিলেন। শকুন্তলার শোকসাগর আরও উথলিয়া উঠিল; দ্বিগুণ প্রবাহে নয়নে বারিধারা বহিতে লাগিল।

অনন্তর দুঃখাবেগ সংবরণ করিয়া, শকুন্তলা রাজাকে কহিলেন, আর্য্যপুত্র! তুমি যে এই দুঃখিনীকে পুনরায় স্মরণ করিবে, সে আশা ছিল না। কিরূপে আমি তোমার স্মৃতিপথে পতিত হইলাম, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। তখন রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! তৎকালে তুমি আমায় যে অঙ্গুরীয় দেখাইতে পার নাই, কয়েক দিবস পরে উহা আমার হস্তে পড়িলে, আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়। এই সেই অঙ্গুরীয়, এই বলিয়া স্বীয় অঙ্গুলীস্থিত সেই অঙ্গুরীয় দেখাইয়া, পুনর্ব্বার শকুন্তলার অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। তখন শকুন্তলা কহিলেন, আর্য্যপুত্র! আর আমার ও অঙ্গুরীয়ে কাজ নাই, ওই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল; ও তোমার অঙ্গুলীতেই থাকুক।

সীতার বনবাস।

অবশেষে, রথ ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইল। ভাগীরথীর অপর পারে লইয়া গিয়া, সীতাকে একজন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইবেক, এই ভাবিয়া লক্ষ্মণের শোকসাগর অনিবার্য্যবেগে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। আর তিনি ভাবগোপন বা অশ্রুবেগসংবরণ করিতে পারিলেন না। সীতা দেখিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! কি কারণে তোমার এরূপ ভাব উপস্থিত হইল, বল। তখন লক্ষ্মণ নয়নের অশ্রু-

মার্জ্জন করিয়া কহিলেন, আর্য্যে! আপনি ব্যাকুল হইবেন না; বহুকালের পর ভাগীরথীদর্শন করিয়া, আমার অন্তঃকরণে কেমন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়াছে তাহাতেই অকস্মাৎ আমার নয়নযুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইল। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা কপিলশাপে ভস্মাবশেষ হইয়াছিলেন; ভগীরথ কত কষ্টে, গঙ্গাদেবীকে ভূমণ্ডলে আনিয়া, তাঁহাদের উদ্ধার সাধন করেন; বোধ হয়, তাহাই ভাগীরথীদর্শনে স্মৃতি-পথে আরূঢ় হওয়াতে, এরূপ চিত্তবৈকল্য উপস্থিত হইয়াছিল। সীতা একান্ত মুগ্ধস্বভাবা ও নিতান্ত সরলহৃদয়া, লক্ষ্মণের এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যাতেই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং গঙ্গা পার হইবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া, লক্ষ্মণকে বারংবার তাহার উদ্যোগ করিতে কহিতে লাগিলেন, কিন্তু গঙ্গা পার হইলেই যে এ জন্মের মত দুস্তর শোকসাগরে পরিক্ষিপ্ত হইবেন, তখন পর্য্যন্ত কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরেই তরণীসংযোগ হইল। লক্ষ্মণ, সুমন্ত্রকে সেই স্থানে রথ স্থাপন করিতে কহিয়া, সীতাকে তরণীতে আরোহণ করাইলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই তাঁহারে ভাগী-রথীর অপর পারে উত্তীর্ণ করিলেন। সীতা, তপোবন দেখিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়া, তদভিমুখে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলেন। তখন লক্ষ্মণ কহিলেন আর্য্যে! কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আমার কিছু বক্তব্য আছে, এই স্থানে নিবেদন করিব। এই বলিয়া, তিনি অধোবদনে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে

লাগিলেন। সীতা চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! কিছু বলিবে বলিয়া, এত আকুল হইলে কেন? কি বলিবে ত্বরায় বল; তোমার ভাবান্তর দেখিয়া আমার চিত্ত একান্ত অস্থির হইতেছে, যাহা বলিবে ত্বরায় বল, আমার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে। তুমি কি আসিবার সময় আর্য্যপুত্রের কোন অশুভ-ঘটনা শুনিয়া আসিয়াছ, না অন্য কোনপ্রকার সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে? কি হইয়াছে, শীঘ্র বল। তখন লক্ষ্মণ কহিলেন, দেবি! বলিব কি, আমার বাক্যনিঃসরণ হইতেছে না; আর্য্যের আজ্ঞাবহ হইয়া আমার অদৃষ্টে যে এরূপ ঘটিবে, তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ইতিপূর্ব্বে আমার মৃত্যু হইলে, আমি সৌভাগ্য জ্ঞান করিতাম; যদি মৃত্যু অপেক্ষা কোন অধিকতর দুর্ঘটনা থাকে, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর ছিল; তাহা হইলে আজি আমায় আর্য্যের ধর্ম্মবহির্ভূত আদেশ প্রতিপালন করিতে হইত না। হা বিধাতঃ! আমার অদৃষ্টে এই ছিল! এই বলিয়া, উন্মূলিত তরুর ন্যায়, ভূতলে পতিত হইয়া, লক্ষ্মণ হাহাকার করিতে লাগিলেন।

সীতা, লক্ষ্মণের ঈদৃশ অভাবিত ভাবান্তর অবলোকন করিয়া, কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন; অনন্তর, হস্ত ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে ভূতল হইতে উঠাইয়া, অঞ্চলধারা তদীয় নয়নের অশ্রুমার্জ্জন করিয়া দিলেন; এবং তিনি কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে, কাতরবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! কি কারণে

তুমি এত ব্যাকুল হইলে? কি জন্যেই বা তুমি আপনার মৃত্যু-কামনা করিলে? তোমায় একান্ত বিকলচিত্ত দেখিতেছি; অল্প কারণে তুমি কখনই এত আকুল ও অস্থির হও নাই। বলি, আর্য্যপুত্রের ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই? তুমি তদগতপ্রাণ, তোমার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, তাঁহারই অমঙ্গল ঘটিয়াছে। আমি বুঝিতে পারিতেছি, এই জন্যই কল্য অপরাহ্নে তাদৃশ চিত্তবৈকল্য ঘটিয়াছিল। যাহা হয়, ত্বরায় বলিয়া, আমায় জীবন দান কর, আমার যাতনার একশেষ হইতেছে। ত্বরায় বল, আর বিলম্ব করিও না। আমি স্পষ্ট বুঝিতেছি, আমারই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে; না হইলে, এমন সময়ে তুমি এত ব্যাকুল হইতে না।

সীতার এইরূপ ব্যাকুলতা ও কাতরতা দেখিয়া, লক্ষ্মণের শোকানল শতগুণ প্রবল হইয়া উঠিল, নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুজল নির্গত হইতে লাগিল, কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্য-নিঃসরণ রহিত হইয়া গেল। যত নিষ্ঠুর হউক না কেন, অবশেষে অবশ্যই বলিতে হইবেক, এই ভাবিয়া লক্ষ্মণ বলিবার নিমিত্ত বারংবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই তাঁহার মুখ হইতে তাদৃশ নিষ্ঠুর বাক্য নির্গত হইল না। তাঁহাকে এতাদৃশ অবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া, সীতা তাঁহার হস্তে ধরিয়া ব্যাকুলচিত্তে কাতরবচনে বারংবার এই অনুরোধ করিতে লাগিলেন, বৎস! আর বিলম্ব করিও না, আর্য্যপুত্র যে আদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা, যত নিষ্ঠুর হউক না কেন,

ত্বরায় বল, তুমি কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিও না; আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে বল। তোমার কথা শুনিয়া ও ভাব দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আমারই কপাল ভাঙ্গিয়াছে। কি হইয়াছে ত্বরায় বল, আর বিলম্ব করিও না; আমি আর এক মুহূর্ত্তও এরূপ সংশয়িত অবস্থায় থাকিতে পারি না; যাহা হয় বলিয়া, আমার প্রাণ রক্ষা কর। বলি, আর্য্যপুত্রের ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই; যদি তিনি কুশলে থাকেন, আমার আর যে সর্ব্বনাশ ঘটুক না কেন, আমি তাহাতে তত কাতর হইব না। আমার মাথা খাও, তোমার আর্য্যপুত্রের দোহাই, শীঘ্র বল। আর বিলম্ব করিলে, তুমি অধিকক্ষণ আমায় জীবিত দেখিতে পাইবে না। যদি যাতনা দিয়া আমার প্রাণবধ করা তোমার অভিপ্রেত না হয়, তবে ত্বরায় বল, আর বিলম্ব করিও না।

সীতার এইরূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া, লক্ষ্মণ ভাবিলেন, আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে। তখন, অনেক যত্নে চিত্তের অপেক্ষাকৃত স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া, অতি কষ্টে বাক্য নিঃসরণ করিলেন, কহিলেন, আর্য্যে! বলিব কি, বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আপনি একাকিনী রাবণগৃহে ছিলেন, সেই কারণে পৌরগণ ও জানপদবর্গ, আপনকার চরিত্রবিষয়ে সন্দিহান হইয়া, অপবাদঘোষণা করিয়া থাকে। আর্য্য তাহা শুনিয়া একবারে স্নেহ, দয়া ও মমতায় বিসর্জ্জন দিয়া অপবাদবিমোচনার্থে আপনারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমায় এই আদেশ দিয়াছেন তুমি তপোবনদর্শনচ্ছলে লইয়া

গিয়া, বাল্মীকির আশ্রমে পরিত্যাগ করিয়া আসিবে। এই সেই বাল্মীকির আশ্রম।

এই বলিয়া লক্ষ্মণ ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইতেন। সীতাও শ্রবণমাত্র হতচেতনা হইয়া, বাতাভিহতা কদলীর ন্যায়, ভূতলশায়িনী হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে লক্ষ্মণের সংজ্ঞালাভ হইলে, তিনি অনেক যত্নে জানকীর চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। জানকী চেতনা লাভ করিয়া, উন্মত্তার ন্যায় স্থিরনয়নে লক্ষ্মণের বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ, হতবুদ্ধির ন্যায়, চিত্রার্পিতপ্রায়, অধোবদনে গলদশ্রুনয়নে দণ্ডায়মান রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, সীতার নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল, সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ, যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া, সীতাকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু কি বলিয়া প্রবোধ দিবেন, তাহার কিছুই দেখিতে না পাইয়া, হতবুদ্ধি হইয়া, কেবল অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে পর, সীতা চিত্তের অপেক্ষাকৃত স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! কার দোষ দিব, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ, নতুবা, রাজার কন্যা, রাজার বধূ ও রাজার মহিষী হইয়া, কে কখন্ আমার মত চিরদুঃখিনী হইয়াছে বল? বুঝিলাম, যাবজ্জীবন দুঃখভোগের নিমিত্তই আমার নারীজন্ম হইয়াছিল। বৎস! অবশেষে আমার যে

এ অবস্থা ঘটিবে, তাহা কাহার মনে ছিল। বহু কালের পর আর্য্যপুত্রের সহিত সমাগম হইলে ভাবিয়াছিলাম, বুঝি এই অবধি দুঃখের অবসান হইল; কিন্তু বিধাতা যে আমার কপালে সহস্রগুণ অধিক দুঃখ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। হায় রে বিধাতা! তোর মনে কি এতই ছিল?

এই বলিতে বলিতে জানকীর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তিনি কিয়ৎক্ষণ বাক্য নিঃসরণ করিতে পারিলেন না, অনন্তর, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ! আমি জন্মান্তরে কত মহাপাতক করিয়াছিলাম, বলিতে পারি না; নতুবা বিধাতা আমার কপালে এত দুঃখভোগ লিখিবেন কেন? বিধাতারই বা অপরাধ কি, সকলে আপন আপন কর্ম্মের ফল ভোগ করে; আমি জন্মান্তরে যেমন কর্ম্ম করিয়াছিলাম, এ জন্মে সেইরূপ ফল ভোগ করিতেছি। বোধ করি, পূর্ব্বজন্মে কোন পতিপ্রাণা কামিনীকে পতিবিয়োজিতা করিয়াছিলাম, সেই মহাপাপেই আজি আমার এই দুরবস্থা ঘটিল; নতুবা আর্য্যপুত্রের হৃদয় স্নেহ, দয়া ও মমতায় পরিপূর্ণ; আমিও যে একান্ত পতিপ্রাণা ও শুদ্ধচারিণী, তাহাও তিনি বিলক্ষণ জানেন; তথাপি যে এমন সময়ে আমায় পরিত্যাগ করিলেন, সে কেবল আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফলভোগ। বৎস! আমি বনবাসে কাতর নহি। আর্য্যপুত্রের সহবাসে বহুকাল বনবাসে ছিলাম, তাহাতে এক দিন এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তে আমার অন্তঃকরণে দুঃখের লেশমাত্র ছিল না। আর্য্যপুত্রসহবাসে যাবজ্জীবন

বনবাসে থাকিলেও, আমার কিছুমাত্র অসুখ হইত না। সে যাহা হউক আমার অন্তঃকরণে এই দুঃখ হইতেছে, আর্য্যপুত্র কি অপরাধে পরিত্যাগ করিয়াছেন, মুনিপত্নীরা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি কি উত্তর দিব। তাঁহারা আর্য্যপুত্রকে করুণা-সাগর বলিয়া জানেন, আমি প্রকৃত কারণ কহিলে, তাঁহারা কখনই বিশ্বাস করিবেন না; তাঁহারা অবশ্যই ভাবিবেন, আমি কোন ঘোরতর অপরাধ করিয়াছিলাম, তাহাতেই তিনি আমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। বৎস বলিতে কি, যদি অন্তঃসত্ত্বা না হইতাম, এই মুহূর্ত্তে তোমার সমক্ষে জাহ্নবীজলে প্রবেশ করিয়া, প্রাণত্যাগ করিতাম। আর আমার জীবন-ধারণের ফল কি বল? এমন অবস্থাতেও কি প্রাণ রাখিতে হয়। আমি এই আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি, আর্য্যপুত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়াও আমার প্রাণত্যাগ হইল না। বোধ করি, আমার মত কঠিন প্রাণ আর কারও নাই, নতুবা এখনও নির্গত হইতেছে না কেন? অথবা, বিধাতা আমায় চিরদুঃখিনী করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, প্রাণত্যাগ হইলে তাঁহার সে সঙ্কল্প বিফল হইয়া যায়, এ জন্যই জীবিত রহিয়াছি।

বিধবাবিবাহ।

এই সমস্ত দেশাচার শাস্ত্রমূলক বলিয়া পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছিল, পরে অন্য শাস্ত্র অথবা শাস্ত্রের অন্য ব্যাখ্যা

উদ্ভাবিত হওয়াতে তাহাদের পরিবর্ত্তে নূতন আচার প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যদি এই সকল স্থলে নূতন শাস্ত্র অথবা শাস্ত্রের নূতন ব্যাখ্যা দেখিয়া পূর্ব্ব-প্রচলিত আচারের পরিবর্ত্তে যে নূতন নূতন আচার প্রচলিত হইয়াছে, আপনারা তাহাতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন, তবে হতভাগা বিধবাদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মতিপ্রদানে এত কাতরতা ও এত কৃপণতা প্রদর্শন করিতেছেন কেন? বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রস্তাবিত বিষয় পূর্ব্বোক্ত কয়েক বিষয় অপেক্ষা সহস্র অংশে গুরুতর। দেখুন যদি বৈদ্যজাতি যজ্ঞোপবীত ধারণ ও পঞ্চদশ দিবস অশৌচ গ্রহণ না করিতেন এবং পাঁচ বৎসরের অধিকবয়স্ক বালক গৃহীত হইলে দত্তক পুত্র সিদ্ধ না হইত, তাহা হইলে লোকসমাজের কোন কালে কোন অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু প্রস্তাবিত বিষয় প্রচলিত না থাকাতে যে শত শত ঘোরতর অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহা আপনারা অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আপনারা ইতিপূর্ব্বে কেবল শাস্ত্র দেখিয়াই পূর্ব্বপ্রচলিত আচারের পরিবর্ত্তে অবলম্বিত নূতন আচারে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে যখন শাস্ত্র পাইতেছেন এবং সেই শাস্ত্র অনুসারে চলিলে বিধবাদিগের পরিত্রাণ ও শত শত ঘোরতর অনিষ্ট নিবারণের পথ হয় স্পষ্ট বুঝিতেছেন, তখন আর প্রস্তাবিত বিষয়ে অসম্মতি প্রদর্শন করা আপনাদিগের কোন মতেই উচিত নহে। যত ত্বরায় সম্মতি প্রদান করেন ততই মঙ্গল। বস্তুতঃ দেশাচারের দোহাই দিয়া আর আপনা-

দিগের এ বিষয়ে অসম্মত থাকা অনুচিত। কিন্তু এখনও আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, আপনাদিগের মধ্যে অনেকে দেশাচার শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে প্রস্তাবিত বিষয় প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়াও পাতিত্যজনক জ্ঞান করিবেন, এবং অনেকে মনে মনে সম্মত হইয়াও কেবল দেশাচারবিরুদ্ধ বলিয়া প্রস্তাবিত বিষয় প্রচলিত হওয়া উচিত এ কথা সাহস করিয়া মুখেও বলিতে পারিবেন না। হায় কি আক্ষেপের বিষয়, দেশাচারই এ দেশের অদ্বিতীয় শাসনকর্ত্তা, দেশাচারই এ দেশের পরম গুরু। দেশাচারের শাসনই প্রধান শাসন, দেশাচারের উপদেশই প্রধান উপদেশ!

ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে দুর্ভেদ্য দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া কি একাধিপত্য করিতেছিস্। তুই ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস, ধর্ম্মের মর্ম্মভেদ করিয়াছিস, হিতাহিতবোধের গতিরোধ করিয়াছিস, ন্যায় অন্যায় বিচারের প্রচার রুদ্ধ করিয়াছিস। তোর প্রভাবে শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে, ধর্ম্মও অধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে, অধর্ম্ম ও ধর্ম্ম বলিয়া মান্য হইতেছে। সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত যথেচ্ছাচারী দুরাচারেরাও তোর অনুগত থাকিয়া কেবল লৌকিকরক্ষাগুণে সর্ব্বত্র সাধু বলিয়া গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে, আর দোষস্পর্শশূন্য প্রকৃত সাধু পুরুষেরাও তোর অনুগত না হইয়া কেবল লৌকিক-

রক্ষায় অযত্নপ্রকাশ ও অনাদর প্রদর্শন করিলেই সর্ব্বত্র নাস্তিকের শেষ, অধার্ম্মিকের শেষ, ও সর্ব্বদোষে দোষীর শেষ বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছেন। তোর অধিকারে যাহারা সতত জাতিভ্রংশকর ও ধর্ম্মলোপকর কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়া কালাতিপাত করে, কিন্তু লৌকিকরক্ষায় যত্নশীল হয়, তাহাদের সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি করিলে ধর্ম্মলোপ হয় না, কিন্তু যদি কেহ সতত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়াও কেবল লৌকিকরক্ষায় তাদৃশ যত্নবান্ না হয়, তাহার সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদির কথা দূরে থাকুক, সম্ভাষণমাত্র করিলেও এককালে সকল ধর্ম্ম লোপ হইয়া যায়।

হা ধর্ম্ম তোমার মর্ম্ম বুঝা ভার! কিসে তোমার রক্ষা হয়, আর কিসে তোমার লোপ হয়, তা তুমিই জান!

হা শাস্ত্র তোমার কি দুরবস্থা ঘটিয়াছে! তুমি যে সকল কর্ম্মকে ধর্ম্মলোপকর ও জাতিভ্রংশকর বলিয়া ভূয়োভূয়ঃ নির্দ্দেশ করিতেছ, যাহারা সেই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়া কালাতিপাত করিতেছে তাহারাও সর্ব্বত্র সাধু ও ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া আদরণীয় হইতেছে, আর তুমি যে কর্ম্মকে বিহিত ধর্ম্ম বলিয়া উপদেশ দিতেছ, অনুষ্ঠান দূরে থাকুক, তাহার কথা উত্থাপন করিলেই এককালে নাস্তিকের শেষ অধার্ম্মিকের শেষ ও অর্ব্বাচীনের শেষ হইতে হইতেছে।

এই পূণ্যভূমি ভারতবর্ষ যে বহুবিধ দুর্নিবার পাপপ্রবাহে উচ্ছলিত হইতেছে, তাহার মূল অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে তোমার

প্রতি অনাদর ও লৌকিকরক্ষায় একান্ত যত্ন ব্যতীত আর কিছুই প্রতীত হয় না।

হা ভারতবর্ষ তুমি কি হতভাগ্য! তুমি তোমার পূর্ব্বতন সন্তানগণের আচারগুণে পুণ্যভূমি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে। কিন্তু তোমার ইদানীন্তন সন্তানেরা স্বেচ্ছানুরূপ আচার অবলম্বন করিয়া তোমাকে যেরূপ পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে সর্ব্বশরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। কত কালে তোমার দুরবস্থাবিমোচন হইবেক, তোমার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া ভাবিয়া স্থির করা যায় না।

হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কত কাল তোমরা মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমাদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে। এক বার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ পাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে। আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে, অতঃপর নিবিষ্টচিত্তে শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য ও যথার্থ মর্ম্ম অনুধাবনে মনোনিবেশ কর, এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলেই স্বদেশের কলঙ্কনিরাকরণ করিতে পারিবে! কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তোমরা চিরসঞ্চিত কুসংস্কারের যেরূপ বশীভূত হইয়া আছ, দেশাচারের যেরূপ দাস হইয়া আছ, দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া লৌকিকরক্ষাব্রতে যেরূপ দীক্ষিত হইয়া আছ, তাহাতে এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না। তোমারা হঠাৎ কুসংস্কারবিসর্জ্জন, দেশাচারের আনুগত্যপরিত্যাগ, ও সঙ্কল্পিত লৌকিকরক্ষাব্রতের উদ্যাপন

করিয়া যথার্থ সৎপথের পথিক হইতে পারিবে। অভ্যাসদোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া আছে যে, হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থাদর্শনে তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হওয়া কঠিন। তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ, কিন্তু কি আশ্চর্য্য শাস্ত্রের বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক, তাহাদের পুনরায় বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহ। তোমরা মনে কর পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়, দুঃখ আর দুঃখ বোধ হয় না, যন্ত্রণা যন্ত্রণা বোধ হয় না, দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ এই অনবধানতা দোষে সংসারতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায় কি পরিতাপের বিষয়। যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিতবোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিকরক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।

হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর বলিতে পারি না।

অক্ষয়কুমার দত্ত।

স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন।

একত্র সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করা যেমন মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম এমন কোন জন্তুর নহে। যদিও অন্যান্য প্রাণীরও এপ্রকার স্বভাব দৃষ্টি করা যায়, তাহারা দলবদ্ধ হইয়া একত্র অবস্থান ও একত্র গমনাগমন করিতে ভাল বাসে, কিন্তু মনুষ্য যেরূপ সকল বিষয়ে পরস্পরসাপেক্ষ, অন্য কোন প্রাণী সেরূপ নহে। আমাদিগকে সকল বিষয়েই অন্যের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়। অন্ন, বস্ত্র, বিদ্যা প্রভৃতি যাহা কিছু আমাদের আবশ্যক, তাহাই অন্যের যত্নসাধ্য ও অন্যের সাহায্যসাপেক্ষ। এমন কি, যে দেশে বা যে জনপদে বাস করা যায়, তত্রত্য লোকে যে পরিমাণে কর্ম্মদক্ষ, জ্ঞানাপন্ন ও ধর্ম্মশীল হয়, সেই পরিমাণে আমাদের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে থাকে। কৃষকেরা কৃষিবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া উত্তমরূপ শস্য, ফল মূলাদি উৎপাদন করিতে না পারিলে, আমরা তাহা প্রাপ্ত হইতে পারি না। শিল্পকরেরা শিল্পকার্য্যে সুদক্ষ হইয়া সুখ-সম্ভোগের উপযোগী উত্তমোত্তম সামগ্রী প্রস্তুত করিতে না পারিলে, এবং নাবিক ও বণিক্‌গণ স্ব স্ব ব্যবসায়ে পারদর্শী হইয়া নানাদেশীয় দ্রব্যজাত আনয়ন করিতে পারগ না হইলে, আমরা সে সমস্ত সম্ভোগ করিতে সমর্থ হই না। স্বদেশে উত্তমোত্তম বিদ্যালয় সংস্থাপিত ও উত্তমোত্তম গ্রন্থ প্রচলিত না থাকিলে উৎকৃষ্টরূপ বিদ্যাশিক্ষার সম্ভাবনা থাকে না। স্বদেশীয় সর্ব্ব-

সাধারণ লোকে নানাপ্রকার কুসংস্কারপাশে বদ্ধ থাকিলে, তাহাদের সহবাসে থাকিয়া যথার্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন করা দুরূহ হইয়া উঠে। যদি কোন জ্ঞানাপন্ন ধর্ম্মশীল ব্যক্তি অধার্ম্মিক মূর্খ লোকের সহিত নিরন্তর একত্র বাস করেন, তাহা হইলে, কোন ক্রমেই সর্ব্বোতোভাবে সুখী হইতে পারেন না। তিনি আত্মসদৃশ সদ্বিদ্যাশালী, ধার্ম্মিক লোকের প্রতিবাসী হইলে, যে প্রকার পরম সুখে কাল যাপন করিতে পারেন, অজ্ঞান অধার্ম্মিক লোকপরিবেষ্টিত থাকিলে কোন মতেই সেরূপ সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হন না।

অতএব, জনসমাজে অবস্থিতিপূর্ব্বক অপর সাধারণের বিদ্যা, বুদ্ধি, কর্ম্ম প্রভৃতি সকল বিষয়ের উন্নতিসাধনার্থ চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইতর জন্তুর ন্যায় কেবল আত্মোদরপরিপূরণ ও আত্ম-পরিবারের ভরণ পোষণ করিয়া ক্ষান্ত থাকা মনুষ্যের কর্ম্ম নহে। প্রতিদিবস আপন আপন নিত্য কর্ম্ম সমাপন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ কাল যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনার্থ ক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য। যাহাতে স্বদেশীয় লোকের জ্ঞান, ধর্ম্ম, সুখ ও স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয়, কুরীতি সকল রহিত হইয়া সুরীতি সমুদায় সংস্থাপিত হয়, এবং রাজ-নিয়ম সংশোধিত ও সত্য ধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তদর্থে সচেষ্ট হওয়া উচিত। স্বীয় পরিবারপ্রতিপালনের ন্যায় স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদনার্থে যত্ন পরিশ্রম ও বুদ্ধিপরিচালন করাও যে মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ইহা অনেকেই বিবেচনা করেন না। তাঁহারা ইতর প্রাণীর

ন্যায় কেবল লোভ কামাদি রিপু সমুদায়কে চরিতার্থ করিবার নিমিত্তেই সর্ব্বদা ব্যস্ত। পরমমঙ্গলাকর পরমেশ্বর ভূমণ্ডলস্থ অন্যান্য সমস্ত জন্তু অপেক্ষা মনুষ্যকে যে বিশিষ্টরূপে শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, তাঁহার মত কি কার্য্য করিতেছি ইহা সকলেরই একবার চিন্তা করা উচিত। ক্রমে ক্রমে সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলোন্নতি হয়, ইহাই পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, এবং ইহাই তাঁহার সমুদায় নিয়মের উদ্দেশ্য। এই পরম মনোহর উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করা সকলের পক্ষে বিধেয়। আপন আপন জীবিকানির্ব্বাহের উপায় চিন্তা করা যেরূপ আবশ্যক, সময়ে সময়ে একত্র সমাগত হইয়া স্বদেশের দুঃখবিমোচন ও সুখ সম্পাদনার্থে যত্ন ও চেষ্টা করাও সেইরূপ আবশ্যক।

প্রভু ও ভৃত্যের ব্যবহার।

এ কালপর্য্যন্ত জনসমাজে যেরূপ ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, তদনুসারে সর্ব্বদেশীয় লোকদিগকে প্রধান ও নিকৃষ্ট নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে হইয়াছে। ধন, বিদ্যা, কৃতিত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের ইতর বিশেষই এরূপ শ্রেণীভেদের মূলীভূত। এ প্রকার শ্রেণীভেদ হইলে, সুতরাং কাহাকেও বা সেবক অর্থাৎ ভৃত্য, কাহাকেও বা সেব্য অর্থাৎ প্রভু হইতে হয়। কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে কেহই স্বতন্ত্র নহে, উভয়েই পরতন্ত্র। উভয়েই পরস্পর সাহায্যসাপেক্ষ। প্রভু আপনার

অর্থ দিয়া ভৃত্যের আনুকূল্য করেন, ভৃত্য তদ্বিনিময়ে পরিশ্রম দিয়া প্রভুর উপকার করে। অতএব ভৃত্যকে হেয় ও জঘন্য জ্ঞান করা প্রভুর পক্ষে উচিত নয়, প্রভুর আজ্ঞা অবহেলা করাও ভৃত্যের পক্ষে বিধেয় নহে। তাঁহাদের পরস্পর কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে দুই চারি কথার উল্লেখ করা উচিত বোধ হইতেছে। অগ্রে প্রভুর কর্ত্তব্য, পশ্চাৎ ভৃত্যের কর্ত্তব্য লিখিত হইতেছে।

ভৃত্যদিগের প্রতি সতত সদয় ব্যবহার করা উচিত। তাহাদিগকে প্রহার ও প্রভুত্বপ্রদর্শন এবং তাহাদের প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করা কোন মতেই বিহিত নহে। তাহাদের প্রতি এরূপ ন্যায়বিরুদ্ধ ব্যবহার করিলে তাহাদের অনুরাগবৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত, রোষ ও বিদ্বেষেরই উদ্রেক হইতে থাকে। মান অপমান ও সুখ দুঃখবোধ সকলেরই তুল্যরূপ, এই পরম কল্যাণকর তত্ত্ব প্রভুদিগের অন্তঃকরণে সর্ব্বদা জাগরূক রাখা আবশ্যক।

ভৃত্যদিগের অবস্থা মন্দ বলিয়া তাহাদের উপর অত্যাচার করা কোন মতে উচিত নহে। তাহাদের প্রতি সর্ব্বদা স্নেহ বাৎসল্য ও সৌজন্য প্রকাশ করা এবং যখন যে বিষয়ের আদেশ করিতে হয়, তাহা প্রসন্নভাবে অকর্কশ মৃদু বচনে করাই শ্রেয়ঃকল্প। তাহারা যদি প্রভুর কার্য্যে অনুরক্ত থাকিয়া উচিতমত ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে বিশিষ্টরূপ যত্ন ও আদর করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তাহাদের শরীর অসুস্থ ও অস্বচ্ছন্দ

হইলে, তৎপ্রতীকারার্থে সম্যক্‌রূপে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; তাহারা কোন দুর্বিপাকে পতিত হইলে, উদ্ধার করা বিধেয়, তাহাদের ক্লেশনিবারণ ও অবস্থার উন্নতি-সাধনার্থ সুমন্ত্রণা প্রদান করা আবশ্যক। এতদ্দেশীয় অনেক লোক ভৃত্যদিগের প্রতি যেরূপ কটূক্তি ও কঠোর ব্যবহার করেন, তাহা অত্যন্ত গর্হিত। তাঁহারা অধীনস্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি যেরূপ অকথ্য অশ্রাব্য শব্দ সকল প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা শ্রবণ করিলে, লজ্জায় অধোমুখ হইতে হয়। অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করিলে যে ভদ্র লোকের ভদ্রতাগুণের ব্যতিক্রম হয়, ইহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না। একারণ এতদ্দেশে যাঁহারা ভদ্রলোক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই সহিত সহবাস ও কথোপকথন করা যথার্থ ভদ্রপ্রকৃতি সুশীল ব্যক্তির পক্ষে কঠিন কর্ম্ম। অন্যের প্রতি ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনা করিলে যে স্বকীয় স্বভাবকে কলঙ্কিত করা হয়, ইহা তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম নাই।

প্রভুর প্রতি ভৃত্যের যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তাহার অন্যথাচরণ দ্বারা সংসারের বিস্তর অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ভৃত্যের অহিতাচারে তদীয় স্বামীর যত উৎপাত উপস্থিত হয়, প্রভুর অত্যাচারে ভৃত্যের তত হইতে দেখা যায় না। অপহরণ ও বিশ্বাসঘাতকতা যে ভৃত্যের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গর্হিত কর্ম্ম, তাহা বলা বাহুল্য। তাহারা প্রভুকর্ত্তৃক যে কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, তাহা সবিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক সুচারুরূপে সম্পাদন করা কর্ত্তব্য।

প্রভুকে সম্যক্‌প্রকারে সমাদর করাও তাঁহার সন্তোষসাধনার্থ সর্ব্বদা সচেষ্টিত থাকা আবশ্যক। নিতান্ত চাটুকার হওয়া দূষণীয় বটে, কিন্তু ন্যায়ানুগত আচরণ দ্বারা প্রভুর সন্তুষ্টিসম্পাদনার্থ যত্নবান থাকা কদাচ দূষ্য নহে; প্রত্যুত সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। প্রভুর কার্য্য নিজ কার্য্য জ্ঞান করা, প্রভুর দুঃসময় ঘটিলে সাধ্যানুসারে আনুকূল্য করা এবং প্রভুর উপকার করিতে পারিলে, আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিয়া প্রফুল্ল ও প্রসন্ন-চিত্ত হওয়া প্রভুপরায়ণ পুণ্যশীল সেবকের প্রধান কর্ম্ম। প্রভুর কার্য্যে অবহেলা করিয়া আত্মকার্য্য সাধন করা এবং প্রভুকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে যে সময়ে প্রভুর কর্ম্ম বিহিত, সে সময় কর্ম্মান্তরে ক্ষেপণ অথবা নিরর্থক গল্প করিয়া নষ্ট করা কোনক্রমে কর্ত্তব্য নহে। প্রভু কোন কার্য্যে প্রেরণ করিলে অনেকে যে স্থানান্তরে ও কার্য্যান্তরে কালক্ষেপ করিয়া আইসে, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। এরূপ ন্যায়বিরুদ্ধ ব্যবহার অত্যন্ত দূষ্য ও ঘৃণাকর। এরূপ আচরণ নিতান্ত স্বার্থপরতার লক্ষণ। প্রভুর কার্য্যে যত্ন ও অনুরাগ থাকিলে এরূপ ব্যবহার করিতে কোনরূপে প্রবৃত্তি হয় না।

মেঘ ও বৃষ্টি।

জল উত্তপ্ত হইলে যে ধূমাকার পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বাষ্প কহে। শীত ঋতুর প্রাতঃকালে নদী, সরোবর প্রভৃতি

হইতে যে ধূমাকার বস্তু উঠিতে দেখা যায়, তাহাও ঐ বাষ্প বৈ আর কিছুই নয়। ঐ সকল বাষ্প ঘন হইলেই মেঘ হয়। মেঘ সচরাচর দুই ক্রোশের অধিক উঠিতে পারে না। এমন কি, অনেক মেঘ দেড় ক্রোশ পর্য্যন্তও উত্থিত হয় না। বৃষ্টির সময়ে কতকখান মেঘ কেবল অর্দ্ধ ক্রোশ মাত্র ঊর্দ্ধে থাকিয়া জল বর্ষণ করে, এই নিমিত্ত উচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ করিলে অধোদিগে মেঘের চলাচল দেখিতে পাওয়া যায়। চারি পাঁচ ক্রোশ উপরের বায়ু অতি স্বচ্ছ ও পরিশুদ্ধ। তথায় মেঘ ও বাষ্পের লেশমাত্রও নাই।

মেঘের উৎপত্তি, বায়ুর শৈত্য ও উষ্ণত্বের উপর বিস্তর নির্ভর করে। জল যত উত্তপ্ত হয়, তাহা হইতে ততই বাষ্প উঠিতে থাকে। এনিমিত্ত প্রখর গ্রীষ্মের সময়ে অধিক বাষ্প উৎপন্ন হইয়া অধিক দূর [illegible]থিত হয়। সেই সমস্ত বাষ্প উপরিস্থিত বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া থাকে, অত্যন্ত লঘু বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ সমূহ বাষ্প-রাশি আকাশমণ্ডলে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে এমত সময়ে যদি কোন দিক্ হইতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইয়া তাহার সহিত মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে ঐ সকল বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘ জন্মায়। এইরূপ অন্য অন্য কারণেও বায়ুর উষ্ণতাহ্রাস ও শৈত্য বৃদ্ধি হইয়া মেঘ উৎপাদন করে। দিবাবসানকালে বায়ুর উত্তাপ ক্রমশঃ অল্প হইতে থাকে ; এই নিমিত্ত সে সময়ে সতত মেঘ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। উপরিস্থিত বায়ু অধঃস্থিত বায়ু অপেক্ষায়

শীতল, এই হেতু যে সমস্ত জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হইবার সময়ে অদৃশ্য থাকে, তাহা উপরে উঠিয়া ঘন হইয়া মেঘ জন্মায়।

উপরে প্রতিক্ষণ নানা দিকে নানাপ্রকার বায়ুপ্রবাহ বহিতে থাকে, এবং সেই সঙ্গে মেঘসমুদায় ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া অশেষবিধ অদ্ভুত আকার ধারণ করে। এক নিমেষের নিমিত্তেও স্থির নহে, সর্ব্বদাই তাহাদের কোন না কোনপ্রকার পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়। অদৃশ্য জলীয় বাষ্পের সহিত শীতল বায়ু মিশ্রিত হইলে, যেমন সেই বাষ্প ঘন হইয়া মেঘ উৎপাদন করে, সেইরূপ আবার উৎপাদিত মেঘে উষ্ণ বায়ু লাগিলে, সেই মেঘ বিক্ষিপ্ত হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। এক একখান মেঘ উঠিতে উঠিতে যে অন্তর্হিত হইতে দেখা যায় তাহার কারণ এই।

সমুদায় মেঘই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জল[illegible]সমূহ ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। তাহাতে সূর্য্যের কিরণ পতিত হইয়া অশেষ-প্রকার মনোহর বর্ণ উৎপাদন করে। সূর্য্যকিরণে নীল, পীত, লোহিত, হরিত, পাটল প্রভৃতি নানা বর্ণ আছে। বহুকোণ-বিশিষ্ট কাচে ও অন্য অন্য কোন কোন বস্তুতে সূর্য্যকিরণ পাতিত করিয়া ঐ সকল বর্ণ পৃথক করিয়া দেখান যায়। বেলোয়ারি ঝাড়ের কলমে রৌদ্রের আভা পতিত হইয়া যে নানাবিধ বর্ণ উৎপাদন করে, তাহা অপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে। গগনমণ্ডলস্থ মেঘাবলির বিচিত্র বর্ণও এইরূপে উৎ-পন্ন হইয়া থাকে। সচরাচর এই কয়েক বর্ণের মেঘ দেখিতে

পাওয়া যায়, শ্বেত, পীত, লোহিত, পিঙ্গল ও ধূসর। হরিদ্বর্ণ মেঘও পরম সুদৃশ্য, কিন্তু অতি বিরল। সায়ংকালীন জলদজালের মনোহর শোভা সন্দর্শন করিয়া কে না মোহিত হয়!

রামধনুর পরম সুন্দর শোভাও ঐরূপে সমুদ্ভূত হয়। উল্লিখিত বহুকোণ কাচের ন্যায়, বৃষ্টিকালীন জলকণাসমূহে সূর্য্যরশ্মি পতিত হইলেও তাহার অন্তর্ব্বর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন কিরণজাল সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। উহার এক একটী জলকণা এক এক খানি বহুকোণ কাচস্বরূপ। বহুসংখ্যক জলবিন্দু একত্র হইয়া রামধনু উৎপাদন করে। নভোমণ্ডলের যে ভাগে সূর্য্যমণ্ডল অবস্থিত থাকে, তাহার বিপরীত ভাগে রামধনু দৃষ্ট হয়। সূর্য্যকিরণের ন্যায় চন্দ্রকিরণেও রামধনু উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু চান্দ্র রামধনুর বর্ণ সৌর রামধনুর তুল্যরূপ উজ্জ্বল নহে। লোকে উহাকে রামধনু ও ইন্দ্রধনু উভয়ই বলিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক উহা কাহারও ধনু নহে। জলকণাসমূহে সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়া এইরূপ মনোহর আকার উৎপন্ন হয়। যিনি এই অত্যাশ্চর্য্য অচিন্ত্য বিশ্বকার্য্যের সর্ব্বস্থানে সুললিত সৌন্দর্য্যসুধা বর্ষণ করিয়াছেন, উহাতে কেবল তাঁহারই অনির্ব্বচনীয় মহিমা প্রকাশ পাইতেছে!

মেঘ কেবল ক্ষুদ্র জলকণা ব্যতিরেকে যে আর কিছুই নহে, ইহা পূর্ব্বে একবার উল্লিখিত হইয়াছে। যেমন বাষ্প শীতল হইয়া মেঘ জন্মায়, সেইরূপ, মেঘ শীতল হইলে তাহার অণুসমুদায় ঘন হইয়া জল হইয়া পড়ে। যে মেঘের তাপ যে স্থানের

বায়ুর ভারের সমান, সেই মেঘ সেই স্থানে অবস্থিত থাকে। পরে কোন হেতুবশতঃ শীতল হইলেই, ঘনীভূত ও ভারাক্রান্ত হইয়া জলধারারূপে পৃথিবীতে পতিত হয়, ইহাকেই বৃষ্টি কহে। অতএব বৃষ্টির নিয়ম অতি সহজ। ইহা জানিবার নিমিত্ত অধিক আয়াস আবশ্যক করে না।

সমুদ্র ও জলাভূমি হইতে অধিক বাষ্প উত্থিত হয়। এই নিমিত্ত সেই সেই স্থানে ও তাহার সমীপবর্ত্তী প্রদেশে অধিক বৃষ্টি হইয়া থাকে। পর্ব্বতশিখর অপেক্ষাকৃত শীতল, অতএব যে সকল মেঘ চলিতে চলিতে পর্ব্বতশিখরে গিয়া অবস্থিত হয়, তাহা শীতে ঘনীভূত হইয়া জল হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত পর্ব্বতেও অধিকপরিমাণে জলবর্ষণ হইয়া থাকে। যে পর্ব্বত সমুদ্রের সমীপবর্ত্তী, তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বর্ষণ হয়, এবং যে পর্ব্বত সমুদ্রতট হইতে দূরবর্ত্তী, তাহাতে তদপেক্ষা অল্পতর বৃষ্টিপাত হয়।

বায়ুপ্রবাহের ইতরবিশেষ দ্বারা বৃষ্টিপাতেরও অনেক ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকে সমুদ্র, এ নিমিত্ত বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ প্রভৃতি যে কয়েক মাস দক্ষিণ দিক অথবা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে বায়ু বহিতে থাকে, সেই সেই মাসে উল্লিখিত সমুদ্র হইতে উৎপন্ন মেঘসমুদায় ঐ বায়ুসহকারে সঞ্চারিত হইয়া ভারতভূমির উপর প্রচুর বারি-বর্ষণ করে। এই প্রবল বায়ু কয়েক মাস প্রবাহিত থাকাতে ভারতবর্ষের বর্ষাকাল, শীত, বসন্ত গ্রীষ্মাদি ঋতুর ন্যায়, এক

স্বতন্ত্র ঋতু বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে। ইংলণ্ডে ও তাদৃশ অন্য অন্য প্রদেশে এরূপ স্বতন্ত্র বর্ষা ঋতু নির্দ্দিষ্ট নাই; সে সকল স্থানে বার মাসই বৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষের উত্তর দিকে মেঘোৎপত্তির উপায় নাই। এই নিমিত্ত এতদ্দেশে কার্ত্তিক মাসে দক্ষিণ বায়ু নিবৃত্ত হইয়া উত্তরীয় বায়ু আরব্ধ হইলে, জলবর্ষণও এক প্রকার নিবৃত্ত হয়।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডের অর্থাৎ দক্ষিণাপথের পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ তিন দিকেই সমুদ্র। এ নিমিত্ত যে সময়ে পশ্চিম দক্ষিণ কোণ হইতে বায়ু বহিতে থাকে, তখন দক্ষিণাপথের পশ্চিম দক্ষিণ প্রান্তে, অর্থাৎ মলয়বর দেশে প্রচুর বারিবর্ষণ হয়, এবং যখন পূর্ব্বোত্তর হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়, তখন পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তে, অর্থাৎ চোল-মণ্ডল নামক উপকূলে আসিয়া মেঘ ও বৃষ্টি উপস্থিত করে।

পর্ব্বতাদি দ্বারা বায়ুর প্রবাহ প্রতিরুদ্ধ ও পরিবর্ত্তিত হওয়াতেও বৃষ্টিপাতের অনেক ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। যে বায়ু-প্রবাহ দ্বারা বাষ্পরাশি আনীত হইয়া ভারতবর্ষের পূর্ব্বোত্তর খণ্ডে মেঘ সঞ্চারিত ও বারি বর্ষিত হয়, তাহা প্রথমতঃ পশ্চিম দক্ষিণ হইতে বঙ্গীয় অখাতের উপর দিয়া বাহিত হয়। পরে যখন হিমালয় ও তৎসন্নিহিত দক্ষিণদিক্‌স্থ পর্ব্বতের নিকট উপনীত হইয়া তদ্দ্বারা প্রতিহত হয়, তখন আর উত্তরাংশে গমন করিতে না পারিয়া পশ্চিমোত্তর ভাগে চলিতে থাকে। পশ্চিমোত্তর ভাগে বহিতে বহিতে যখন হিন্দুকোষ নামক পর্ব্বতে

গিয়া উপস্থিত হয়, তখন তদ্দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইতে থাকে। এই প্রকারে সুলিমান নামক পর্ব্বত পর্য্যন্ত গমন করিয়া তদ্দ্বারা পুনরায় প্রতিহত হইয়া অন্য দিকে সঞ্চরণ করে।

যে সমস্ত মেঘ ও বাষ্প উল্লিখিত বায়ুপ্রবাহ দ্বারা সঞ্চারিত হয়, তাহা হিমালয়ের উত্তরাংশে গমন করিতে পারে না। হিমালয়কর্ত্তৃক প্রতিরুদ্ধ হইয়া বারিবর্ষণপূর্ব্বক গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী প্রভৃতি অনেক অনেক নদীর জল বৃদ্ধি করে, ও সেই সমস্ত নদীর তীরস্থ ভূমি জলে প্লাবিত করিয়া উর্ব্বরা হইতে থাকে। ঐ বায়ু হিমালয় উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহার উত্তর দিকে মেঘ ও বাষ্প সঞ্চালন করিতে পারে না, এনিমিত্ত জলাভাবে সেই প্রদেশ মরুভূমি হইয়া রহিয়াছে।

যদি কোন পর্ব্বতময় প্রদেশ হইতে বায়ু বহিতে থাকে, তাহা হইলে, তত্রত্য মেঘসমুদায় সেই বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত হইয়া অন্য অন্য নিম্ন স্থানে গিয়া বর্ষণ করে। যদি সেই সমস্ত স্থান অপেক্ষাকৃত উষ্ণ হয়, তাহা হইলে ঐ মেঘ ঘনীভূত না হইয়া আরও লঘু হইয়া যায়, সুতরাং তাহাতে বৃষ্টি হয় না। এই কারণে ইউরোপের দক্ষিণ-পার্শ্ব-বর্ত্তী ভূমধ্য সাগর হইতে যে সমস্ত বাষ্পরাশি উৎপন্ন হইয়া মিশর দেশের উপর দিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করে, তাহা উল্লিখিত মিশর দেশের উপরে ঘনীভূত ও বর্ষিত না হইয়া উত্তরোত্তর দক্ষিণ দিকেই চলিয়া যায়। পরে যখন আবিসিনিয়ার পর্ব্বতময় উন্নত প্রদেশে গিয়া

উপস্থিত হয়, তখন জল হইয়া বর্ষিত হইতে থাকে। এই নিমিত্ত মিশর দেশে সর্ব্বদাই অনাবৃষ্টি, গ্রীষ্মকালে মূলেই বৃষ্টি হয় না, অন্য অন্য সময়েও অতি অল্প। বিশেষতঃ, তাহার দক্ষিণখণ্ডে জল-বর্ষণ অতি অসামান্য ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত আছে। তত্রত্য লোক বৃষ্টিব্যতিরেকে কিরূপে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে, বিবেচনা করিতে হইলে, আপাততঃ বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কিন্তু করুণাময় পরমেশ্বর অনির্ব্বচনীয় কৌশল প্রকাশ করিয়া তাহাদের অনাবৃষ্টিঘটিত অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা একবারে নিবারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তথায় যেমন যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয় না, তেমন গ্রীষ্মকালে এরূপ শিশিরবর্ষণ হয়, যে তথাকার মৃত্তিকা তাহাতে আর্দ্র হইয়া বিলক্ষণ উর্ব্বরা হইয়া উঠে। তদ্ভিন্ন, তথায় নীল নামে এক নদী আছে; তাহা গঙ্গা নদীর ন্যায়, প্রতিবর্ষে বৃদ্ধি পাইয়া উভয় তট কয়েক মাস জলে প্লাবিত করিয়া রাখে। উহাতে ঐ উভয়তীরস্থ ভূমি অত্যন্ত রসশালিনী হইয়া অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপাদন করে।

সৌর জগৎ।

আপাততঃ বোধ হয়, পৃথিবী এক স্থানে স্থির হইয়া আছে, আর সূর্য্য তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা নিঃসংশয়ে নিরূপণ করিয়াছেন সূর্য্যমণ্ডল, বুধ, শুক্র পৃথিব্যাদি গ্রহগণের মধ্যবর্ত্তী;

গ্রহগণ তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে। সূর্য্য নিজে গ্রহ নহে, যাহারা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে এইরূপ পরিভ্রমণ করে, তাহাদেরই নাম গ্রহ। আমাদের অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবীও সূর্য্যকে এইরূপ প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে, অতএব পৃথিবীও এক গ্রহ।

সমুদয়ে কত গ্রহ আছে, নিশ্চয় বলা যায় না। এপর্য্যন্ত ১১৪ এক শত চৌদ্দটী আবিষ্কৃত হইয়াছে। অন্য অন্য গ্রহ অপেক্ষায় বুধ গ্রহ সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী, তাহার পর শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, হর্শেল ও নেপচ্যুন গ্রহ যথাক্রমে সূর্য্য-মণ্ডলের নিকট হইতে উত্তরোত্তর অধিক দূরে অবস্থিত রহিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে বল্কান নামে আর একটি গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা সূর্য্যমণ্ডল ও পৃথিবীমণ্ডলের মধ্যে কোন স্থানে থাকিয়া সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে। উল্লিখিত প্রধান নয় গ্রহ ব্যতিরিক্ত ফ্লোরা, বিক্টোরিয়া, বেষ্টা, আইরিস, মীটিস, হীবি, পার্থেনোপি, অষ্ট্রিয়া, ইজীরিয়া, ইউনোমিয়া, যুনো, সীরিস্, পালাস হাইজীয়া প্রভৃতি ১০৫ একশত পাঁচটী ক্ষুদ্রতর গ্রহ, মঙ্গল ও বৃহস্পতির ভ্রমণপথের মধ্যস্থলে থাকিয়া সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে। ইহারা পূর্ব্বোক্ত প্রধান নয় গ্রহ অপেক্ষায় অনেক ছোট, অতএব কনিষ্ঠ গ্রহ বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে।

গ্রহগণ যেমন সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে, সেইরূপ কতকগুলি উপ-গ্রহ আছে, তাহারা কোন কোন গ্রহের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ

করে। চন্দ্র পৃথিবীগ্রহ প্রদক্ষিণ করে, অতএব উহা এক উপ-গ্রহ। পৃথিবীর যেমন এই এক উপগ্রহ, বৃহস্পতির ঐরূপ চারি, শনির আট, হর্শেলের ছয়, এবং নেপ্‌চ্যুন গ্রহের দুই উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সূর্য্য, গ্রহ ও উপগ্রহ এখান হইতে অতি ছোট দেখায় বটে, কিন্তু বাস্তবিক অতি বৃহৎ পদার্থ। পৃথিবী কিরূপ বৃহৎ তাহা চারুপাঠের প্রথমভাগে লিখিত হইয়াছে। হর্শেল গ্রহ তাহার ৮২ গুণ, নেপ্‌চ্যুন ১০৮ গুণ, শনি ৭০৫ গুণ এবং বৃহস্পতি ১৪১৪ গুণ। কিন্তু সৌর জগতে গ্রহ উপগ্রহাদি যত বৃহৎ বস্তু আছে, সূর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তর। উহা এত বৃহৎ, যে আমাদের অধিষ্ঠানভূতা অবনীর তুল্য ১৪,০০,০০০ চতুর্দ্দশ লক্ষ জীবলোক উহার গর্ভমধ্যে নিবিষ্ট থাকিতে পারে। উহার আয়তন একত্রীকৃত সমুদায় গ্রহের আয়তন অপেক্ষা প্রায় ৬০০ গুণ অধিক। যদি সূর্য্যমণ্ডলের অভ্যন্তর খনন করিয়া শূন্য করা যায়, এবং ভূমণ্ডল তাহার মধ্যস্থানে স্থাপিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে, পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে এত স্থান থাকে, যে চন্দ্রমণ্ডল ভূমণ্ডলের কেন্দ্র হইতে এক্ষণে যত অন্তরে অবস্থিত আছে, তাহা অপেক্ষা আর ৮১,০০০ ক্রোশ অধিক অন্তরে স্থাপিত হইলেও, অনায়াসে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পারে।

আত্মবিষয়ক কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

শারীরিক স্বাস্থ্য-সাধন।

পরাৎপর পরমেশ্বর অন্যান্য অশেষ প্রকার সুখকর ব্যাপারের ন্যায় শারীরিক স্বাস্থ্যলাভও আমাদের আয়ত্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি মনুষ্যকে উৎকৃষ্ট দেহ প্রদান করিয়া কতকগুলি এপ্রকার মনোহর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন যে, তাহা পালন করিলেই পরম আরোগ্য উপভোগ করা যায়। আমাদের আত্ম-বিষয়ক কর্ত্তব্যের মধ্যে জ্ঞানোপার্জ্জন করা যেমন প্রথম কার্য্য, আপনার শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখা সেইরূপ দ্বিতীয় কার্য্য।

শরীরী জীবের পক্ষে শারীরিক সুস্থতা অপেক্ষায় সুখকর বিষয় আর কিছুই নাই। শরীর ভগ্ন হইলে, সমুদায় সংসার কেবল দুঃখের আগারস্বরূপ প্রতীয়মান হয়। যেমন গগনমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইলে, পূর্ণচন্দ্রের সুধাময় কিরণ প্রকাশ পায় না, সেইরূপ শরীর অসুস্থ হইলে, শারীরিক ও মানসিক কোন প্রকার সুখাস্বাদনে সমর্থ হওয়া যায় না। তখন অতুল ঐশ্বর্য্য, বিপুল যশ, প্রভূত মান সম্ভ্রম, কিছুতেই অন্তঃকরণ প্রসন্ন ও মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হয় না। রোগী ব্যক্তি সর্ব্বদাই অসুখী, সকল বিষয়েই বিরক্ত, এবং কেবল রোগের চিন্তাতেই চিন্তাকুল। কত কষ্টেই তাহার দিনযাপন হয়। তাহার দুঃখের দিন কত

দীর্ঘই বোধ হয়। চিররোগী ব্যক্তিদিগের শরীর কেবল দুর্ব্বহ ভারস্বরূপ হইয়া উঠে। তাহারা নিয়তই উদ্বিগ্ন এবং সর্ব্বদাই সঙ্কুচিতচিত্ত। আহারবিহারাদি শরীর-রক্ষোপযোগী সকল ব্যাপারেই কুণ্ঠিত থাকিয়া কোন ক্রমে কষ্টসৃষ্টে কালহরণ তাহাদের নিত্যব্রত হইয়া উঠে। স্বাস্থ্য-রক্ষার্থে যত্ন না করা যে দুষ্কর্ম্ম, এই সমস্ত প্রত্যক্ষ শাস্তিই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ।

পরমেশ্বর মনুষ্যের মনের সহিত শরীরের এরূপ নিকট সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া দিয়াছেন যে, শরীর সুস্থ ও সবল থাকিলে, অন্তঃকরণও সুস্থ ও স্ফূর্ত্তি-বিশিষ্ট থাকে, এবং অন্তঃকরণ সতেজ ও প্রফুল্ল থাকিলে, শারীরিক সুস্থতাও সাতিশয় সুলভ হয়। উভয়ের সুস্থতা উভয়ের পক্ষে উপকারী, এবং উভয়ের অসুস্থতা উভয়ের পক্ষেই অপকারী। অন্তঃকরণ শোকাকুল হইলে শরীরও শীর্ণ হয়, এবং শরীর পীড়িত হইলে, ক্রোধ-রিপু প্রবল হয়, এবং দয়া ভক্তি প্রভৃতি কতকগুলি উৎকৃষ্ট বৃত্তি দুর্ব্বল হয়। যে শিশু সতত সহাস্যবদন, পীড়িত হইলে সেও সর্ব্বদা বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়। তখন আর তাহার মনোহর মধুর হাস্য দৃষ্ট হয় না, এবং অর্দ্ধস্ফুট সুমিষ্ট শব্দসকলও শ্রুত হয় না। প্রখর ক্ষুধার সময়ে স্বাস্থ্যকর দ্রব্য ভক্ষণ না করিলে, শরীর বলহীন হইয়া মনও নিস্তেজ হইতে থাকে, এবং অত্যন্ত গুরুতর ভোজন করিলে শরীর ও মন উভয়েরই গ্লানি উপস্থিত হইয়া শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার পরিশ্রম করিতেই ক্লেশ বোধ হয়। কোন কার্য্যোপলক্ষে প্রচণ্ড রৌদ্রে গলদ্‌ঘর্ম্মকলে-

বরে অবিশ্রান্ত পথ পর্য্যটন করিলে, অন্তঃকরণ উত্ত্যক্ত হইয়া উঠে, কিন্তু প্রাতঃকালে বিশ্বপতির বিশ্বকার্য্যের পরমাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শন পুরঃসর সুশীতল সমীরণ সেবন করিলে, মনোমধ্যে পরম পরিশুদ্ধ আনন্দ-রসের উদ্রেক হইতে থাকে। শারীরিক পীড়া হইয়া কত কত ব্যক্তির স্মারকতা শক্তির হ্রাস হইতে দেখা গিয়াছে, এবং রোগ-শান্তি ও স্বাস্থ্য-বৃদ্ধি হইয়া কত কত ব্যক্তির স্মরণশক্তি প্রবল হইয়াছে। অতএব, যখন শরীরের সহিত মনের এ প্রকার নিকট সম্বন্ধ নিরূপিত রহিয়াছে, এবং যখন শরীর সুস্থ না থাকিলে, কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায় যথা বিধানে সম্পাদন করিতে পারা যায় না, তখন জীবনরক্ষা, ধর্ম্ম-রক্ষা, সুখসাধন প্রভৃতি সকল বিষয়ের নিমিত্তেই শারীরিক স্বাস্থ্যলাভার্থে যত্নবান থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদি প্রীত মনে পরিবার প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য হন, পরোপকার করা বিধেয় হয়, পরম পিতা পরমেশ্বরকে প্রগাঢ়রূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা উচিত হয়, তবে স্বীয় শরীরকে সুন্দররূপ সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য তাহার সন্দেহ নাই; কারণ শরীর ভগ্ন হইলে, ঐ সমস্ত অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। যদি পরম শ্রদ্ধাস্পদ পিতা মাতাকে যন্ত্রণারূপ অগ্নিশিখায় দগ্ধ করা অধর্ম্ম হয়, এবং যদি প্রাণাধিক প্রিয়তর পুত্রকন্যাদিগকে যথানিয়মে প্রতিপালন না করা দুষ্কর্ম্ম হয়, তবে সাধ্যসত্ত্বে শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়া এই সমস্ত বিষম বিপত্তি উপস্থিত করা

অবশ্যই অধর্ম্ম তাহার সন্দেহ নাই। আত্মহত্যা যে মহাপাপ, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। জলপ্রবেশ, অগ্নিপ্রবেশ, উদ্বন্ধনাদি দ্বারা একেবারে প্রাণত্যাগ করা আর ক্রমাগত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে দেহনাশ করা উভয়ই তুল্য। কেবল শীঘ্র আর বিলম্ব এইমাত্র বিশেষ। অতএব, পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদের শরীররক্ষার্থে যে সমস্ত শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা পালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। না করিলে প্রত্যবায় আছে!

শিশুদিগের প্রতি কর্ত্তব্য।

শিশু সকলে স্বকীয় শুভাশুভ কিছুই জানিতে পারে না, অতএব তাহাদিগকে অনন্যভাবে জনক জননীর বশবর্ত্তী থাকিয়া তদীয় আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিতে হয়। তাঁহারা শিশু সন্তানদিগকে যাহা কিছু অনুমতি করেন, সমুদায়ই তাহাদের শুভাভিপ্রায়ে সঙ্কল্পিত। যাঁহারা তাহাদের সুখে সুখী ও তাহাদের দুঃখে দুঃখী, তাঁহারা তাহাদের যত কল্যাণচিন্তা করেন, ভূমণ্ডলে অন্য ব্যক্তি তাহার শতাংশের এক অংশও করে না। এই পরম শুভদায়ক তত্ত্ব শিশুগণের যত হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে পারা যায়, ততই মঙ্গল, ততই তাহারা পিতা মাতার আজ্ঞা পরিপালন করা সুখের বিষয় বোধ করিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়।

অনেকানেক বালককে ক্রমে ক্রমে পিতা মাতার অবাধ্য হইতে দেখা যায় বটে,কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, মাতা পিতার অনুকম্পা, অভিজ্ঞতা ও স্নেহপ্রবৃত্তির অল্পতা ইহার এক প্রধান কারণ। তাহারা পিতা বা মাতা বলিয়া জানিলেই যে তাঁহার বশীভূত হয় এমত নহে। জনক জননীর প্রবল বুদ্ধি, প্রচুর জ্ঞান ও সন্তানের শুভোন্নতিসাধনার্থ একান্ত যত্ন না দেখিলে, তাহাদের ভক্তি শ্রদ্ধার উদয় হয় না। কোন ব্যক্তিকে বিস্বাদ বস্তু সুস্বাদ বোধ করিতে আদেশ করিলে, সে যেমন তাহা কোন মতেই সুস্বাদু বলিয়া প্রতীতি করিতে পারে না, সেইরূপ যে ব্যক্তির সতেজ বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রবল ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কার্য্য না দেখা যায়, তাঁহার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধার সঞ্চার হয় না। শিশুগণের সমক্ষে সদ্‌গুণ ও সদ্ব্যবহার প্রদর্শন না করিয়া তাহাদিগকে কেবল তিরস্কার করিলে, বরং বিপরীত ফলেরই উৎপত্তি হয়। যাহার প্রতি কঠোর ব্যবহার ও কর্কশ কথা প্রয়োগ করা যায়, তদ্দ্বারা তাহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উদয় হওয়া দূরে থাকুক, প্রতিবিধিৎসা, প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিই উত্তেজিত হইয়া উঠে। বিষাক্ত শর বিদ্ধ করিয়া কি কাহারও শরীর সুস্থ করা যায়? না ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে প্রদীপ্ত অনল শীতল হয়? নিম্ববৃক্ষ রোপণ করিয়া রসপূরিত অমৃত ফল লাভের প্রত্যাশা করা আর তিরস্কার ও শাস্তি প্রদান দ্বারা বালকগণের শ্রদ্ধাস্পদ ও প্রীতিভাজন হইবার আশা করা উভয়ই তুল্য, উভয়ই নিতান্ত নিষ্ফল হয়। তাহাদের প্রেমাস্পদ ও ভক্তিভাজন হইতে হইলে

তাহাদের নিকট আপনার জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রদর্শন করিতে হয়। যদি কোন ব্যক্তি বালকগণের সমীপে সুবিজ্ঞতা ও সদাচরণ দ্বারা আপনার এরূপ মনোহর স্বভাব প্রকাশ করিতে পারেন যে, তাহা দেখিলে স্বভাবতই ভক্তি ও প্রীতির উদয় হয়, এবং যদি তদ্দ্বারা তাঁহাকে জ্ঞানাপন্ন ও ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া তাহাদের দৃঢ়প্রত্যয় জন্মে, তাহা হইলে, যদিও নিতান্ত অধম বালকেরা তাঁহার সম্যক্ বশতাপন্ন না হয়, কিন্তু উত্তম ও মধ্যম বালকেরা তাঁহার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার বশবর্ত্তী হইবে তাহার সন্দেহ নাই। যেমন সুশীতল চন্দন লেপন করিলে শরীর সুশীতল হয়, সেইরূপ সুধাময়ী ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সংস্পর্শে, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির সঞ্চার হয়।

কোন কোন বালকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এরূপ দুর্ব্বল, ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি এতাদৃশ প্রবল যে, তাহারা কোন মতেই বিনীত ও বশবর্ত্তী হয় না। কিন্তু তাহারা সহজে বশীভূত হয় না বলিয়া তাহাদের চরিত্রসংশোধনের আশা একেবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে, সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির এতাদৃশ প্রবলতাকে এক প্রকার রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যেমন শরীরস্থ শোণিত-প্রবাহের অতি-মাত্র প্রবলতা হইয়া জ্বররোগের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ অতি-তেজস্বতী নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া দুশ্চরিত্ররূপ মহারোগ উৎপাদন করে। পাপরূপ পীড়ায় পীড়িত বালকদিগকে এক স্বতন্ত্র স্থানে রাখিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

যে স্থানে লোভের সামগ্রী ও অন্য অন্য নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বিষয় উপস্থিত না থাকে, সেই স্থানে তাহাদিগকে স্থাপিত করা উচিত। তাহাদিগের ব্যবহারের প্রতি সতত দৃষ্টি রাখিবার ও তাহাদের উপর সর্ব্বদা অধ্যক্ষতা করিবার নিমিত্ত এক এক জন শিক্ষক নিযুক্ত রাখা আবশ্যক। তাহাদের যে সমস্ত ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দুর্ব্বল, তাহা সবল করিবার নিমিত্ত নানামত উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য, এবং যাহাতে সেই সকল বৃত্তি স্ব স্ব বিষয় পাইয়া পরিচালিত হইতে পারে এরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া বিধেয়। আপন আপন সন্তানদিগের চরিত্রশোধনার্থ এপ্রকার উপায় করা অনেকের পক্ষে সুসাধ্য নহে, অতএব এই বহুকল্যাণকর বিষয় সম্পাদনার্থে সাধারণ বিদ্যালয়ের ন্যায় এক এক সাধারণ স্থান নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। অধম বালকেরা তথায় অবস্থিতি করিয়া বিনীত ও শিক্ষিত হইলে, কালক্রমে শুদ্ধচরিত হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে সমর্থ হয়। এরূপ উপায় দ্বারাও যাহারা ন্যায়ানুগত ও ধর্ম্মপথাবলম্বী না হয়, তাহাদের পরিত্রাণ প্রাপ্তির আর অন্য উপায় নাই।

মনুষ্যের সুখোৎপত্তির বিষয়।

মনুষ্যের প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধের বিষয় সংক্ষেপে বিবরণ করা গিয়াছে, এক্ষণে তাঁহার সুখোৎপত্তির মূল অন্বেষণ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ। ইহা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে যে, শরীর ও মন চালনা না করিলে সুখানুভব হয় না। "শরীর ও মনোবৃত্তি সকল চালনা কর; সুখলাভের আর দ্বিতীয় পথ নাই," এই শুভ-করী নীতি পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞাস্বরূপ। তাহারা সুষুপ্ত-বৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে আমাদের জীবিত থাকাই বৃথা হইত; মনুষ্যের জীবনে ও বৃক্ষাদির জীবনে কিছুই বিশেষ থাকিত না। ফলতঃ সর্ব্বতোভাবে নিশ্চেষ্ট থাকা আমাদিগের স্বভাব-বিরুদ্ধ। যদি কোন বালক গৃহমধ্যে অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্কোপরি সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে, আর তথা হইতে তাহার ক্রীড়াসক্ত বয়স্যা-দিগের কেলিকোলাহল শ্রবণ করে, এবং তাহারা কি ক্রীড়া করিতেছে, তাহাও অনুভব করিতে পারে, তবে সে বহির্গত হইয়া তাহাদের সঙ্গী হইবার নিমিত্ত কেমন ব্যগ্র হয়? যদি তাহার পিতা তাহাকে নিবারিত করিয়া রাখেন, তাহা হইলে, তাহার মনোদুঃখের আর সীমা থাকে না। এইরূপ, যদি কোন প্রবীণ ব্যক্তি ঘোরতর দুর্দ্দিনপ্রযুক্ত ক্রমাগত ৫।৭ দিবস গৃহের বহির্ভূত হইতে না পারেন, তবে তিনিও বিরক্ত ও অস্থির হন তাহার সন্দেহ নাই। যিনি সর্ব্বদা প্রসন্নচিত্ত থাকেন, এমত স্থলে তাঁহারও অপ্রসন্ন বদন দেখা যায়। অতএব মনুষ্যের সুখ-লাভ কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে কি না, তাহা যৎকালে তিনি সর্ব্বথা নিশ্চেষ্ট থাকেন, তখনই সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন।

আমরা শরীর ও মন পরিচালনে প্রবৃত্ত হইয়া আনন্দলাভ

করিব, এই অভিপ্রায়ে পরমেশ্বর সমস্ত জগতের সহিত মানব-প্রকৃতির তদুপযোগী সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া রাখিয়াছেন। দেখ, আহারব্যতিরেকে শরীর রক্ষা পায় না, সুতরাং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অন্ন আহরণ করিতে হয়। পশুদিগের যেমন গাত্রলোম আছে, আমাদিগের শীতনিবারণার্থ তাদৃশ কোন স্বাভাবিক আচ্ছাদন নাই, সুতরাং শরীর ও মনের চেষ্টা দ্বারা পরিধেয় প্রস্তুত করিতে হয়। আমাদিগের সমুদায় মনোবৃত্তি স্ব স্ব বিষয় লাভার্থে নিয়ত ব্যগ্র, কিন্তু চালনা ব্যতিরেকে তাহাদিগকে চরিতার্থ করিবার উপায় নাই। অতএব, আমাদিগের শরীর ও মনকে সম্যক্ সচেষ্ট রাখা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া যত চালনা করিবে, ততই শরীরের অঙ্গসকল সবল হইবে, মনের বৃত্তিসকল সতেজ হইবে, এবং অন্তঃকরণ সুখার্ণবে মগ্ন হইতে থাকিবেক।

আমাদিগের জ্ঞানাভিলাষ অত্যন্ত প্রবল। জ্ঞানলাভই সমুদায় বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন, এবং কেবল জ্ঞানামৃতপান দ্বারাই তাহারা চরিতার্থ হয়। কোন অভিনব বস্তুসন্দর্শনমাত্রেই অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়, তাহার সবিশেষ গুণাগুণ জানিতে ইচ্ছা ও উৎসাহ হয় এবং তাহার স্বভাব ও প্রয়োজন যত জানা যায়, ততই সুখোদয় হইতে থাকে। সে বস্তু দ্বারা আমাদিগের কোন সাংসারিক উপকার না হউক, তথাপি তাহার আলোচনামাত্রেই এরূপ নির্ম্মল আনন্দ অনুভূত হয় যে, তজ্জন্য শারীরিক ও

সাংসারিক ক্লেশ সহ্য করিতে হইলেও সে রমণীয় জ্ঞানালোচনা পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। অতএব, ইচ্ছা করিলেও নিতান্ত নিশ্চেষ্ট থাকা সম্ভাবিত নহে। মনোবৃত্তির চালনাতেই যে সুখানুভব হয়, ও তৎসমুদায় চালনা করা যে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের সম্পূর্ণ অভিপ্রেত, তাহার সংশয় নাই।

যদি আমরা জন্মকালে বুদ্ধিবৃত্তি-নিষ্পাদ্য সমুদায় জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইতাম, এবং আমাদিগের মনোবৃত্তি সমুদায় স্ব স্ব বিষয়ভোগে এককালেই চরিতার্থ হইয়া থাকিত, ও তাহাদিগকে আর চালনা করিবার প্রয়োজন ও সম্ভাবনা না থাকিত, তাহা হইলে এইক্ষণকার অপেক্ষা সুখের অল্পতা ভিন্ন কখনই আধিক্য হইত না। যদি একবার মাত্র ভোজন করিলেই চিরকাল উদর পরিপূর্ণ থাকিত, ও ক্ষুধার উদ্রেক আর না হইত, তবে প্রত্যহ ক্ষুৎপিপাসা শান্তি করিয়া যেরূপ সুখ সম্ভোগ করা যায়, তাহাতে এককালে বঞ্চিত থাকিতে হইত। ধনলাভ হইলেই ধনলোভী ব্যক্তির আহ্লাদ হয়, কিন্তু সে আহ্লাদ অতি অল্পকালস্থায়ী। হস্তগত ধনে তাহার তৃপ্তি হয় না, সুতরাং সে তৎক্ষণাৎ অধিক উপার্জ্জনার্থে ব্যগ্র হয়। যদিও লোকে তাহাকে অর্ব্বাচীন বোধ করে, কিন্তু সে ব্যক্তি স্বীয় স্বভাবেরই বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে। তাহার অর্জ্জনস্পৃহাবৃত্তির চালনাতেই সুখানুভব হয়, এবং কেবল ধনান্বেষণ ও ধনোপার্জ্জনদ্বারা সে বৃত্তি সব্যাপার থাকিতে পারে। অতএব যদি ঐ বৃত্তি একবারে অপর্য্যাপ্ত বিষয় লাভ করিয়া চিরকাল সুষুপ্তবৎ ব্যাপারশূন্য থাকিত, তাহা হইলে

মানববর্গ তদুৎপন্ন সুখভোগে কখনই অধিকারী হইত না। এইরূপ, আর আর মনোবৃত্তিও নিতান্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে এক্ষণে তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ চরিতার্থ করিয়া যে প্রচুর সুখ সম্ভোগ করা যাইতেছে, তাহা আর আমাদিগের ভাগ্যে ঘটিত না। এরূপ হইলে এককালে আমাদের মনশ্চেষ্টার অন্ত হইত, আমাদিগের প্রথম চেষ্টাই শেষ হইত, অত্যল্প কালেই সর্ব্ব বস্তু পুরাতন বোধ হইত। কিছুতে আর কৌতূহল থাকিত না, কিছুতেই উৎসাহ হইত না এবং কোন বিষয়ে আশাবৃত্তি সঞ্চরণ করিত না। এমন যে পরম রমণীয় বিচিত্র সংসার, তাহাও নিতান্ত নীরস বোধ হইত। অতএব, পরমেশ্বর যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট—তাহার উপর আর কথা নাই। যেরূপ মনোবৃত্তি সকল সৃজন করিয়াছেন, তাহাদিগকে তদুপযুক্ত বিষয়সমুদায়ও প্রদান করিয়াছেন। ঐ সকল বিষয়ের প্রয়োজন জানিয়া যথোচিত ব্যবহার করিলেই ইষ্টলাভ ও আনন্দসঞ্চার হয়, আর বিরুদ্ধাচরণ করিলে অনিষ্টঘটনা ও দুঃখোৎপত্তি হয়। পরমমঙ্গলালয় পরমেশ্বর, তাহাদের গুণাগুণ অনুসন্ধান করিবার ভার আমাদের উপর সমর্পণ করিয়া আমাদের মনোবৃত্তিসকলকে সদা সব্যাপার রাখিবার কি সুন্দর কৌশল করিয়াছেন।

সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের সুখের তারতম্য।

জ্ঞানের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! বিদ্যার কি মনোহর মূর্ত্তি!

বিদ্যাহীন মনুষ্য মনুষ্যই নহে। বিদ্যাহীন মনের গৌরব নাই। মানবজাতি পশুজাতি অপেক্ষায় যত উৎকৃষ্ট, জ্ঞানজনিত বিশুদ্ধ সুখ ইন্দ্রিয়জনিত সামান্য সুখ অপেক্ষায় তত উৎকৃষ্ট। পৌর্ণমাসীর সুধাময়ী শুক্লযামিনীর সহিত অমাবস্যার তামসী নিশার যেরূপ প্রভেদ, সুশিক্ষিত ব্যক্তির বিদ্যালোকসম্পন্ন সুচারু চিত্তপ্রাসাদের সহিত অশিক্ষিত ব্যক্তির অজ্ঞান-তিমিরাবৃত হৃদয়কুটীরের সেইরূপ প্রভেদ প্রতীয়মান হয়। অশিক্ষিত ব্যক্তি নিকৃষ্টসুখে ও নিকৃষ্ট কার্য্যে নিবৃত্ত থাকিয়া নিকৃষ্টসুখাধিকারী নিকৃষ্টজীবের মধ্যে গণনীয় হয়, সুশিক্ষিত ব্যক্তি জ্ঞানজনিত ও ধর্ম্মোৎপাদ্য পরিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগ করিয়া আপনাকে ভূলোক অপেক্ষায় উৎকৃষ্টতর ভুবনাধিবাসের উপযুক্ত করিতে থাকেন। এই উভয়ের মনের অবস্থা ও সুখের তারতম্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, উভয়কে একজাতীয় প্রাণী বলিয়া প্রত্যয় হওয়া সুকঠিন।

বিদ্যালোকসম্পন্ন সুশিক্ষিত ব্যক্তির অন্তঃকরণ অসঙ্খ্য বিষয়ের অসঙ্খ্য ভাবে নিরন্তর পরিপূর্ণ। যে সমস্ত অদ্ভুত বিষয় ও মনোহর ব্যাপার তাঁহার বোধনেত্রের গোচর থাকে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয়, তিনি নরলোকনিবাসী হইয়াও কোন চমৎকারময় সুচারু স্বর্গলোকে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার অন্তঃকরণে নিরন্তর যে সকল ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা অশিক্ষিত লোকের কদাচ অনুভূত হইবার বিষয় নহে। তিনি আপনার মানসনেত্রে এক কালে সমগ্র ভূমণ্ডল পর্য্যবলোকন

করিতে পারেন। মহার্ণবপরিবৃত স্থলভাগ, সমুদ্রস্থিত দ্বীপপুঞ্জ, চতুর্দ্দিগ্‌বাহিনী নদী ও উপনদী, স্থানে স্থানে নীরদধারিণী পর্ব্বতশ্রেণী কন্দর ও ভৃগুদেশ, শৃঙ্গ ও প্রস্রবণ, মহারণ্য ও মরুভূমি, জলপ্রপাত, উষ্ণপ্রস্রবণ, তুষারশৈল, তুষারদ্বীপ, গন্ধকদ্বীপ, প্রবালদ্বীপ ইত্যাদি ভূতলস্থ সমস্ত পদার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া পুলকিত হইতে পারেন। তিনি কল্পনাপথ অবলম্বন করিয়া অগ্নিময় আগ্নেয়গিরির শৃঙ্গদেশে আরোহণ করিতে পারেন, তৎসংক্রান্ত, ভূগর্ভবিনির্গত, গভীর গর্জন শ্রবণ করিতে পারেন, এবং তদীয় শিখরদেশ হইতে অগ্নিময়ীনদীস্বরূপ ধাতুনিস্রব নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক দগ্ধ করিতেছে দৃষ্টি করিতে পারেন। তিনি মানসপথে পর্য্যটনপূর্ব্বক হিমগিরিশিখরে উত্থিত হইয়া নতনয়নে নিরীক্ষণ করিতে পারেন, আপনার চরণতলে বিদ্যুল্লতা জ্বলিত হইতেছে, মেঘাবলি ধ্বনিত হইতেছে, জলপ্রপাত স্থরিত হইতেছে, এবং প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত উৎপন্ন হইয়া অরণ্য সমুদায় উৎপাটন করিতেছে ও সমুদ্রসলিলে করালতম কল্লোল কোলাহল উৎপাদন করিয়া ত্রাস ও সঙ্কট উপস্থিত করিতেছে। সর্ব্বকালের সমস্ত ঘটনাই তাঁহার অন্তঃকরণে জাগরূপ রহিয়াছে। তিনি মনে মনে কত রাজ্য ও রাজার সংহার দেখেন, কত বীর ও বিগ্রহের বিষয় বর্ণন করেন, এবং কত স্থানের কত প্রকার রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির পরিবর্ত্তন পর্য্যালোচনা করিয়া সুখী থাকেন। যে সময়ে তিনি মিত্রগণের সহিত সহবাস ও সদালাপ করেন, তখন জল, বায়ু, শীত, গ্রীষ্ম, গ্রাম, নগর,

আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, শাসন, বিদ্যা, ব্যবসায়, সুখ, সভ্যতা, পশু, পক্ষী, উদ্ভিদ, ধাতু প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া পুলকে পরিপূর্ণ হইতে থাকেন। যে সময়ে তিনি গ্রাম ও গহনে ভ্রমণ করেন, তখন বৃক্ষ লতা গুল্মাদির কেবল পরমাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন না, তাহাদের মূল, স্কন্ধ, শাখা, পত্র, পুষ্প, ফলাদির অভ্যন্তরে কীদৃশ কৌশল বিদ্যমান রহিয়াছে ও কতপ্রকার আশ্চর্য্য ক্রিয়াই বা নির্ব্বাহিত হইতেছে, উদ্ভিদের মধ্যে কোন্ কোন্ জাতি কি কারণে কোন্ শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইয়াছে, এবং কোন্ জাতি দ্বারা কিরূপ উপকারই বা উৎপন্ন হইতে পারে, তৎসমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া চমৎকার-সম্বলিত সুধামৃতরসে অভিষিক্ত হন, এবং প্রত্যেক বিষয় অনুশীলন করিবার সময়েই করুণাময় পরমেশ্বরের পরমাদ্ভুত কৌশল প্রতীতি করিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মনের সহিত ধন্যবাদ করেন। যে তিমিরাচ্ছন্ন নিশীথসময়ে অজ্ঞ লোকেরা অশেষবিধ বিভীষিকা ভাবনা করিয়া ভীত হইতে থাকে, সে সময় তিনি নিভৃত স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক গগনমণ্ডলে নয়নদ্বয় নিয়োজন করিয়া অসীম বিশ্বব্যাপারের অনুশীলনে অনুরক্ত হইতে পারেন। আমরা যে প্রকাণ্ড ভূপিণ্ডের উপর অধিষ্ঠিত রহিয়াছি, তাহা গিরি, কানন, পশু, পক্ষী, মেঘ ও বায়ু সম্বলিত অপরিসীম আকাশমার্গে প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণায়মান হইতেছে, ইহা চিন্তা করিয়া অন্তঃকরণ বিকসিত করিতে পারেন। তিনি বাসনাবশে চন্দ্রমণ্ডলে উপনীত হইয়া উচ্চ পর্ব্বত, গভীর গহ্বর, উন্নত

শিখর, গিরিচ্ছায়া, বন্ধুর ভূমি ইত্যাদি অবলোকন করিতে পারেন। ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদিগে উত্থিত হইয়া চন্দ্রচতুষ্টয়পরিবৃত বৃহস্পতি, বৃহত্তর, চন্দ্রাষ্টক ও বিশাল অঙ্গুরীয়ত্রয় পরিবেষ্টিত শনৈশ্চর, ষট্‌চন্দ্রসহকৃত হর্ষেল গ্রহ, এবং চন্দ্রদ্বয়সম্বলিত নেপচ্যুন নামক অপূর্ব্ব ভুবন দর্শন করিয়া পরম পুলকিতচিত্তে বিচরণ করিতে পারেন। পরে গ্রহমণ্ডলীপরিবেষ্টিত প্রচণ্ড সূর্য্যমণ্ডল পশ্চাদ্ভাগে পরিত্যাগপূর্ব্বক, সহস্র সহস্র ও কোটি কোটি নক্ষত্রলোক অবলোকন করত, অশৃঙ্খলবদ্ধ ও অক্লিষ্টপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায়, অসীম আকাশমণ্ডল পর্য্যটন করিতে পারেন। গগনমণ্ডলের যাবতীয় ভাগ দূরবীক্ষণ সহকারে মানবজাতির নেত্রগোচর হইয়াছে, তদূর্দ্ধ সমস্ত নভঃপ্রদেশ সম্ভ্যাতিরিক্ত পরমাদ্ভুত জীবলোকে পরিপূর্ণ বলিয়া প্রতীতি করিতে পারেন, এবং অপার মহিমার্ণব মহেশ্বরের অখণ্ড রাজত্ব সর্ব্বত্র প্রচারিত দেখিয়া ভক্তিরসাভিষিক্ত পুলকিত হৃদয়ে অর্চ্চনা করিতে পারেন।

আর্য্যদিগের ভারতবর্ষে আগমন।

আর্য্যেরা কি শুভদিনে ও কি শুভক্ষণেই সিন্ধু নদের পূর্ব্ব পারে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয়েরা উত্তর কালে যে অত্যুন্নত অতিদুর্লভ গৌরবপদে অধিরোহণ করেন, ঐ দিনেই তাহা অনুসূচিত হয়। যে উজ্জয়িনীজনিতা কবিতাবল্লীর মধুময় কুসুম বিকসিত হইয়া দিগন্তপর্য্যন্ত আন্দোলিত রাখি-

য়াছে, তদীয় বীজ ঐ দিনেই ভারতভূমিতে সমাহৃত হয়। যে পরমার্থবিমিশ্রিত বিদ্যাবলী জলদানুবিদ্ধ পৌর্ণমাসী রজনীর ন্যায় মানবীয় মনের একটী অপরূপ রূপ প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহারও নিদান ঐ দিনেই ভারতবর্ষমধ্যে সমানীত হয়। যে ইন্দ্রজালবৎ অদ্ভুত বিদ্যা অবলীলাক্রমে দ্যুলোকের সংবাদ ভূলোকে আনয়ন করিয়া সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদির ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ত্রিকালের ইতিহাস এক কালেই বর্ণন করিতেছে, এবং জাহ্নবীজলপবিত্র পাটলিপুত্র ও শিপ্রাসলিল-সুস্নিগ্ধ অবন্তিকায় অতিবিস্তৃত রশ্মিজাল বিকীর্ণ করিয়া অবনী-মণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে, তাহার আদিম সূত্র ঐ দিনেই ভারতরাজ্যে পাতিত হয়। আরোগ্যরূপ অমূল্যরত্নের আকর-স্বরূপ যে আয়ুঃপ্রদ শুভকর শাস্ত্র আবহমান কাল স্বদেশীয় ও ভিন্নদেশীয় অসংখ্য লোকের রোগজীর্ণ বিবর্ণ মুখমণ্ডলকে স্বাস্থ্যগুণে প্রসন্ন ও প্রফুল্ল করিয়া তুলিয়াছে, এবং কোটি কোটি জনের উৎপৎস্যমান শোকসন্তাপ ও পতনোন্মুখ বৈধব্যবিপদের একান্ত প্রতিবিধান করিয়া আসিয়াছে, ও অদ্যাপি যে অমৃতময় শাস্ত্রকে ঔষধবিশেষের শক্তিযোগে কখন কখন প্রভাববতী ইউরোপীয় চিকিৎসাকেও অতিক্রম করিতে দেখা যায়, তাহারও মূল ঐ দিনেই ভারতক্ষেত্রে সংরোপিত হয়। যে শৌর্য্য, বীর্য্য, ও পরাক্রম প্রভাবে ভারতবর্ষীয় আদিমনিবাসী যাবতীয় জাতি বিজিত হইয়া গহন ও গিরি-গুহায় আশ্রয় লইয়াছে, এবং সে দিনেও যে শৌর্য্যাগ্নির একটী স্ফুলিঙ্গ সুরশেখর শিখ-

জাতির হৃদয়-চুল্লী হইতে উত্থিত হইয়া অত্যদ্ভুত অনল-ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে, ঐ দিনেই তাহা এই আর্য্যভূমিতে অবতারিত হয়। মহাবলপরাক্রান্ত বীর্য্যবন্ত পূর্ব্বপুরুষেরা এক হস্তে হলযন্ত্র ও অপর হস্তে রণশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক পুত্রকলত্র দৌহিত্রাদির অগ্রণী হইয়া, উৎসাহিত ও অশঙ্কিতমনে, স্নেহ-পালিত গোধন সঙ্গে, ভারতবর্ষ প্রবেশ করিতেছেন ইহা স্মরণ ও চিন্তন করা কি অপরিসীম আনন্দেরই বিষয়! ইচ্ছা হয়, তাঁহাদের আগমনপদবীতে আম্রশাখাসম্বলিত সলিলপূর্ণ কলসাবলী সংস্থাপন করিয়া রাখি, এবং সমুচিত মঙ্গলাচরণ সমাধানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রীতিপ্রফুল্ল হৃদয়ে প্রত্যুদ্গমন করিয়া আনি, ও সেই পূজ্যপাদ পিতৃপুরুষদিগের পদাম্বুজ-রজঃ গ্রহণ করিয়া কলেবর পবিত্র করিতে থাকি।—আহা! আমি কি অসম্বদ্ধ অলীকবৎ প্রলাপবাক্য বলিতেছি! তখন আমাদের অস্তিত্ব কোথায়! আমরা তখন অনাগত কালগর্ভে নিহিত ছিলাম!—এই সমস্ত স্বপ্নকল্পিত বাসনার এই স্থলেই অবসান হওয়া ভাল! পাঠকগণ! এখন প্রকৃতপ্রস্তাবের অনুসরণ কর।

প্রাচীন আর্য্যদিগের পৌত্তলিকতার কারণ।

মনুষ্যেরা যেরূপ জল, বায়ু, মৃত্তিকাদি নৈসর্গিক বস্তুতে পরিবেষ্টিত থাকেন, তাঁহাদের আচার ব্যবহার ধর্ম্মাদি বিষয়ে

তাহার সম্পূর্ণ কার্য্যকারিত্ব অবলোকিত হয়। তুষারমণ্ডিত হিমালয়, গিরিনিঃসৃত নির্ঝর, আবর্ত্তময়ী বেগবতী নদী, চিত্ত-চমৎকারক ভয়ানক জলপ্রপাত, অযত্নসম্ভূত উষ্ণপ্রস্রবণ, দিগ্‌-দাহকারী দাবদাহ, বসুমতীর তেজঃপ্রকাশিনী সুচঞ্চলশিখা-নিঃসারিণী লোলায়মানা জ্বালামুখী, বিংশতি সহস্র জনের সন্তাপ-নাশক বিস্তৃতশাখাপ্রসারক বিশাল বটবৃক্ষ, শ্বাপদনাদে নিনাদিত বিবিধ-বিভীষিকাসংযুক্ত জনশূন্য মহারণ্য, পর্ব্বতাকারতরঙ্গ-বিশিষ্ট প্রসারিত সমুদ্র, প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, ঘোরতর শিলাবৃষ্টি, জীবিতাশাসংহারক হৃৎকম্পকারক বজ্রধ্বনি, প্রলয়শঙ্কা-সমুদ্ভাবক ভীতিজনক ভূমিকম্প, প্রখররশ্মিপ্রদীপ্ত নিদাঘমধ্যাহ্ন, মনঃ-প্রফুল্লকরী সুধাময়ী শারদীয় পূর্ণিমা, অসংখ্য তারকমণ্ডিত তিমিরাবৃত বিস্তৃত গগনমণ্ডল ইত্যাদি ভারতভূমিসম্বন্ধীয় নৈসর্গিক বস্তু ও নৈসর্গিক ব্যাপার অচিরাগত কৌতূহলাক্রান্ত হিন্দু-জাতীয়দিগের অন্তঃকরণ এরূপ ভীত চমৎকৃত ও অভিভূত করিয়া ফেলিল যে, তাঁহারা প্রভাবশালী প্রাকৃত পদার্থসমুদয়কে চেতন দেবতা জ্ঞান করিয়া সর্ব্বাপেক্ষায় তদীয় উপাসনাতেই প্রবৃত্ত থাকিলেন। তাঁহারা তখন ঐ সমুদয় বস্তুর প্রকৃত স্বভাব ও গুণ কিছুই পরিজ্ঞাত ছিলেন না। সাক্ষাৎসম্বন্ধে কেবল আপনাদের অর্থাৎ মানবজাতির প্রকৃতিই বুঝিতেন, এবং তদ্দৃষ্টে ঐ সমস্ত জড় বস্তুরও মনুষ্যাদির ন্যায় হস্তপদাদি অবয়ব এবং ক্ষুৎ-পিপাসা ও কামক্রোধাদি মনোবৃত্তি বিদ্যমান আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। মনুষ্যেরা কোন্ আদিম কালাবধি

আপনাদের উপাস্য দেবতাকে ঐরূপ মানবধর্ম্মাক্রান্ত জ্ঞান করিয়া আসিতেছেন, অদ্যাবধি ঐরূপ করিতেছেন, এবং হয়ত চিরকালই ঐরূপ করিতে থাকিবেন। যে সমস্ত জ্ঞানাভিমানী ইদানীন্তন ব্যক্তিরা এখনও অপরিজ্ঞাত বিশ্বকারণের কাম-ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অস্তিত্ব আর স্বীকার করেন না, তাঁহারাও মানবমনের স্নেহ, মায়া, ক্ষমা প্রণয়াদি কতকগুলি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম অনন্তগণিত করিয়া ঈশ্বর-স্বরূপে সমারোপণ করেন। এইরূপ মানবত্বসমারোপণ রীতি তাঁহাদের এমন অস্থিগত হইয়া গিয়াছে যে, বিচারধারে বিখণ্ডিত হইয়া গেলেও, তাঁহারা উহার বিমোহিনী মায়া পরিত্যাগ করিতে পারেন না। প্রাচীন আর্য্যেরা এই রীতির অনুবর্ত্তী হইয়া বিশ্বাস করিতেন যে, লিখিত-পূর্ব্ব দেবতাগণ নরজাতির ন্যায় ইচ্ছানুগত হইয়া ইতস্ততঃ গমনাগমন করেন, ক্ষুৎপিপাসার বশবর্ত্তী হইয়া অন্ন জল গ্রহণ করেন, ক্রোধ হিংসার পরবশ হইয়া শত্রুদল সংহার করেন, দার-পরিগ্রহপুরঃসর গৃহধর্ম্ম পরিপালন করেন, এবং এই বিশ্ব-ব্যাপার অখণ্ডনীয় ও অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের অনুবর্ত্তী থাকিলেও, তাঁহারা দয়া দাক্ষিণ্যের অনুসারী হইয়া ভক্তজনের মনোরথ পূর্ণ করেন।

বিদ্যাবিষয়ক, স্বপ্নদর্শন।

পরমেশ্বরের বিচিত্র রচনা দর্শনার্থে পরম কৌতূহলী হইয়া আমি কিয়ৎকালাবধি দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এবং নানা স্থান

পর্য্যটন করিয়া এক্ষণে মথুরাসন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছি। এখানে এক দিবস দুঃসহ গ্রীষ্মাতিশয় প্রযুক্ত অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া সায়ংকালে যমুনাতীরে উপবেশন পূর্ব্বক কালিন্দীর সুললিত লহরীলীলা অবলোকন করিতেছিলাম; এবং তথাকার সুস্নিগ্ধ মারুত-হিল্লোলে শরীর শীতল হইতেছিল। কত শত দীপ্যমান হীরকখণ্ড গগনমণ্ডলে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল, এবং তন্মধ্যে দিব্যলাবণ্যশোভিত পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান হইয়া, কখনও আপনার পরম রমণীয় অনির্ব্বচনীয় সুধাময় কিরণ বর্ষণ পূর্ব্বক জগৎ সুধাপূর্ণ করিতেছিলেন, কখনও বা অল্প অল্প মেঘাবৃত হইয়া স্বকীয় মন্দীভূত কিরণ বিস্তার দ্বারা পৌর্ণমাসী রজনীকে উষানুরূপ ম্লান করিতেছিলেন। কখনও তাঁহার সুপ্রকাশিত রশ্মি-জাল সলিলতরঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া কম্পমান হইতেছিল, কখনও বা গগনালম্বিত মেঘবিম্বদ্বারা যমুনার নির্ম্মল জল ঘনতরশ্যামবর্ণ হইয়া অন্তঃকরণ হরণ করিতেছিল। পূর্ব্বে দূর হইতে লোকালয়ের কলরব শ্রুত হইতেছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল, পশুপক্ষিসকল নীরব ও নিস্পন্দ হইয়া স্ব স্ব স্থানে নিলীন হইল, এবং সর্ব্বসন্তাপনাশিনী নিদ্রা জীবগণের নেত্রোপরি আবির্ভূত হইয়া সকল ক্লেশ শান্তি করিতে লাগিলেন।

এই প্রকার সুস্নিগ্ধ সময়ে আমি তথায় এক পাষাণখণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া আকাশমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতে জগতের আদি অন্ত, কার্য্য কারণ, সুখ দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম সমুদায় মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে জলকল্লোলের কখাকল

ধ্বনি, বৃক্ষপত্রের শর শর শব্দ ও সুশীতল সমীরণের সুমন্দ হিল্লোল দ্বারা পরম সুখানুভব হওয়াতে মনোবৃত্তি সমুদায় ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিল, এবং এই অবসরে নিদ্রা আমার অজ্ঞাতসারে নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া আমাকে অভিভূত করিলেক। আমার বোধ হইল, যেন, এক বিস্তীর্ণ গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি। তন্মধ্যে কোন স্থানে কেবল নবীনদূর্ব্বাদলপূর্ণ শ্যামবর্ণ ক্ষেত্র, কুত্রাপি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুরাতন বৃক্ষসমূহ, কোথাও নদী বা নির্ঝরতীরস্থ মনোহর পুষ্পোদ্যান দর্শন করিয়া অপর্য্যাপ্ত আনন্দ লাভ করিলাম। কৌতূহলরূপ দীপ্ত হুতাশন ক্রমশঃ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল, এবং তদনুসারে দিগ্বিদিক বিবেচনা না করিয়া যত দূর দৃষ্টি হইল, তত দূরই মহোৎসাহে ও পরম সুখে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম।

অবশেষে এক সরোবরতীরস্থ অতি নিবিড়, নির্জ্জন, নিস্তব্ধ বনখণ্ডে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলাম। তাঁহার সুপ্রকাশিত প্রসন্ন বদন ও অলৌকিক অনির্ব্বচনীয় শান্ত স্বভাব অবলোকনে তাঁহাকে বনদেবতা জ্ঞান করিয়া বিহিত বিধানে নমস্কার করিলাম, ও তাঁহার পুনঃ পুনঃ দর্শনলাভ দ্বারা নয়নযুগল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিলাম। দেখিলাম, তিনি আপনার কপোলপ্রদেশে হস্তার্পণ করিয়া গগনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন। আমি তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসিবার মানস করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার বাক্য স্ফুরণ হইতে না হইতেই তিনি গাত্রোত্থান করিয়া সাতিশয় সুশীলতা

ও আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন "আমি তোমার মানস জানিয়াছি, আমার নাম বিদ্যা, তুমি যে স্থানে যাইবার প্রার্থনা করিতেছিলে, তাহার এই পথই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। যাঁহারা এই রম্য কানন ভ্রমণ করিতে আইসেন, আমিই তাঁহাদিগকে পথ প্রদর্শন করি ; চল, তোমাকেও সঙ্গে লইয়া যাই।"

আমি তাঁহার এই আশ্বাসবাক্যে বিশ্বাস করিয়া হৃষ্টমনে তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম। উভয় পার্শ্ববর্ত্তি-বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যদেশ দিয়া কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে অরণ্যের শৈত্য, শোভা, ও পবিত্রতা প্রত্যক্ষ করিয়া অতুল আনন্দ প্রাপ্ত হইলাম, এবং অত্যন্ত কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হে দেবি, এস্থানের নাম কি, এবং এখানে কি কি অপূর্ব্ব ব্যাপারই বা সম্পন্ন হইয়া থাকে ?" তাহাতে তিনি সত্বর হইয়া উত্তর করিলেন "এ বিদ্যারণ্য, এ অরণ্যে অতি সুন্দর বৃক্ষ আছে, অতি ভাগ্যবান্ ব্যক্তিরাই এখানে আগমন করেন; কিন্তু ইহার ফলভোগ করা অতিশয় আয়াস-সাধ্য, সকলের ভাগ্যে ঘটে না। কেহ কেহ দূর হইতে কোন কোন বৃক্ষের উচ্চতা দর্শনমাত্রে পরাঙ্মুখ হইয়া প্রতিগমন করেন, কেহ কেহ বা ফল আহরণের প্রত্যাশায় কতকদূর বৃক্ষারূঢ় হইয়াও পুনর্ব্বার অধঃপতিত হন। কিন্তু যে ব্যক্তি একবার এই রমণীয় কাননের ফলভোগ করিয়াছেন, তিনি আর কদাপি তাহার আস্বাদন বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।" আমি তোমাকে ক্রমে ক্রমে সমুদায় দর্শাইতেছি, চল। ঐ যে সুদৃশ্য মনোহর বৃক্ষ

সম্মুখে দৃষ্টি করিতেছ, যাহার সতেজ শাখা-সমুদায় সুমধুর রস-স্ফীত ফলভরে অবনত হইয়াছে, যাহার স্কন্ধ হইতে সুধাময় মধু-ধারা অনবরতই ক্ষরিতেছে, ও সুকুমারমতি তরুণ যুবকেরা যাহাতে সুখে আরোহণ করিতেছে, উহার নাম কাব্যতরু। দেখিয়াছ, অলঙ্কৃতিরূপা কি অপূর্ব্ব অত্যাশ্চার্য্য রমণীয় লতা তাহাকে বেষ্টনপূর্ব্বক সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে, ঐ বৃক্ষের কিঞ্চিৎ দূরে যে প্রকাণ্ড তেজস্বী বৃক্ষ দেখিতেছ, সুধীর প্রবীণ ব্যক্তিরা যাহার সেবা করিতেছেন, তাহার নাম জ্যোতিষ।” ইহা কহিয়া বিদ্যাদেবী ঐ বৃক্ষের অশেষ গুণ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার বাক্যাবসান হইলে, আমি জ্যোতিষ তরুর নিকট-বর্ত্তী হইয়া দেখিলাম, পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতসমুদায় একএকবার প্রগাঢ়রূপ মনোনিবেশ পূর্ব্বক ধ্যানপরায়ণ হইতেছেন, এবং মধ্যে মধ্যে সহাস্যবদনে অতুল আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। পরন্তু আর এক অসাধারণ ব্যাপার দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম। ঐ বৃক্ষের মূল মৃত্তিকাসংযুক্ত নহে, আর এক প্রকাণ্ড প্রাচীন বৃক্ষের স্কন্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমি এই শেষোক্ত তরুর ন্যায় সারবান বৃক্ষ আর একটীও দৃষ্টি করি নাই। তাহার কোন স্থানের লেশমাত্র ক্ষয় হয় নাই, ও কুত্রাপি একটীমাত্রও ছিদ্র কিম্বা চিহ্ন নাই। আমি ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য পরম কৌতূহলী হইয়া বিদ্যাদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন, “এই সারবান অক্ষয়

বৃক্ষের নাম গণিত। তুমি কেবল সম্মুখবর্ত্তী জ্যোতিষ বৃক্ষের মূল ইহাতে সম্বদ্ধ দেখিতেছ; প্রদক্ষিণ করিয়া দেখ, অন্যান্য কত কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বৃক্ষ ও লতা ইহার স্কন্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়া তদুপরি স্থাপিত আছে।" বস্তুতঃ আমি বেষ্টন করিয়া দেখিলাম, তাঁহার কথা প্রামাণিক বটে; শাখা প্রশাখা ও বৃক্ষরুহসম্বলিত এক গণিতবৃক্ষই অর্দ্ধ কানন ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

তথা হইতে প্রস্থানানন্তর আমার সমভিব্যাহারিণী পথপ্রদর্শিকা বনদেবী সানুগ্রহবচনে বলিলেন, "সর্ব্বদেশীয় বৃক্ষ লতাদি আনয়ন করিয়া এ কাননে রোপণ করা গিয়াছে। জ্যোতিষ ও গণিতের কয়েকটা কলম তোমাদিগের দেশ হইতেও আহরণ করা গিয়াছে। দেখ, ভিন্নজাতীয় লোকে এই কাননে অবস্থিতি করিয়া উৎসাহ ও যত্নপূর্ব্বক তাহার কেমন পারিপাট্য ও উন্নতি করিয়াছে! আর তোমার স্বদেশীয় লোকদিগকে ধিক্কার করিতে হয়, কারণ যতগুলি বৃক্ষ রক্ষণাবেক্ষণের ভার কেবল তাঁহাদিগের উপর সমর্পিত আছে, প্রায় তাহার সমুদায়ই ভগ্ন ও শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। দক্ষিণ দিকে যত বৃক্ষ দেখিতেছ, সমস্তই একজাতীয়, তাহার নাম স্মৃতি, আর বামদিকে যত দৃষ্ট হইতেছে, তাহার নাম দর্শন।" আমি এই দুই জাতীয় বৃক্ষ অবলোকন করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইলাম। দেখিলাম, দক্ষিণদিকের সমুদায় বৃক্ষ অদ্যাপি সম্যক্‌রূপে নষ্ট হয় নাই, কতকগুলি শুষ্ক ও ভগ্নশাখ হইয়াছে, কিছুই পারিপাট্য নাই,

বোধ হইল যেন প্রবল ঝঞ্ঝাবাত দ্বারা সমুদায় বিপ্লুত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। বামদিকের কোন বৃক্ষের কেবল স্কন্ধ মাত্র আছে, কোনটার বা সমুদায় গিয়া একটীকের একমাত্র শাখা আছে, তদ্ভিন্ন কোন কোন বৃক্ষের স্কন্ধমাত্রও দৃষ্টিগোচর হইল না। এই দুঃসহ দুঃখের সময়ে এক পরম কৌতুক দেখিলাম, কতকগুলি অভিমানী মনুষ্য উভয়পার্শ্বস্থ বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া অত্যন্ত দম্ভ ও ব্যাপকতা সহকারে মহাকোলাহল ও বিষম কলহ আরম্ভ করিয়াছে।

এইরূপ শারীরস্থান, রসায়ন, চিকিৎসা প্রভৃতি অতি অনির্বচনীয় পরম রমণীয় তরুসমূহ দর্শন করিয়া সাতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইলাম, এবং অতি শ্রদ্ধাবিষ্ট হইয়া পথিমধ্যে পরমারাধ্যা বিদ্যা দেবীকে কহিলাম, "দেবি! আমি আপনার প্রসাদে অদ্য অনুপম সুখ লাভ করিলাম। ভূমণ্ডলে এমত নির্ম্মল সুখধাম আর কোথাও নাই; আমার বোধ হয়, এস্থানে অতি শান্ত সচ্চরিত্র ব্যক্তিরাই আগমন করেন, অপর লোকের এখানে আসিবার অধিকার নাই।" এই কথা শ্রবণমাত্র তিনি বিষণ্ণবদনে কহিলেন, 'তুমি যথার্থ বিবেচনা করিয়াছ, এস্থান ধর্ম্মশীল সাধু ব্যক্তিদিগেরই যোগ্য বটে, এবং পূর্ব্বে ইহা তাদৃশই ছিল। তখন কেবল পরোপকারী, তত্ত্বপরায়ণ, শুদ্ধাত্মা আচার্য্য সকলই এই পরম পবিত্র কাননে উপদেশ করিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু ইদানীং এ বনে নানা বিভীষিকা উপস্থিত হইয়াছে; পাষণ্ডরূপ পিশাচের উপদ্রবে ইহা অতি সঙ্কট

স্থান হইয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখ, বিজাতীয়বেশধারী অভিমান মস্তক উন্নত ও গ্রীবাদেশ বক্র করিয়া অত্যন্ত উগ্রভাবে সকলের উপর খরতর দৃষ্টিপাত করিতেছে, ও স্বকীয় পুত্র দম্ভকে সম্মুভিব্যাবহারে লইয়া মহা শ্লাঘা প্রকাশ পূর্ব্বক সগর্ব্ব পাদবিক্ষেপ করিতেছে। উহাদের অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া কি তোমার বোধ হইতেছে না, যে,উহারা মনে মনে বিশ্বসংসার তুচ্ছ ভাবিতেছে? তৎপার্শ্বে দৃষ্টি কর, ক্রোধ নিজকান্তা হিংসাকে সঙ্গে লইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। উনি অভিমানের অত্যন্ত অনুগত। যদি কোন ব্যক্তি অভিমানের গাত্রমাত্র স্পর্শ করে, ক্রোধ তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া তাহার বৈরনির্যাতন করিতে উদ্যত হয়। এ দিকে অবলোকন কর, একটা প্রকাণ্ড রাক্ষস দেখিতে দেখিতে আপনার শরীর বৃদ্ধি করিয়া ফেলিলেক। এক্ষণে, ও যে প্রকার স্থূলকায় হইয়া উঠিল, আমার বোধ হইতেছে বিশ্বসংসার ভোজন করিলেও উহার উদর পূর্ণ হয় না। উহার নাম কি জান? লোভ। বিশেষতঃ কাঞ্চনতরুতলে যে দুই প্রচণ্ড পিশাচ দণ্ডায়মান দেখিতেছ, উহাদের অত্যাচারে এস্থানের অতিশয় অপযশ ঘোষণা হইয়াছে; উহাদের নাম কাম ও পানদোষ। এককালে এই অপূর্ব্ব আনন্দকাননে নিষ্কলঙ্ক দম্পতীপ্রেমেরও প্রাদুর্ভাব ছিল। তৎকালে অনেকানেক প্রধান ধর্ম্ম তাঁহার সহচর ছিল, কোন দুষ্ক্রিয়া এস্থানে প্রবেশ করিতেও সমর্থ হইত না। এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। দাম্পত্যপ্রেম ও তাঁহার সহচরদিগের দৈন্যদশা উপস্থিত হইয়া

পরানুরাগী কামরূপ পিশাচেরই আধিপত্য বৃদ্ধি হইতেছে। অবলোকন কর, পানদোষ আপনার দলবল সহকারে কি অহিত আচরণ করিতেছে! কি বীভৎস বেশ ধারণ করিয়াছে! দেখ দেখ, তাহার ভয়ে ধর্ম্ম সকল ইতস্তত: পলায়ন করিতেছে। পশ্চাৎ হইতে আর কতকগুলি দুর্দ্দান্ত পিশাচ পিশাচী আসিয়া তাহার সহিত বিকট হাস্য করিয়া নৃত্য করিতেছে। হে প্রিয়তম! এমন পরিশুদ্ধ পুণ্যধামের এ প্রকার অবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যাহারা এই সমস্ত রাক্ষস পিশাচকে আশ্রয় দেয়, তাহারা তদ্দ্বারা আমাকেই প্রহার করে। আমি এ অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী হইয়া স্বয়ং এরূপ ভূরি ভূরি অপ্রিয় ব্যাপার আর কত দেখাইব? ঐ ঘন পল্লবাবৃত নিবিড় বৃক্ষের অন্তরালে যে এক পরমসুন্দরী রমণীকে দৃষ্টি করিতেছ, উহার পর কুৎসিত স্ত্রী আর দ্বিতীয় নাই। উহার গাত্রে যে কত ব্রণ, কত ক্ষত, ও কত কলঙ্ক আছে, তাহার সঙ্খ্যা করা যায় না। কেবল কতকগুলি বেশ ভূষা কল্পনা দ্বারা তৎসমুদায় প্রচ্ছন্ন রাখিয়া আপনাকে সজ্জীভূত করিয়া দেখাইতেছে; উহার নাম কপটতা।”

সমুদায় শ্রবণ ও দর্শন করিয়া আমি বিষাদসমুদ্রে নিমগ্ন হইলাম, এবং মনে মনে চিন্তা করিলাম, এ অসার সংসার স্বভাবতঃ শোক দুঃখেতেই পরিপূর্ণ; যদিও দুই একটী সুখধাম ছিল, তাহাতেও এত বিঘ্ন ঘটিয়াছে! যাহা হউক, আপনার কর্ত্তব্যসাধনে পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নহে, এই বিবেচনা করিয়া সর্ব্ব-দুঃখনিবারিণী সন্তাপনাশিনী বিদ্যাদেবীর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া

গমন করিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর গমনানন্তর একবার পশ্চাৎ পবলোকন করিয়া দেখি, যে সকল রাক্ষস পিশাচের অহিত আচার দৃষ্টি করিয়া আসিলাম, তাহারাই আমার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। বিশেষতঃ কাম ও পানদোষ এই দুই জন নানাবিধ সুমধুর প্ররোচন বাক্য বলিয়া আমাকে তৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পূর্ব্বে যাহাদিগের অতি কুৎসিত বীভৎস আকার দর্শন করিয়াছিলাম, তখন দেখি, তাহারা পরম মনোহর রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছে। কি জানি তাহারা কি কুমন্ত্রণা দেয়, এই আশঙ্কায় পরম হিতৈষিণী বিদ্যাদেবীর পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিলাম। তৎক্ষণাৎ তিনি আমাকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা নামে দুই মহাবল পরাক্রান্ত প্রহরীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "তোমরা দুই জনে ইহাঁর দুই পার্শ্বে থাক, কোন শত্রু যেন ইহাঁর নিকটস্থ হইতে না পারে।"

এইরূপে আমরা বন প্রান্তে উপস্থিত হইয়া সম্মুখে এক ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখিতে পাইলাম। তখন বিদ্যা অতি প্রসন্নবদনে সুমধুর হাস্য করিয়া কহিলেন, "এই ক্ষুদ্র প্রান্তরের শেষে যে মনোহর গিরি দর্শন করিতেছ, ঐ তোমার লক্ষিত স্থান, ঐ স্থান প্রাপ্ত হইলেই তুমি চরিতার্থ হইবে।" এই কথা শুনিয়া আমি পরম পুলকিতচিত্তে অরণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চিরাকাঙ্ক্ষিত ফল প্রত্যাশায় মহোৎসাহ সহকারে দ্রুতবেগে পদ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলাম, এবং অবিলম্বে পর্ব্বত-সন্নিধানে উপ-

স্থিত হইয়া তথায় আরোহণ করিবার এক পথ প্রাপ্ত হইলাম। ঐ পথের এক পার্শ্বে এক দৃঢ়ব্রতা সুশীলা স্ত্রী এবং অন্য পার্শ্বে এক বহুপরিশ্রমী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরুষ দণ্ডায়মান আছেন, তাঁহারা যাত্রীদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া পর্ব্বতোপরি লইয়া যাইতে-ছেন। তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম, স্ত্রীর নাম শ্রদ্ধা, পুরুষের নাম যত্ন।

ঐ পর্ব্বত আরোহণ করা অতিশয় ক্লেশকর বোধ হইল। অতিকষ্টে কিয়দ্দূর গমন করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলাম, সংপ্রতি এই স্থানেই অবস্থিতি করি। বিদ্যাদেবী স্বকীয় মহী-য়সী শক্তি দ্বারা তাহা জানিতে পারিয়া কহিলেন, "হে প্রিয়তম! এ পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে কোন স্থানে স্থির থাকিবার সম্ভাবনা নাই, যদি আর উপরে না উঠ, তবে অবশ্যই অধোগমন করিতে হইবে, অতএব সাবধান, সাবধান।" আমি তাঁহার এই সদু-পদেশ শুনিয়া চৈতন্য প্রাপ্ত হইলাম। পরন্তু সুখের বিষয় এই যে যত আরোহণ করিতে লাগিলাম, ততই ক্লেশের লাঘব হইয়া সুখের বৃদ্ধি হইয়া আসিল।

অবশেষে যখন পর্ব্বতোপরি উত্তীর্ণ হইলাম, তখন কি অনি-র্ব্বচনীয় অনুপম সুখানুভব হইল! তথাকার সুশীতল মারুত-হিল্লোলে শরীর পুলকিত হইতে লাগিল। তথায় দ্বেষ, হিংসা বিবাদ, বিসম্বাদ, চৌর্য্য, অত্যাচার এ সকলের কিছুই নাই, কেবল আরোগ্য ও আনন্দ অবিরত বিরাজ করিতেছে। ইহা দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইল,

এবং বোধ হইল বিশ্বসংসারে এমন রম্যস্থান আর দ্বিতীয় নাই। কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ ভ্রমণানন্তর দূর হইতে এক অপূর্ব্ব সরোবর দেখিতে পাইলাম, এবং তদ্দর্শনার্থে আমার অত্যন্ত কৌতূহল উপস্থিত হইল। পরে ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া দৃষ্টি করিলাম, কতকগুলি পরম পবিত্র সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী কন্যা সরোবরতটে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহাদিগের অসাধারণ রূপলাবণ্য, প্রফুল্ল পবিত্র মুখশ্রী, এবং সারল্য ও বাৎসল্য স্বভাব অবলোকন করিয়া অতুল প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম। আশ্চর্য্য এই যে, তাঁহাদিগের শরীরে কোন অলঙ্কার নাই, অথচ অনলঙ্কারই তাঁহাদের অলঙ্কার হইয়াছে। এরূপ বোধ হইল, যেন আনন্দ-প্রতিমাগুলি ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিয়া গমনাগমন করিতেছে। আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলাম, ইহাঁরা দেবকন্যা হইবেন তাহার সংশয় নাই। তখন বিদ্যা-দেবী সাতিশয় অনুকম্পা পুরঃসর সহাস্য বদনে কহিলেন, "তুমি যথার্থ অনুমান করিয়াছ, ইহাঁরা দেবকন্যাই বটেন, এবং এই ধর্ম্মাচল ইহাঁদের বাসভূমি, ইহাঁদের কাহারও নাম দয়া, কাহারও নাম ভক্তি, কাহারও নাম ক্ষমা, কাহারও নাম অহিংসা, কাহারও নাম মৈত্রী ইত্যাদি সকলের নিজ নিজ গুণানুসারে নামকরণ হইয়াছে। ইহাঁদের রূপগুণ ভুবনবিখ্যাত আছে; ইহাঁরা যে পর্য্যন্ত সুশীল তাহা কি বলিব। বিদ্যারণ্য-যাত্রীদিগের মধ্যে যাঁহারা এই ধর্ম্মাচল আরোহণ করেন, তাঁহা-দিগেরই শ্রম সফল ও জন্ম সার্থক। তোমার চায় কিঞ্চিৎ

স্থান সমাধিকুঞ্জ প্রাপ্তির এখনও বিলম্ব আছে, অতএব এই সরোবরে স্নান করিয়া লও।”

বিদ্যাদেবীর উপদেশানুসারে আমি শান্তিবাপীতে অবগাহন করিয়া যেরূপ স্নিগ্ধ ও পবিত্র হইলাম, তাহা বচনাতীত, দেবকন্যাগণও আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বিস্তর অনুরাগ প্রকাশ করিলেন। আহা তাঁহাদের কি বাৎসল্য! কি অমায়িক ভাব! ভক্তি স্বয়ং আমাকে সমভিব্যাহারে করিয়া সমাধিকুঞ্জে লইয়া চলিলেন। এপথ অত্যন্ত বিরল, কারণ এ পবিত্র তীর্থের যাত্রী প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পূর্ব্বে ঐ স্থান অতি দূরবর্ত্তী বোধ ছিল, ভক্তিপ্রসাদাৎ নিমেষমাত্রে নিকট হইয়া আসিল। তৎসন্নিধানে উত্তীর্ণ হইয়া অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার সমুদায় দর্শন করিলাম। এমন নির্জন, নিস্তব্ধ, নিবিড়, কুঞ্জ, এমন প্রেমপূর্ণ আনন্দধাম আর কথনও আমার নয়নগোচর হয় নাই। সেথানে কি অভাব্য, কি আশ্চর্য্য, কি অনির্ব্বচনীয় দর্শন! দেখি সে স্থানে নানাদেশীয় পবিত্রচরিত্র বিশুদ্ধজ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মারা অতি নির্ম্মল স্থির সুখ সম্ভোগপূর্ব্বক বিরাজ করিতেছেন। বোধ হইল যেন, আমাকে তথায় দর্শন করিয়া তাঁহাদের দ্বিগুণ আনন্দ হইল। তাঁহাদিগের জ্যোতিঃপূর্ণ আনন্দোৎফুল্ল মুখশ্রী অবলোকন করিলে সুধার্ণবে মগ্ন হইতে হয়। পরে আমি কুঞ্জের যত অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম, ততই আনন্দপ্রবাহ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সে যে কি অপ্রত্যক্ষ অনুপম সুখধাম, তাহা বর্ণনা করা যায় না। সে স্থলে দুঃখের লেশ নাই। “রোগ

নাই, শোক নাই, জরা নাই, বিলাপ নাই, মৃত্যু নাই, ক্রন্দন নাই, কেবল যোগানন্দের উৎস, প্রেমানন্দের উৎস, ব্রহ্মানন্দের উৎস, ক্রমাগত উৎসারিত হইতেছে।” আমি এরূপ পরমাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলাম; ইতিমধ্যে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া দেখি, সেই সুমন্দ মারুত-সেবিত যমুনা-কূলেই শয়ান রহিয়াছি।

পুরাবৃত্তসার।

যুদ্ধ-প্রণালী।

অতি পূর্ব্বকালাবধি মনুষ্যগণকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। যত প্রাচীনকালের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করা যায়, ততই তাৎকালিক লোকদিগের বিগ্রহানুরাগ অধিক ছিল বোধ হইতে থাকে। বন্যদশায় জীবিকোপার্জ্জন করাই কঠিন। সুতরাং আপনার প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্য অন্যের নিকট থাকিলে বর্ব্বর ব্যক্তি যে তদধিকারীকে বিনাশ করিয়া সেই দ্রব্য লইবার চেষ্টা করিবে, ইহা সহজেই বোধ হইতে পারে। অধিকন্তু, সে সময়ে শাসনের পারিপাট্য ছিল না, দেশ ও বিস্তীর্ণ ছিল না; সুতরাং জনে জনে, কুলে কুলে, সমাজে সমাজে, অনুক্ষণ এইরূপে বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। আবার যদি একবার কোন কারণে উভপক্ষে বিবাদ উপস্থিত হইত, তবে সেই বৈরিতা পুরুষানুক্রমে ধারাবাহিক হইয়া চলিত। প্রায় একই পক্ষের সর্ব্বতোভাবে বিনাশ-না হইলে উহার শান্তি ছিল না। যখন রাজশাসন উত্তম না থাকে, তখন বৈরনির্যাতন একটী পরম ধর্ম্মের মধ্যে গণ্য হয়।

বোধ হয়, জনগণ প্রথমে প্রস্তরাদি নিক্ষেপ দ্বারাই পশুবধ এবং পরস্পর যুদ্ধ করিত, তখন অন্য অস্ত্রশস্ত্রাদির ব্যবহার ছিল না। ক্রমে লগুড়, কাষ্ঠময় বা শিলাময় অস্ত্র, ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতির ব্যবহার আরম্ভ হয়। তৎকালেই কঠিন পশুচর্ম্ম দ্বারা শরীর আবৃত করাও আরম্ভ হইয়া থাকে।

ক্রমে মনুষ্যসমাজের যেমন উন্নতি হইতে থাকে, যুদ্ধের উপকরণ সকলও তেমনি দিন দিন উৎকর্ষ লাভ করে। ভূম্যধিকারসম্পন্ন ধনশালী জনগণ বর্ম্মাদি শরীরত্রাণ প্রস্তুত করাইতে এবং যানবাহনাদি রাখিতে পারেন। সামান্য দুঃখী লোক সকল তাদৃশ অর্থব্যয়ে সমর্থ হয় না। যুদ্ধ সেই সময় হইতে একটী ব্যবসায়ের মধ্যে গণ্য হইয়া উঠে। ভূমধ্যাকারিগণ আর কোন কর্ম্মই করেন না। যাহাতে শরীরের বল বাড়ে, অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহারে বিশেষ নৈপুণ্য জন্মে, অশ্বহস্তিরথাদি চালনে পটুতা হয়, এই সকল শিক্ষাই তাঁহাদিগের বাল্যাবস্থার একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। অতএব তাদৃশ রণদক্ষব্যক্তিরা যে, এক এক জনে নিরস্ত্র, অশিক্ষিত, দুর্ব্বল শত শত সৈনিকের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে পরাভূত করিবেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে। বোধ হয়, এই জন্যই সর্ব্বদেশীয় প্রাচীন কবিতায় তাদৃশ যুদ্ধবিবরণ বর্ণিত দেখা যায়। সেই সকল কাব্যে সহস্র অত্যুক্তি স্বীকার করিলেও, ঐ সকল বিবরণ যে একেবারে অমূলক, এমত বোধ হয় না। তখন এক এক জন মহারথ যে বহুসংখ্যক পদাতির নিপাত করিতে পারিত, একথা মিথ্যা নহে। যে সকল দেশ বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রের ন্যায়, সেই সেই দেশেই রথের এবং গজের সমধিক ব্যবহার হইয়াছিল। যে সকল দেশ অপেক্ষাকৃত বন্ধুর, তথায় ভূম্যধিকারিবর্গ অশ্বশিক্ষায় নিপুণ হইয়াছিলেন। আসিয়াখণ্ডের প্রাচীন দেশ মাত্রেই যুদ্ধের প্রথা এই পর্য্যন্ত উন্নত হইয়াছিল। সেনাপতি, যুদ্ধকালে রথী,

অশ্বারোহ এবং গজারূঢ় যোদ্ধৃবর্গের উপরই বিশেষ লক্ষ্য করিতেন, পদাতিগণের প্রতি অধিক আদর করিতেন না।

গ্রীক জাতীয়দিগের যুদ্ধ-প্রণালীও যে প্রথমতঃ এইরূপ ছিল, তাহা হোমার বিরচিত মহাকাব্য দর্শনেই প্রতীত হয়। কিন্তু গ্রীকেরা অতি শীঘ্রই প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী অবধারিত করিলেন। তাহা করাতে ভূম্যধিকারিবর্গের সম্মানলাঘব হইল। প্রজামাত্র ভূম্যধিকারী হইতে পারিল। সুতরাং তাহাদিগের নিতান্ত দারিদ্র্যদশা না থাকাতে সকলেই যুদ্ধের সজ্জা এবং অস্ত্র শস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া রাখিতে পারিল। বিশেষতঃ গ্রীষদেশ অত্যন্ত পার্ব্বতীয়; তাহা অশ্বারোহ সৈন্যের বিশেষ বিক্রমের স্থল নহে। অতএব তথায় অশ্বারোহিগণ অপেক্ষাকৃত অনাদৃত এবং পদাতিকগণ অধিক গৌরবান্বিত হইয়াছিল। যে স্থানে পদাতিসৈন্যের সমাদর, তথায় রাজ্যশাসন-প্রণালীও নিতান্ত জঘন্য হইতে পারে না।

রোমও স্বতন্ত্রপ্রজ দেশ ছিল। তথায় পদাতিক সৈন্যের সমধিক আদরও ছিল। গ্রীক এবং রোমীয় পদাতি সৈন্যের সম্মুখে তাৎকালিক কোন জাতীয় লোকেই সংগ্রাম করিতে পারে নাই। যে ঐ দুই জাতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই যেমন অনলে তূলা দগ্ধ হয়, তদ্রূপ অত্যল্পকাল মধ্যে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

নব্য ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যেও যুদ্ধ-প্রণালী অবিকল এইরূপ হইয়া আসিয়াছে দেখা যায়। যখন উহাদিগের মধ্যে

ভূম্যধিকারিবর্গের প্রাধান্য ছিল, তখন পদাতিসৈন্যের যথোচিত আদর ছিল না। ক্রমে যেমন শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষ হইতে লাগিল, অমনি পত্তিগণেরও মর্য্যাদাবৃদ্ধি হইল।

পদাতির সমধিক গৌরব হইলে সমর-প্রণালীর আরো একটী পরিবর্ত্তন ঘটে। কোন রাজ্যের প্রথমাবস্থায় প্রজাগণ শান্তিকালে স্ব স্ব বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে, যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে অস্ত্রধারী হইয়া রণস্থলে যায়। তৎকালে ভূম্যধিকারিগণ স্ব স্ব ভূম্যধিকার হইতে ঐ সকল সেনা লইয়া গিয়া রাজার সহায়তা করেন। কিন্তু রাজ্য বিস্তীর্ণ এবং ভূম্যধিকারিগণ খর্ব্ব-গৌরব হইলে আর এইরূপ থাকে না। রাজ্যরক্ষার নিমিত্ত কতকগুলি ভৃতিভুক্ সেনা নিযুক্ত হয়। তাহারা রাজকোষ হইতে যাবজ্জীবন ভৃতি প্রাপ্ত হইয়া কেবল যুদ্ধই একমাত্র অবলম্বন করিয়া থাকে। এক্ষণে ইউরোপের সর্ব্বত্রই এই প্রকার হইয়াছে।

এক্ষণে যুদ্ধ একটী প্রধান বিদ্যার মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিয়াছে। গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়নাদি বিবিধ শাস্ত্র, শস্ত্রবিদ্যার সহকারী হইয়াছে। কোন অসভ্য জাতির এমত সামর্থ্য নাই যে, নব্য ইউরোপীয়দিগকে পরাভূত করিতে পারে। কিন্তু যেমন বিদ্যাবাহুল্যপ্রযুক্ত এক্ষণে যুদ্ধের কৌশলবৃদ্ধি হইয়াছে, তেমনি শান্তিরসেরও প্রাদুর্ভাব হওয়াতে যুদ্ধের অনেকানেক ভয়ঙ্কর দোষেরও পরিহার হইয়াছে। এক্ষণে সুসভ্য ইউরোপীয়দিগের মধ্যে বালক, বৃদ্ধ, বণিতাগণের প্রতি নিরর্থক

অত্যাচার হয় না, শত্রু শরণাপন্ন হইলে তাহার প্রাণনাশ করা হয় না, প্রজামাত্রকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করা হয় না, ইউরোপীয় কোন রাজা প্রবল হইলে অমনি দিগ্বিজয় করিতে নির্গত হন না, এবং কোন কোন সদাশয় ব্যক্তির মনে মনে এমত ভাবোদয়ও হইতেছে যে, কোন রূপে একেবারে যুদ্ধ করা পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলেই ভাল হয়।

রোমের ইতিহাস।

জূলীয়স সীজার রোম সাম্রাজ্যের এক মাত্র কর্ত্তা হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখনও আপনি রাজোপাধি গ্রহণ করেন নাই। তিনি বাহ্যে প্রাচীন প্রথা সমুদায় প্রচলিত রাখিয়া বাস্তবিক একাধিপত্য শক্তি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সময়ে রাজ্যশাসন অতি সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। অতি উত্তম উত্তম রম্য প্রাসাদ দ্বারা রোম নগর সুশোভিত হইল। অনেকানেক রাজবর্ত্ম ও জলপ্রণালী নির্ম্মিত হইয়া বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যের উপযোগিতা করিতে লাগিল, এবং তাঁহার প্রতাপে সমুদয় সাম্রাজ্য নিরুপদ্রব এবং উপশান্ত হইয়া থাকিল। এই সময়ে কতিপয় ব্যক্তি পুনর্ব্বার প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার বাসনায় সীজরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। তন্মধ্যে ব্রুটস্ এবং কাসিয়স্ নামা দুই ব্যক্তি সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহাঁরা জানিতেন না যে, রোমের স্বাধীনাবস্থার কাল গত হইয়াছে। তখন পূর্ব্বরূপ শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলে

স্বাধীনতার শব মাত্র রক্ষিত হইতে পারে, তাহার জীবন-স্বরূপ যে ধর্ম্মপরায়ণতা তাহা আর কোন ক্রমেই ফিরিয়া আসিতে পারে না। যাহা হউক, উঁহারা সীজরকে সেনেট গৃহ মধ্যে হত্যা করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণে লোকসাধারণ প্রথমে স্তব্ধ ও সাতিশয় ভীত হইল, পরে যখন সীজরের অধীন আণ্টনি নামা এক জন সেনাপতি সীজরের মৃতদেহ প্রদর্শন করিয়া বক্তৃতা করিলেন—যখন ঐ মৃত মহাত্মার গুণগ্রাম ও পরোপ-কারিতার নানাবিধ প্রমাণ দর্শাইলেন—তখন সকলেই হত্যা-কারীদিগের উপর সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইল, ব্রুটস্ এবং কাসিয়স্ রোম নগর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। নানা বিবাদের পর সীজরের ভাগিনেয় অক্টেবিয়স্ এবং তাঁহার সেনাপতি আণ্টনি এবং গল দেশের শাসনকর্ত্তা লেপিডস্ এই তিন জনে মিলিত হইয়া সমুদায় রোম সাম্রাজ্যের শাসনকর্তৃত্ব বিভাগ করিয়া লইলেন।

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

এক দিবস রাজা জয়সিংহ স্বীয় শিবিরে উপবিষ্ট আছেন, হঠাৎ মহারাষ্ট্রপতি একাকী এবং নিরস্ত্র তৎসমক্ষে উপনীত হইয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলেন। জয়পুর-পতি তৎ-ক্ষণাৎ তটস্থ হইয়া কিছুকাল ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু বীর পুরুষেরা উপযুক্ত প্রতি-

পক্ষেরও গুণগ্রহণে সক্ষম। জয়সিংহ শিবজীর সহিত যুদ্ধ করিয়া বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার আপনার সৈন্যসংখ্যা অতিরিক্ত না হইলে তিনি স্বয়ং অকিঞ্চিৎকর হইতেন। অতএব শিবজীর প্রতি তাঁহার বিশিষ্ট শ্রদ্ধা হইয়াছিল। তিনি মহারাষ্ট্রপতিকে নিজসমীপস্থ দেখিয়া প্রথমতঃ চমৎকৃত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই বিশিষ্টসমাদর সহকারে ভ্রাতৃসম্বোধন এবং আলিঙ্গনপ্রদানপূর্ব্বক স্বপার্শ্বে আসনপরিগ্রহ করাইলেন। মহারাষ্ট্র-পতি মৌনী হইয়া বসিলেন। রাজা জয়সিংহ ভাবে বুঝিতে পারিয়া পারিষদদিগকে ইঙ্গিত করিবামাত্র তাহারা স্থানান্তর হইল। শিবজী কহিতে লাগিলেন।

"মহারাজ! আমাকে এমত সময়ে দেখিয়া আপনি অবশ্য বিস্মিত হইয়াছেন। হইবেনই ত। আমি যে দুরাশার বশীভূত হইয়া আসিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে আপনিই বিস্ময়াবিষ্ট হই। কিন্তু মহারাজ! মন যাহা বলে, তাহা কখন নিতান্ত মিথ্যা হয় না। কিছুকাল হইল আমার অন্তঃকরণে কেমন সুদৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে, আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উভয়ে উভয়ের তাৎপর্য্য অবগত হইলেই এই দুরন্ত সমরাগ্নি নির্ব্বাণ হইবে, এবং আমরা যেমন উভয়ে একধর্ম্মাবলম্বী, এক জাতি এবং (বোধ করি আপনি জানেন) একগোত্রোদ্ভব, তেমনই আশা করি, উভয়ে একপরামর্শী এবং এককর্ম্মা হইব। মহারাজ! আমাদিগের একত্র মিলন হইলে উভয়ের মঙ্গল। যাহাতে জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষিত হয়, দেশের মুখ উজ্জ্বল হয়, এবং

অন্য সর্ব্বজাতির নিকট হিন্দু নামটী অবজ্ঞাস্পদ না হয়, এবম্ভ কর্ম্ম কি কর্ত্তব্য নহে? দেখুন দেখি, দিল্লীশ্বর কেমন মন্ত্রণা করিয়া আমাদিগের অনৈক্যকেই আমাদিগের অনর্থের মূল করিতেছেন। যদি আপনার স্থানে আমি পরাভূত হই, অথবা আপনি আমা কর্ত্তৃক হৃতবেজা হয়েন, উভয়ই আরঙ্গেবের মঙ্গলাবহ। স্মরণ করুন, তিনি এই উপায় দ্বারা ক্রমে ক্রমে কোন্ হিন্দু মহীপালকে স্বপদাবনত না করিলেন? শুনিয়াছি, উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সমুদ্র, পশ্চিমে সিন্ধু, এবং পূর্ব্বে ব্রহ্ম-রাজ্য এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভারত-ভূমি তাঁহার কব-লিত হইয়াছে। কোথাও একটী স্বাধীন হিন্দু রাজা নাই। কেবল রাজপুতনায় আপনারা এবং দক্ষিণে আমি অদ্যাপি হিন্দু ধর্ম্ম এবং হিন্দু নাম রক্ষা করিতেছি। আরঙ্গেব কেবল আমাদিগকেই কিঞ্চিৎ ভয় করেন, বুঝি তাহাও আর অধিক কাল করিতে হইবে না। ফলতঃ মহারাজ! আমি আর পরস্পর যুদ্ধে স্বজাতির বিনাশ অবলোকন করিতে পারি না। আপনার যেরূপ কর্ত্তব্য বোধ হয়, অনুমতি করুন।

"মহারাজ! বাদসাহ কখন আপনকার অগৌরব করেন নাই সত্য; কারণ তিনি আপনাকে ভয় করেন। কিন্তু যদি আপনি আজি লোকান্তরগত হয়েন, তবে কালি আপনার পরিবারেরা বুঝিবেন বাদসাহ আপনকার কেমন সুহৃৎ। মহা-রাজ! পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুসলমান বাদসাহেরা, হিন্দু রাজাদিগের সহিত নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে কর প্রাপ্ত হইলেই সন্তুষ্ট হইতেন। ইনি

ক্রমে ক্রমে হিন্দু রাজা মাত্রের তেজোহ্রাস করিতেছেন, ইহার মানস সম্পূর্ণ সফল হইলে একটীও হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী রাজা থাকিবে না। আমি জানি কেহ কেহ আরঞ্জেবকে জিতেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি-মান বলিয়া প্রশংসা করেন। কিন্তু বাস্তবিক তিনি জাত্মস্বভাব হইলে আমার এমত ভয় হইত না। নৃশংস নির্ব্বোধ রাজারা যে সকল অত্যাচার করেন, তজ্জনিত দুঃখ স্বল্পকালব্যাপী হয়, কিন্তু ক্রূরমতি নৃপালগণের যে বিষবৃক্ষরূপ মন্ত্রণা, তাহার ফলা-স্বাদনে সন্তানসন্ততি সমুদয়ে খর্ব্ববীর্য্য হইয়া যায়। আমি জানি, অনেকেরই মনে এক্ষণে এমত প্রতীতি হইয়াছে যে, যেমন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জগদীশ্বরনির্দ্দিষ্ট জাতিপ্রণালী হইয়া আসিতেছে, মুসলমানও সেইরূপ বাদসাহের জাতি। মুসলমান বই আর কেহ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিতে পারে না। এইরূপ বোধ থাকাতেই এত হিন্দু রাজা অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়াও দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করেন। তাহা করুন, রাজশক্তি যে ব্যক্তিতে কেন অর্পিত হউক না, তিনি হিন্দু হউন বা মুসলমান হউন, বা অন্য যে কোন জাতীয় হউন, সুশীল বিচক্ষণ এবং অপক্ষপাতী হইলেই প্রজাগণ সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে, এবং কৃতী হইয়া জন্ম-ভূমির মুখ উজ্জ্বল করে। আকবর সাহ মুসলমানজাতীয় ছিলেন। তথাপি কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকল প্রজার প্রতিই পক্ষপাতশূন্য হইয়া ব্যবহার করিতেন বলিয়া কত কত হিন্দু রাজারা তাঁহার সময়ে রাজকার্য্যে বুদ্ধি নিয়োজন করিয়া সুশাসন

বিধি সমস্ত নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। এই দেশে সুবোধ লোকের কিছুমাত্র অসদ্ভাব নাই। আরঙ্গেব এত চেষ্টা করিয়াও সকল নিঃশেষ করিতে পারেন নাই। এখনও আপনারা কয়েক জন সুমহৎস্তম্ভবৎ তাঁহার রাজ্যভার বহন করিতেছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী বাদসাহেরা যদি ইহাঁর দৃষ্টান্তানুযায়ী হইয়া চলেন, তবে স্বল্পকালমধ্যেই সুবর্ণ মণিমাণিক্যাদিপ্রসবা ভারত-ভূমি আর উৎকৃষ্ট নবরত্ন প্রসবে সমর্থা হইবেন না। মহারাজ! আমার এই প্রার্থনা, যেন এমন দিন কখন উপস্থিত না হয় যে, কোন বাদসাহ হিন্দুজাতির মধ্যে সক্ষম ব্যক্তি নাই বলিয়া অবজ্ঞা করেন। মহারাজ! যাঁহারা আপনারাই এই জাতিকে নিস্তেজ করিয়া পরে ক্ষীণবীর্য্য বলিয়া অবজ্ঞা করেন, তাঁহাদের কি সাধারণ দুষ্টতা! মহারাজ! অধুনা ভারতরাজ্যের যে অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রবাবস্থা দৃষ্ট হইতেছে, সে বিকারাপন্ন রোগীর দৌর্ব্বল্যাধীন নিস্পন্দ হওয়ার ন্যায়,—তাহা সুষুপ্তির সুখানুভব নহে।”

ইংলণ্ডের ইতিহাস।

ইউরোপের মানচিত্রের বায়ুকোণে যে একটী অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার দ্বীপ দৃষ্ট হয়, তাহারই এক ভাগের নাম ইংলণ্ড। ঐ দ্বীপ ইংরাজদিগের নিবাসভূমি। দ্বীপমাত্রেরই বায়ু প্রায় সমশীতোষ্ণ হইয়া থাকে। ইংলণ্ডেরও সেইরূপ। এই দেশের

ভূমি নিতান্ত অনুর্ব্বরা বোধ হয় না, কিন্তু কোথাও এমত উর্ব্বরাও নয় যে, তদ্দেশবাসীদিগের যথেষ্ট আয়াস ব্যতিরেকে সমুচ্চফলদায়িনী হয়। ইহার উপকূল ভাগে অনেক সাগরশাখা প্রবিষ্ট হইয়াছে, এবং ইহাতে সুনাব্যা নদীও অনেক আছে। সুতরাং এই দেশ বণিগ্‌বৃদ্ধির পক্ষে বিলক্ষণ উপযোগী। এখানকার আকরিকের মধ্যে পাথরিয়া কয়লা, লৌহ, এবং টিন প্রধান। আর উদ্ভিজ্জের মধ্যে ওকবৃক্ষ সাতিশয় প্রসিদ্ধ; ইহার কাষ্ঠদ্বারা দৃঢ়তর অর্ণবযান প্রস্তুত হইয়া থাকে।

যাবৎকালই ইংলণ্ডদেশে নিতান্ত অলসস্বভাব, কৃষি ও বণিগ্‌বৃত্তিপরাঙ্মুখ, অর্ণবযানপ্রস্তুতকরণে অশক্ত, কিন্তু সাহসী, ধর্ম্মপরায়ণ, এবং সংগ্রামানুরক্ত কেণ্ট জাতির বাস ছিল, তাবৎকাল এই দেশের কোন বৃত্তান্তই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেবল এই মাত্র শ্রুত হওয়া যায় যে, প্রাচীন ফিনীসীয় এবং কার্থেজীয় বণিকেরা কখন কখন এই দেশে বাণিজ্যার্থে আগমন করিত, এবং এখানকার টিন, লৌহ, উর্ণা প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া তদ্বিনিময়ে কাচ, পিত্তলাদি নানাবিধ সামগ্রী প্রদান করিয়া যাইত। তাহার বহুকাল পরে যখন রোমকেরা আপনাদিগের সাম্রাজ্য বিস্তার করে, তখন তাহাদিগের সেনাপতি জগদ্বিখ্যাত জুলিয়স সীজর সমুদায় গল্‌দেশ জয় করিয়া ৫৬ খৃঃ পূঃ অব্দে ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে আইসেন। তিনি কেণ্ট প্রদেশের উপকূলে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন যে, তদ্দেশবাসিগণ পদাতি, অশ্বারোহী এবং রথারূঢ় হইয়া নানা অস্ত্র-শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক

তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া আছে। কিন্তু সীজরের রণ-পাণ্ডিত্যে এবং তাঁহার সৈন্যগণের সুশিক্ষাগুণে ঐ আদিম নিবাসীদিগের সকল প্রযত্ন এবং সাহস ব্যর্থ হইয়া গেল। সীজর উহাদিগকে পরাজয় করিয়া প্রতিগমন করিলেন। ইহার পর তিনি আর একবার ইংলণ্ডে আইসেন। এবং রোমাধিকার পূর্ব্বাপেক্ষা সুবিস্তৃত করিয়া যান।

যে সময়ের কথা হইতেছে, সেই সময়ে ইংলণ্ডদ্বীপের নাম বৃটেন ছিল, এবং তদ্দেশবাসীদিগকে বৃটন বলিত। সীজর ও অপরাপর রোমক গ্রন্থকারেরা লিখিয়া গিয়াছেন যে, তখন বৃটন দ্বীপ নিবিড় অরণ্যে আচ্ছন্ন ছিল, এবং তথাকার লোক সকলও অত্যন্ত অসভ্য ছিল। তাহারা বৃক্ষের ত্বক বা বন্য পশুর চর্ম্মদ্বারা যথাকথঞ্চিৎরূপে আপনাদিগের শরীর আবরণ করিত। গাত্রে রক্ত, কৃষ্ণ, পীত, হরিতাদি বর্ণ বিলিপ্ত করিয়া সংগ্রাম স্থানে ঘোররূপ ধারণ করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠ-খণ্ড চর্ম্মাবৃত করিয়া সরিৎ ও জলাকীর্ণ ভূমি সমস্ত উত্তীর্ণ হইবার উপযোগী ভেলক প্রস্তুত করিত। বস্তুতঃ কৃষি ও বাণিজ্য দ্বারা যে সকল প্রয়োজনীয় এবং সুখোপভোগের সামগ্রী প্রস্তুত হয়, ঐ বৃটনদিগের মধ্যে তাহার কিছুই ছিল না। কিন্তু তখনও বৃটনেরা সর্ব্বত্র এক প্রকার ছিল না। দক্ষিণ ভাগে বিশেষতঃ কেণ্ট প্রদেশে যাহারা বাস করিত, তাহাদিগের মধ্যে পাশুপাল্য, কোথাও কোথাও কৃষি এবং যৎকিঞ্চিৎ বণিগবৃত্তির প্রথাও প্রচলিত হইয়াছিল। তখন বৃটনের যত অন্তর্ভাগে যাওয়া

যাইত, ততই অসভ্যতার তিমির ক্রমশঃ গাঢ়তর বোধ হইত, এবং যত উপকূলভাগে আগমন করা যাইত, ততই সভ্যতার অপরিস্ফুট আলোক কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দৃষ্টিগোচর হইত। এমন বন্যদশাপন্ন লোকের মধ্যে যে কিরূপ শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল, তাহা সুনিশ্চিতরূপে অবধারিত হয় না। এই পর্য্যন্ত অবগতি আছে যে, বৃটনেরা অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিতে বিভক্ত হইয়া এক একটী জাতি এক এক জন শাসনকর্ত্তার অধীনে বাস করিত। ইহাদিগের ধর্ম্মপ্রণালীও অন্যান্য তাদৃশাবস্থ জাতির ধর্ম্মপ্রণালী হইতে অধিক ভিন্ন ছিল না। ইহাদিগের মধ্যে ড্রুইড্ নামে একটী যাজকসম্প্রদায় ছিল। তাহারা রাজাদিগের অপেক্ষাও সমধিক পরাক্রমশালী হইয়া যাহা মনে করিত, তাহাই করিতে পারিত। ড্রুইডেরা পূর্ব্বজন্ম এবং পরজন্ম স্বীকার করিতেন। পরমেশ্বর এক এবং তাঁহার অধীনে অসংখ্য দেবদেবী আছেন ইহাও মানিতেন। কখন কখন যুদ্ধধৃত হত-ভাগ্যবন্দিগণকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া ঐ দেবতাগণের উপাসনা করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশই নিবিড় অরণ্য মধ্যে কেবল জপ তপস্যা দ্বারা ঈশ্বরারাধনায় নিমগ্নচিত্ত হইয়া থাকিতেন। ড্রুইড্দিগের শক্তি অদ্বিতীয় ছিল। ইহাঁরা যদি কোন রাজাকেও অভিশপ্ত করিতেন, তবে আর কেহই তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিত না, কেহই তাঁহার কোন সাহায্য করিত না। যাহার ইচ্ছা, সেই তাঁহার প্রাণবধ করিতে পারিত, এবং বহুস্থলে সেই হতভাগ্য ব্যক্তি অন্নজল অভাবেই প্রাণ পরিত্যাগ করিত।

ফলতঃ, বৃটনেরা সর্ব্বতোভাবে আপনাদিগের যাজকবর্গেরই অধীন হইয়াছিল। কিন্তু যখন রোমকেরা, প্রবল হইয়া সম্রাট ক্লডিয়স্ এবং নিরোর সময়ে ওয়েলস দেশ পর্য্যন্ত অধিকার করিল, অনেকবার অনেক বিদ্রোহ দমন করিল, বহুসংখ্যক নগর এবং উপনিবেশ সংস্থাপিত করিল, ও সুটোনিয়স পলিনস্, নামে তাহাদিগের একজন সেনাপতি 'মোনা' দ্বীপে গিয়া তথাকার সকল ড্রুইড্‌কে খড়্গাহত এবং তাহাদিগের আরাধনা-স্থান সমস্তকে ভস্মসাৎ করিলেন, তখন বৃটনেরা সর্ব্বতোভাবে বশতাপন্ন রহিল। ইহার পর "আগ্রিকোলা" নামে একজন শাসনকর্ত্তা বৃটনে আগমন করিয়া উত্তরে স্কটলণ্ডের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত অধিকার করিলেন এবং কতকগুলি রণতরি প্রস্তুত করিয়া ইউরোপের উত্তরাঞ্চলীয় জলদস্যুগণের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিলেন। ফলতঃ ঐ সময় অবধি বৃটনে রোমাধিকারের দোষ গুণ দুইই ক্রমশঃ প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। ধর্ম্মাধিকরণ উত্তম হইল, শাসনপ্রণালী উৎকৃষ্টতর হইল, নগর পুর সমস্ত নির্ম্মিত হইতে লাগিল, রাজবর্ত্ম সকল প্রস্তুত হইল, এবং কৃষি ও বাণিজ্য কার্য্যের প্রতি জন সাধারণের অনুরাগবৃদ্ধি হওয়াতে দেশে ধনসম্পত্তির আধিক্য হইতে লাগিল। কিন্তু রোমকেরা বৃটনদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করাইয়া কখনো স্বদেশে অবস্থান করিতে দিতেন না। যে সকল বৃটন যুদ্ধশিক্ষা করিত, তাহা-দিগকে কোন দূরদেশ রক্ষার্থ প্রেরণ করিয়া অপরদেশীয় সৈনিকগণের দ্বারা বৃটনের রক্ষা করিতেন। আর যে সকল

লোক সৈনিককর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইয়াছিল, তাহাদিগের সকলকেই নিরস্ত্র হইয়া থাকিতে হইত। সুতরাং রোমকেরা একবার বৃটন ত্যাগ করিয়া গেলে এতদ্দেশীয়েরা যে, কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে তাহার কোন উপায়ই রহিল না।

যেমন মৃত্যু আসন্ন হইলে হস্তপদাদির প্রান্তভাগ অগ্রেই শীতল হয়, এবং তথায় রক্তের গমনাগমন নিবৃত্ত হওয়াতে আর সেই সকল স্থলে নাড়ীর গতিবোধ হয় না, শরীরের মধ্যভাগেই ক্ষণকাল পর্য্যন্ত নাড়ীর সঞ্চার বোধ হইয়া থাকে, সেইরূপ যেমন রোম সাম্রাজ্যের বিনাশকাল নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, অমনি তাহার দূর প্রদেশ সমুদায় হইতে রোমক সৈন্যগণ প্রস্থান করিল, আর তথায় প্রত্যাগমন করিল না এবং ক্রমে সঙ্কুচিত-বৃত্ত হইয়া রোমের সন্নিধানেই চতুর্দ্দিক রক্ষা করিবার নিমিত্ত কিছুকাল সচেষ্ট হইতে লাগিল। ৪০৯ খৃঃ অব্দে রোমকেরা ইংলণ্ড পরিত্যাগ করে। তখন স্কটলণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলবাসী "স্কট্" এবং "পিক্ট" জাতীয়েরা বৃটনদিগকে অত্যন্ত বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিল। বৃটনেরা যুদ্ধে নিতান্ত অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা রোমে পত্রপ্রেরণ করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করত এই বলিয়া দুঃখ করিয়াছিল যে, "ভীষণাকার অসভ্য লোকেরা আমাদিগকে সমুদ্রের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে, সমুদ্র ও আবার ঐ রাক্ষসদিগের সমক্ষে প্রতিহত করিতেছে, আমরা কোথায় যাই, কি করি, কিছুই বুঝিতে পারি না।" কিন্তু রোমকেরা আপনাদিগের দুঃখসময়ে বৃটনদিগের বিশেষ উপকার করিতে

পারিলেন না। সুতরাং উহারা অগত্যা উত্তরাঞ্চলীয় জলদস্যু-দিগের নিকটেই সাহায্য প্রার্থনা করিল। ঐ জলদস্যুদিগের বাসস্থান, "রাইন" নদীর মুখ হইতে "এল্‌বনদীর" মুখ পর্য্যন্ত যে ভূভাগ, তাহাতেই ছিল। উহারা "জুট" "আঙ্গল" এবং "সাক্‌সন্" ইত্যাদি বিবিধ নামে প্রসিদ্ধ হয়। "হেঙ্গিষ্ট" এবং "হর্সা" নামক ভ্রাতৃদ্বয় নিমন্ত্রণ পাইয়া বৃটনে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অতি অল্পায়াসেই স্কট ও পিক্টদিগকে পরাভূত করিয়া সমুদায় নিরুপদ্রব করিল। কিন্তু তাহারা দেশের শোভা ও দেশবাসীদিগের অক্ষমতা দর্শনে আপনারা লোভপরবশ হইয়া বৃটন ত্যাগ করিয়া যাইতে নিতান্ত অনিচ্ছু হইল। প্রত্যুত উহারা স্বদেশীয় অপরাপর লোক সকলকে আহ্বান করিতে লাগিল এবং সকলে মিলিয়া ক্রমে ক্রমে সমুদায় দেশটী আপনা-দিগের অধিকৃত করিয়া লইল।

বৃটনেরা কেল্টজাতীয় ছিল, সাক্‌সনেরা তাহা ছিল না। উহারা টিউটনজাতীয় লোক ছিল। উহাদিগের সহিত যুদ্ধে বৃটনেরা প্রায় নির্ম্মূলিত হইয়া যায়। কেবল পশ্চিম ভাগে যে পর্ব্বতশ্রেণী আছে, তাহাতে কতক লোক প্রস্থান করিয়া রক্ষা পায়। আর কতক ব্যক্তি গলদেশে পলাইয়া বৃটনি নামক তাহার প্রদেশবিশেষে যাইয়া বাস করে।

সমুদায় দেশ সাক্সনদিগের অধিকৃত হইলে উহা প্রথমতঃ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়; এবং সেই সময়ে পোপ গ্রেগরী প্রেরিত অগষ্টিন নামক একজন সাধু আসিয়া উহা-

দিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে আরম্ভ করেন। সাক্সনদিগের পূর্ব্বধর্ম্ম অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল। উহারা অনেক দেবদেবী মানিত এবং স্বর্গ নরকও স্বীকার করিত বটে, কিন্তু উহাদিগের মতে দেবতা-মাত্রেই রণোন্মত্ত, সর্ব্বদা যুদ্ধ এবং মধ্যে মধ্যে তীব্র মদিরা পান করাই স্বর্গের সুখ, আর যুদ্ধে পলায়ন করিলেই নরকের দুঃখ ভোগ করিতে হয়। যতদিন উহারা অসভ্য ছিল এবং দস্যুবৃত্তি দ্বারা আপনাদিগের জীবনোপায় করিত, তাবৎকাল এইরূপ ধর্ম্মই প্রবল রহিল। কিন্তু যখন উহাদিগের বৃটন দ্বীপে বাস হইল, কৃষি বাণিজ্যাদি দ্বারা সুখভোগের সামগ্রী উৎপন্ন হইল, এবং অন্যান্য প্রকারে অবস্থার পরিবর্ত্ত হওয়াতে মনও কোমল এবং প্রশান্ত হইয়া উঠিল, তখন পূর্ব্বোক্তরূপে কেবল সংগ্রামপর ধর্ম্মপ্রণালী আর শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারিল না। সাক্সনেরা অতি অল্পকালের মধ্যেই খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে। ইহারাই কিয়ৎকাল পরে তাহাদিগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আটটী রাজ্য ক্রমশঃ পরস্পর মিলিত হইয়া একত্রীকৃত হয় এবং এগবর্ট নামক কোন মহাত্মা ঐ মিলিত রাজ্যের রাজা হন।

এই সাক্সনেরাই বর্ত্তমান ইংরাজ জাতির পূর্ব্ব পুরুষ। উহাদিগের অসভ্যাবস্থাতেই যে সকল রীতি নীতি ছিল, তাহাই এক্ষণে পরিপক্ক হইয়া ইংরাজদিগের সুসভ্য রীতি নীতি হইয়াছে। উহাদিগের রাজা যথেচ্ছাচারী হইতে পারিতেন না। কতকগুলি সুবিজ্ঞ বৃদ্ধের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে রাজকার্য্য করিতে হইত, ঐ সভার নাম "উইটিনাগিমট্" ছিল। ফলতঃ

ঐ সভাই বর্ত্তমান "পার্লিয়ামেণ্ট" সভার মূলস্বরূপ বলিতে হইবেক। সাক্সনদিগের ধর্ম্মাধিকরণ একপ্রকার 'পঞ্চায়তের' দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। তাহা হইতেই ইংরাজদিগের মধ্যে জুরি নিয়োগের ব্যবহার উৎপন্ন হইয়াছে। সাক্সনেরাই প্রথমে সমুদায় ইংলণ্ড দেশকে সাইয়র, কৌণ্টী, হণ্ড্রেড ইত্যাদি নানা-ভাগে বিভক্ত করে এবং প্রজাদিগকে পরস্পরের আচার ব্যব-হারের প্রতি দৃষ্টি রাখাইয়া যাহাতে আপনারাই অনেকাংশে আপনাদিগের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে এমন উপায় করিয়া দেয়। ইংরাজেরা সেই অবধি প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী সংস্থাপনে যেমন কৃতকার্য্য হইয়াছেন; বোধ হয়, পৃথিবীর অন্য কোন জাতিই সেরূপ হইতে পারেন নাই। সাক্সনেরা জলযান-প্রস্তুতকরণে বিলক্ষণ নিপুণ, সামুদ্রিক যুদ্ধে অতিশয় কুশল, আর জলপথে দূরদেশ গমনে একান্ত নির্ভয়হৃদয় ছিল—ইংরাজেরাও এই সকল গুণের নিমিত্ত বিশিষ্টরূপে গৌরবান্বিত হইয়া আছেন।

তারাশঙ্কর তর্করত্ন।

কাদম্বরী।

শুকবৈশম্পায়নের বৃত্তান্ত।

একদা প্রভাতকালে চন্দ্রমা অস্তগত হইলে, পক্ষিগণের কল-রবে অরণ্যানী কোলাহলময় হইলে, নবোদিত রবির আতপে গগনমণ্ডল লোহিতবর্ণ হইলে, গগনাঙ্গনবিক্ষিপ্ত অন্ধকাররূপ ভস্মরাশি দিনকরের কিরণরূপ সম্মার্জ্জনী দ্বারা দূরীকৃত হইলে, সপ্তর্ষিমণ্ডল অবগাহনমানসে মানস সরোবরতীরে অবতীর্ণ হইলে, শাল্মলীবৃক্ষস্থিত পক্ষিগণ আহারের অন্বেষণে অভিমত প্রদেশে প্রস্থান করিল। পক্ষিশাবকেরা নিঃশব্দে কোটরে রহি-য়াছে ও আমি পিতার নিকটে বসিয়া আছি, এমন সময়ে, ভয়া-বহ মৃগয়াকোলাহল শুনিতে পাইলাম। কোন দিকে সিংহসকল গম্ভীরস্বরে গর্জ্জন করিতে লাগিল; কোন প্রদেশে তুরঙ্গ, কুরঙ্গ, মাতঙ্গ প্রভৃতি বনচর পশুসকল বন আন্দোলন করিয়া বেড়াইতে লাগিল; কোন স্থানে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বরাহ, প্রভৃতি ভীষণাকার জন্তুসকল ছুটাছুটী করিতে লাগিল, কোন স্থানে মহিষ, গণ্ডার প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ জন্তুগণ অতিবেগে দৌড়িতে লাগিল ও তাহা-দিগের গাত্রঘর্ষণে বৃক্ষ সকল ভগ্ন হইতে আরম্ভ হইল। মাতঙ্গের চীৎকারে, তুরঙ্গের হ্রেষারবে, সিংহের গর্জ্জনে ও পক্ষিগণের কলরবে, বন আকুল হইয়া উঠিল এবং তরুগণও ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। আমি সেই কোলাহলশ্রবণে ভয়বিহ্বল ও কম্পিত-

কলেবর হইয়া পিতার জীর্ণপক্ষপুটের অন্তরালে লুকাইলাম। তথা হইতে ব্যাধদিগের "ঐ বরাহ যাইতেছে", "ঐ হরিণ দৌড়িতেছে", "ঐ করভক পলাইতেছে" ইত্যাদি নানাপ্রকার কোলাহল শুনিতে লাগিলাম।

মৃগয়াকোলাহল নিবৃত্ত হইলে অরণ্যানী নিস্তব্ধ হইল। তখন আমি পিতার পক্ষপুট হইতে আস্তে আস্তে বিনির্গত হইয়া কোটর হইতে মুখ বাড়াইয়া যে দিকে কোলাহল হইতেছিল, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম কৃতান্তের সহোদরের ন্যায়, পাপের সারথির ন্যায়, নরকের দ্বারপালের ন্যায়, বিকট-মূর্ত্তি এক সেনাপতির সমভিব্যাহারে যমদূতের ন্যায় কতকগুলি কুরূপ ও কদাকার শবরসৈন্য আসিতেছে। তাহাদিগকে দেখিলে ভূতবেষ্টিত ভৈরব ও দূতমধ্যবর্ত্তী কালান্তককে স্মরণ হয়। সেনাপতির নাম মাতঙ্গক পশ্চাৎ অবগত হইলাম। সুরাপানে দুই চক্ষু জবাবর্ণ, সর্ব্বশরীরে বিন্দু বিন্দু রক্তকণিকা লাগিয়াছে, সঙ্গে কতকগুলি বড় বড় শিকারী কুকুর আছে। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল যেন, কোন বিকটাকার অসুর বন্য পশু ধরিয়া খাইতে আসিয়াছে। শবরসৈন্য অবলোকন করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলাম যে, ইহারা কি দুরাচার ও দুষ্কর্ম্মান্বিত। জনশূন্য অরণ্য ইহাদিগের বাসস্থান, মদ্য মাংস আহার, ধনু ধন, কুকুর সুহৃৎ, ব্যাঘ্র ভল্লূক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর সহিত একত্র বাস এবং পশুদিগের প্রাণবধ করাই জীবিকা ও ব্যবসায়। অন্তঃকরণে দয়ার লেশ নাই, ধর্ম্মের ভয় নাই ও সদাচারের

প্রবৃত্তি নাই। ইহারা সাধুবিগর্হিত পথ অবলম্বন করিয়া সকলের নিকটেই নিন্দাস্পদ ও ঘৃণাস্পদ হইতেছে সন্দেহ নাই। এইরূপ চিন্তা করিতেছিলাম, এমন সময়ে মৃগয়াজন্য শান্তি দূর করিবার নিমিত্ত তাহারা আমাদিগের আবাসতরুতলের ছায়ায় আসিয়া উপবিষ্ট হইল। অনতিদূরস্থিত সরোবর হইতে জল ও মৃণাল আনিয়া পিপাসা ও ক্ষুধা শান্ত করিল। শ্রান্তিদূর করিয়া চলিয়া গেল।

দিবাবসানে তপোবনের শোভা।

ক্রমে দিবাবসান হইল। মুনিজনেরা রক্তচন্দনসহিত যে অর্ঘ্যদান করিয়াছিলেন, সেই রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত হইয়াই যেন, রবি রক্তবর্ণ হইলেন। রবির কিরণ ধরাতল পরিত্যাগ করিয়া কমলবনে, কমলবন ত্যাগ করিয়া তরুশিখরে এবং তদনন্তর পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিল। বোধ হইল যেন, পর্ব্বতশিখর স্বর্ণে মণ্ডিত হইয়াছে। রবি অস্তগত হইলে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। সন্ধ্যাসমীরণে তরুশাখাসকল সঞ্চালিত হইলে বোধ হইল যেন, তরুগণ বিহগদিগকে নিজ নিজ কুলায়ে আগমন করিবার নিমিত্ত অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা আহ্বান করিল। বিহগকুলও কলরব করিয়া যেন তাহার উত্তর প্রদান করিল। মুনিজনেরা ধ্যানে বসিলেন ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিতে লাগিলেন। দুহ্যমান হোমধেনুর মনোহর দুগ্ধধারাধ্বনি আশ্রমের

চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত করিল। হরিদ্বর্ণ কুশ দ্বারা অগ্নিহোত্রবেদি আচ্ছাদিত হইল। দিনের বেলায় দিনকরের ভয়ে গিরিগুহার অভ্যন্তরে লুকাইয়া ছিল; এই সময় সময় পাইয়া অন্ধকার তথা হইতে সহসা বহির্গত হইল। সন্ধ্যা ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তাহার শোকে দুঃখিত ও তিমিররূপ মলিনবসনে অবগুণ্ঠিত হইয়া বিভাবরী আগমন করিল। ভাস্করের প্রতাপে গ্রহগণ তস্করের ন্যায় ভয়ে লুকাইয়াছিল, অন্ধকার পাইয়া অমনি গগনমার্গে বহির্গত হইল। পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে সুধাংশুর অংশু অল্প অল্প দৃষ্টিগোচর হওয়াতে বোধ হইল যেন, প্রিয়সমাগমে আহ্লাদিত হইয়া পূর্ব্ব দিক্ দশনবিকাশপূর্ব্বক মন্দ মন্দ হাসিতেছে। প্রথমে কলামাত্র, ক্রমে অর্দ্ধমাত্র, ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণমণ্ডল শশধর প্রকাশিত হওয়াতে সমুদায় তিমির বিনষ্ট হইয়া গেল। কুমুদিনী বিকসিত হইল। মন্দ মন্দ সন্ধ্যাসমীরণ সুখাসীন আশ্রমমৃগগণকে আহ্লাদিত করিল। জীবলোক আনন্দময়, কুমুদ গন্ধময় ও তপোবন জ্যোৎস্নাময় হইল। ক্রমে ক্রমে চারি দণ্ড রাত্রি হইল।

যুবা ব্যক্তির প্রতি উপদেশ।

যৌবন অতিবিষম কাল। যৌবনরূপ বনে প্রবেশিলে বন্যজন্তুর ন্যায় ব্যবহার হয়। যুবা পুরুষেরা কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি পশুধর্ম্মকে সুখের হেতু ও স্বর্গের সেতু জ্ঞান করে। যৌবনপ্রভাবে মনে এক প্রকার তম উপস্থিত হয়, উহা কিছু-

তেই নিরস্ত হয় না। যৌবনের আরম্ভে [illegible] বর্ষাকালীন নদীর ন্যায় কলুষিতা হয়। বিষয়তৃষ্ণা ইন্দ্রিয়গণকে আক্রমণ করে। তখন অতি গর্হিত অসৎ কর্ম্মকেও দুষ্কর্ম্ম বলিয়া বোধ হয় না। তখন লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়া স্বার্থসম্পাদন করিতেও লজ্জা বোধ হয় না। সুরাপান না করিলেও, চক্ষুর দোষ না থাকিলেও, ধনমদে মত্ততা ও অন্ধতা জন্মে। ধনমদে উন্মত্ত হইলে হিতাহিত বা সদসদ্বিবেচনা থাকে না। অহঙ্কার ধনের অনুগামী। অহঙ্কৃত পুরুষেরা মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না। আপনাকেই সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান, বিদ্বান ও প্রধান বলিয়া ভাবে, অন্যের নিকটেও সেইরূপ প্রকাশ করে। তাহার স্বভাব এরূপ উদ্ধত হয় যে, আপন মতের বিপরীত কথা শুনিলে তৎক্ষণাৎ খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। প্রভুত্ব-রূপ হালাহলের ঔষধ নাই। প্রভুজনেরা অধীন লোকদিগকে দাসের ন্যায় জ্ঞান করে। আপন সুখে সন্তুষ্ট থাকিয়া পরের দুঃখ ও সন্তাপ কিছুই দেখিতে পায় না। তাহারা প্রায় স্বার্থপর ও অন্যের অনিষ্টকারক হইয়া উঠে। যৌবরাজ্য, যৌবন, প্রভুত্ব ও অতুল ঐশ্বর্য্য, এ সকল কেবল অনর্থপরম্পরা। অসামান্য-ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই ইহার তরঙ্গ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধিরূপ দৃঢ় নৌকা না থাকিলে উহার প্রবল প্রবাহে মগ্ন হইতে হয়। একবার মগ্ন হইলে আর উঠিবার সামর্থ্য থাকে না।

সদ্বংশে জন্মিলেই যে, সৎ ও বিনীত হয়, একথা অগ্রাহ্য।

উর্ব্বরা ভূমিতে কি কণ্টকীবৃক্ষ জন্মে না? চন্দনকাষ্ঠের ঘর্ষণে যে অগ্নি নির্গত হয়, উহার কি দাহশক্তি থাকে না? ভবাদৃশ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই উপদেশের যথার্থ পাত্র। মূর্খকে উপদেশ দিলে কোন ফল হয় না। দিবাকরের কিরণ স্ফটিকমণির ন্যায় মৃৎপিণ্ডে কি প্রতিফলিত হইতে পারে? সদুপদেশ অমূল্য ও অসমুদ্রসম্ভূত রত্ন। উহা শরীরের বৈরূপ্য প্রভৃতি জরার কার্য্য প্রকাশ না করিয়াও বৃদ্ধত্ব সম্পাদন করে। ঐশ্বর্য্যশালীকে উপদেশ দেয় এমন লোক অতি বিরল। যেমন গিরিগুহার নিকটে শব্দ করিলে প্রতিশব্দ হয়, সেইরূপ পার্শ্ববর্ত্তী লোকের মুখে প্রভুবাক্যের প্রতিধ্বনি হইতে থাকে, অর্থাৎ প্রভু যাহা কহেন, পারিষদেরা তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া অঙ্গীকার করে। প্রভুর নিতান্ত অসঙ্গত ও অন্যায় কথাও পারিষদদিগের নিকট সুসঙ্গত ও ন্যায়ানুগত হয়, এবং সেই কথার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া তাহারা প্রভুর কতই প্রশংসা করিতে থাকে। তাঁহার কথার বিপরীত কথা বলিতে কাহারও সাহস হয় না। যদি কোন সাহসিক পুরুষ ভয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কথা অন্যায় ও অযুক্ত বলিয়া বুঝাইয়া দেন, তথাপি তাহা গ্রাহ্য হয় না। প্রভু সে সময় বধির হন, অথবা ক্রোধান্ধ হইয়া আত্মমতের বিপরীতবাদীর অপমান করেন। অর্থ অনর্থের মূল। মিথ্যা অভিমান, অকিঞ্চিৎকর অহঙ্কার ও বৃথা ঔদ্ধত্য প্রায় অর্থ হইতেই উৎপন্ন হয়।

রাসেলাস।

গিরিগর্ভ অতি মনোহর! উহার চতুর্দ্দিক নানাবিধ তরু-মণ্ডলীতে আচ্ছন্ন, এবং গিরিনদীর তীরবিকসিত কুসুমে সর্ব্বদা আলোকময়। মন্দ মন্দ গন্ধবহ নানাবিধ গন্ধলতা কম্পিত করিয়া চতুর্দ্দিকে সুগন্ধ বিস্তার করিত, এবং প্রতিমাসে বৃক্ষের ফল পরিণত হইয়া ভূতলে পতিত হইত। বন্য ও পোষিত পশু মাঠের চতুর্দ্দিকে চরিয়া বেড়াইত, হিংস্র জন্তু তথায় আসিতে পারিত না। কোন দিকে গোমেষাদির পাল চরিতেছে, কোন দিকে হরিণ ও হরিণীগণ লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক ইতস্ততঃ দৌড়িতেছে, কোন স্থলে ছাগশাবক প্রস্তরের উপর লম্ফ ঝম্ফ দিয়া বেড়াইতেছে, কোন স্থানে গম্ভীরস্বভাব হস্তী তরুতলের ছায়ায় শয়ন করিয়া সুখে বিশ্রাম করিতেছে, কোথাও বা চঞ্চল কপিকুল এক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরের শাখায় লম্ফ দিয়া পড়িতেছে, দেখিতে পাওয়া যাইত। পৃথিবীর সমুদায় আশ্চর্য্য বস্তু তথায় সংগৃহীত হইয়াছিল। জগতের সমুদায় সুখ স্বচ্ছন্দ তথায় আসিয়া একত্রিত হইয়াছিল, সংসারের সমুদায় দুঃখ সন্তাপ তথা হইতে পলায়ন করিয়াছিল।

পুরাবৃত্তপাঠের উপকার।

কোন বিষয় বিশেষরূপে জানিতে হইলে তাহার কার্য্য অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হয়। মানবগণের বিশেষ বিবরণ

জানিতে হইলে তাহাদিগের কর্ম্ম দেখিতে হয়। তাহা হইলে আমরা জানিতে পারি, কোন্ কার্য্য ন্যায়ানুসারে সম্পাদিত হইয়াছে, কোন্ কর্ম্মই বা কেবল ইচ্ছানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এবং সেই সেই কর্ম্ম আরম্ভের প্রধান কারণই বা কি? বর্ত্তমান বিষয় যথার্থরূপে জানিতে হইলে অতীত বিষয়ের সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে হয়। কারণ, সকল জ্ঞানই তুলনাসাপেক্ষ। আর তুলনা করিয়া না দেখিলে ভবিষ্যৎ বিষয় কিছুই জানা যায় না। বিশেষতঃ বর্ত্তমান বিষয়ে মন অধিক ক্ষণ ব্যাপৃত থাকে না, আমরা সর্ব্বদা অতীত বিষয় স্মরণ করিয়া থাকি, এবং নিরন্তর অনাগত বিষয় চিন্তা করিয়া মনকে ব্যাপৃত রাখি। শোক, আনন্দ, অনুরাগ, ঘৃণা, আশা, ভয় প্রভৃতি ক্ষণে ক্ষণে আমাদিগের অন্তঃকরণে আবির্ভূত হয়। তাহার মধ্যে শোক ও আনন্দ, অতীত ঘটনার কার্য্যস্বরূপ। ভাবী ঘটনার সহিত আশা ও ভয়ের সম্পর্ক আছে। অনুরাগ ও ঘৃণাও অতীত বৃত্তান্ত অবলম্বন করে। যেহেতু, কারণ অবশ্যই কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী থাকে, সন্দেহ নাই।

বস্তুর বর্ত্তমান অবস্থা অতীত কারণের কার্য্যস্বরূপ। আমাদিগের যে সকল ভাল মন্দ ও সুখ দুঃখ ঘটে, তাহার কারণ সন্ধান করিতে আমাদিগের স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু পুরাবৃত্ত পাঠ ব্যতিরেকে উহা সুন্দররূপে সম্পন্ন হয় না। পুরাবৃত্ত পাঠদ্বারা আমরা অনেক জানিতে পারি, এবং বিপদ ও দুঃখনিবারণের অনেক উপায় শিখিতে পারি। যে সময়ে

আমাদিগের হস্তে কেবল আমাদিগেরই রক্ষণাবেক্ষণের ভার থাকে, সে সময় আমরা পুরাবৃত্তপাঠে অমনোযোগী হইলে, বুদ্ধিমানের কর্ম্ম করা হয় না। আর যদি আমাদিগের উপর রাজ্যরক্ষা ও প্রজাপ্রতিপালনের ভার সমর্পিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদিগের পুরাবৃত্ত না জানা অতি অন্যায় ও অনুচিত কর্ম্ম। যে হেতু ইচ্ছাপূর্ব্বক অনভিজ্ঞ থাকা অতি দোষের কথা, এবং অনিষ্টনিবারণের সদুপায় থাকিতেও তাহা অভ্যাস না করিয়া বিপদে পড়া অতি নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য।

পুরাবৃত্তের যে প্রকরণে মানবগণের মনোবৃত্তির উৎকর্ষ, তর্কশক্তির উন্নতি, বিজ্ঞানশাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি, চিন্তাশক্তিসম্পন্ন জীবের আলোক ও অন্ধকার স্বরূপ জ্ঞান ও অজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব, শিল্পবিদ্যার আবির্ভাব ও তিরোভাব, অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতমণ্ডলীর মত ও অভিপ্রায়পরিবর্ত্তের বিষয় বর্ণিত আছে, তাহা পাঠ করা নিতান্ত আবশ্যক। অন্যান্য প্রকরণ অপেক্ষা উহা সমধিক উপকারজনক ও সাতিশয় ফলোপধায়ক। যুদ্ধ ও আক্রমণের বিবরণ অবগত হওয়া রাজাদিগের বিশেষ কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু ঐ সকল বিষয়ে অনাদর করাও তাঁহার উচিত নয়। যাঁহাদিগের রাজ্যশাসন করিতে হয়, তাঁহাদিগেরও আপন আপন বুদ্ধিবৃত্তির সংস্কার করা আবশ্যক।

শিল্পচর্চ্চার ফল।

উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক ফলোপধায়ক। সংগ্রাম-

ভূমিতে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধকৌশল না দেখিলে সেনা হয় না, চিত্র লিখিতে অভ্যাস না করিলেও চিত্রকর হয় না। অন্যান্য গুরুতর কর্ম্ম প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু শিল্পবিদ্যা-প্রভাবে যে সকল বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা দেখিবার ইচ্ছা হইলে প্রায় সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যখন আমরা কোন অসামান্য আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করি, প্রথমতঃ আমাদিগের মনে বিস্ময় জন্মে। তদনন্তর কি উপাদানে ও কিরূপে সেই বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদিত হইয়াছে, আমরা তাহা জানিতে উৎসুক হই। তখন প্রখর বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি বিশেষ কাজে লাগে। তখন নব নব জ্ঞানও উদ্ভাবন দ্বারা অভিজ্ঞতা বিস্তীর্ণ হয়, যে শিল্পবিদ্যা মনুষ্যমণ্ডলী মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা প্রকাশিত হইতে পারে, এবং যে দেশে যে শিল্পবিদ্যা অপরিজ্ঞাত হইয়া আছে, তথায় তাহা পরিজ্ঞাত হইবারও সম্ভাবনা। অন্ততঃ আমরা প্রাচীন শিল্পবিদ্যার সহিত বর্ত্তমান শিল্পকৌশলের তুলনা করিয়া দেখিতে পারি, এবং ইদানীন্তন শিল্পকৌশলের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে সন্তুষ্ট হই, হ্রাস দেখিলে তাহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা পাই। এই সকল কারণবশতঃ স্থির হইতেছে যে, শিল্পবিদ্যাপ্রভাবে যে সকল অদ্ভুত বস্তু নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা স্বচক্ষে অবলোকন করা ও তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান লওয়া অতি আবশ্যক।

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

টেলিমেকস।

টেলিমেকসের মনোদুঃখ।

আমি উত্তর করিলাম, হায়! এক্ষণে রাজনীতি পর্য্যালোচনার প্রয়োজন কি! আমাদিগের ইথাকা নগরী প্রতিগমনের আশা নাই। জন্মাবচ্ছিন্নে আর জননী ও জন্মভূমি দেখিতে পাইব না! আর ইহাও একবারেই অসম্ভাবিত নয় যে, পিতা পরিশেষে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারেন; কিন্তু যদিই দৈবানুগ্রহবলে প্রত্যাগমন করেন, আর তিনি কখনই নন্দনালিঙ্গনরূপ অনুপম আনন্দরসের আস্বাদনে অধিকারী হইবেন না, এবং আমিও রাজ্যশাসনযোগ্য কাল পর্য্যন্ত পিতার আদেশানুবর্ত্তী থাকিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিতে পারিব না। দেবতারা আমাদিগের প্রতি অনুকম্পাশূন্য হইয়াছেন। অতএব হে প্রিয় বান্ধব! মৃত্যুই আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়স্কর, এক্ষণে মৃত্যুচিন্তা ব্যতিরিক্ত আর সকল চিন্তাই বৃথা। আমি শোকে এরূপ বিহ্বল হইয়াছিলাম, এবং কথনকালে মুহুর্মুহুঃ এমন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলাম যে, আমার বাক্য প্রায় বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু মেণ্টর উপস্থিত বিপদে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত হইয়াছেন এরূপ বোধ হইল না। তিনি কহিতে লাগিলেন, টেলিমেকস! তুমি মহাবীর ইউলিসিসের পুত্র বলিয়া

পরিচয় দিবার যোগ্য নহ। তুমি কি প্রতীকারচিন্তায় পরাঙ্মুখ হইয়া বিপদে অভিভূত হইবে? তুমি নিশ্চিত জানিবে, যেদিনে জননী ও জন্মভূমি পুনর্ব্বার তোমার নয়নগোচর হইবে, সেই দিন নিকটবর্ত্তী হইতেছে। ইহা তুমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে যে, যিনি অসাধারণ শৌর্য্যদ্বারা জগন্মণ্ডলে দুর্জ্জয় বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, যিনি, কি দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য, সকল সময়েই অবিকৃতচিত্ত, তুমি এক্ষণে যেরূপ বিপদে পতিত হইয়াছ, তদপেক্ষা ভীষণতর বিপদেও যিনি অক্ষুব্ধচিত্ত থাকেন ও তাদৃশ সময়েও যাঁহার ঈদৃশী প্রশান্তচিত্ততা থাকে যে, তদ্দর্শনে তুমি বিপৎকালে সাহসাবলম্বনের উপদেশ পাইতে পার, এবং যাঁহাকে এই সমস্ত অলৌকিক গুণসম্পন্ন বলিয়া তুমি কখন জানিতে পার নাই, সেই মহানুভব মহাবীর ইউলিসিস যশঃশশধরে জগন্মণ্ডল দেদীপ্যমান করিয়া পুনরায় সিংহাসনে অধিরোহণ করিবেন। এক্ষণে তিনি প্রতিকূলবায়ুবশে যে দূর দেশে নীত হইয়া আছেন, যদি তথায় তিনি শুনিতে পান, তাঁহার পুত্র পৈতৃক ধৈর্য্য ও পৈতৃক বীর্য্যের উত্তরাধিকারী হইতে যত্নবান নহেন, তাহা হইলে তিনি এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত ঘোরতরদুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া যে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন তদপেক্ষা এই সংবাদ তাঁহার পক্ষে নিঃসন্দেহ সমধিক ক্লেশাবহ হইবেক।

মিসরদেশের প্রাচীন অবস্থা।

তদনন্তর মেণ্টর কহিলেন, টেলিমেকস! দেখ মিসর দেশের কি অনুপম শোভা! দর্শনমাত্র বোধ হয়, কমলা সর্ব্বকাল বিরাজমানা আছেন। এই দেশে দ্বাবিংশতি সহস্র নগর; ঐ সকল নগরে কি সুন্দর শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত আছে; ধনবান দরিদ্রের উপর, ও বলবান দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিতে পারে না। বালকদিগের বিদ্যাভ্যাসের রীতি কি উত্তম! তাহারা বশ্যতা, পরিশ্রম, সদাচার, ও বিদ্যানুরাগ নিত্য অভ্যাস করিয়া থাকে। পিতা মাতারা ধর্ম্মনিষ্ঠা, নিঃস্বার্থ লোকহিতৈষিতা, সম্মানাকাঙ্ক্ষা, অকপট ব্যবহার, ও দেবভক্তি এই সমস্ত গুণের বীজ শৈশবকালাবধি স্বীয় স্বীয় সন্তানদিগের অন্তঃকরণে রোপণ করিতে আরম্ভ করেন। এই মঙ্গলকর নিয়মাবলী অনুধ্যান করিতে করিতে তাঁহার অন্তঃকরণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া আসিল। তখন তিনি কহিতে লাগিলেন, যে রাজা এইরূপ সুনিয়মে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করেন, তাঁহার প্রজারাই যথার্থ সুখী; কিন্তু যে ধর্ম্মপরায়ণ রাজার দয়াদাক্ষিণ্যগুণে অসংখ্য লোকের সুখ সংবর্দ্ধিত হয়, এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রবলতানিবন্ধন যাঁহার হৃদয়কন্দর নিরন্তর অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে উচ্ছলিত থাকে, তিনি তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক সুখী। তাঁহাকে দুরাচার নরপতিদিগের ন্যায় ভয় দেখাইয়া প্রজাদিগকে বশীভূত রাখিতে হয় না, প্রজারা নিজেই তাঁহার রমণীয় গুণগ্রামে মুগ্ধ ও প্রীত হইয়া বশীভূত থাকে, এবং তদীয় আজ্ঞা

প্রতিপালন করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করে। তিনি প্রজাগণের হৃদয়রাজ্যে আধিপত্য করেন। প্রজারা তাঁহাকে এরূপ স্নেহ ও ভক্তি করে যে, তাহাদিগের তদীয় রাজ্যভঙ্গের অভিলাষ করা দূরে থাকুক, তাহারা তাঁহার মর্ত্যতা চিন্তা করিয়া সাতিশয় কাতর হয়, এবং যদি আপন আপন জীবন দিলে রাজা চিরজীবী হইতে পারেন, তাহাতেও পরাঙ্মুখ হয় না।

রামকমল ভট্টাচার্য্য।

বেকন।

স্বাস্থ্যরক্ষা।

স্বাস্থ্যরক্ষার অনেক নিয়ম শাস্ত্রে উক্ত নাই, আপনিই বুঝিয়া লইয়া চলিতে হয়। সকলের ধাতু সমান নহে, এক প্রকার আচার সকলের সহ্য হয় না, সুতরাং কিরূপ আচার করিলে শরীর সুস্থ বা অসুস্থ হয়, ইহা অনেক স্থলে আপনাকেই অনুভব করিয়া লইতে হয়। যেরূপ আচার তোমার ধাতুতে সহিল না দেখিলে, তৎক্ষণাৎ তাহা পরিবর্জ্জন করিবে। কিন্তু এক্ষণে কিছু অনিষ্টকর হইতেছে না বলিয়া তোমার পক্ষে পথ্য মনে করিও না। যৌবনাবস্থায় রক্ত সতেজ থাকে, তখন কোন অত্যাচারের ফল হঠাৎ টের পাওয়া যায় না, কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় রক্তের জোর কমিলে সেই অত্যাচারের ফলস্বরূপ একেবারে নানা রোগে ধরে। আহারের বিষয়ে অকস্মাৎ পরিবর্ত্ত করিও না। যদি কখন এরূপ করা নিতান্ত আবশ্যক হয়, তবে অন্যান্য বিষয়েও অনুরূপ পরিবর্ত্ত দ্বারা সামঞ্জস্যরক্ষা করিবে।

আহার নিদ্রা শ্রম প্রভৃতির বর্ত্তমান ব্যবস্থানিবন্ধন যদি কোন অসুবিধা বোধ হয়, তবে অল্পে অল্পে তাহা পরিবর্ত্ত কর। আবার পরিবর্ত্তনিবন্ধন যদি অসুখ হয়, তবে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের মত ব্যবহার করিবে। তোমার ধাতুতে কি সহ্য বা অসহ্য হয়, তুমি ভিন্ন অন্যের তাহা বুঝিবার ক্ষমতা নাই। ব্যায়াম আহার

ও নিদ্রার সময় প্রসন্ন ও প্রফুল্ল থাকা অতি আবশ্যক। উৎকট ভয়, উদ্বেগ, দ্বেষ, অসূয়া, ক্রোধ, দৌর্ম্মনস্য, চিন্তা ও অতিশয়োল্লাস প্রযত্নপূর্ব্বক পরিহার করিবে। এক প্রকার আমোদে ব্যসনী হইও না। বিবিধ কলা চিত্র ইতিবৃত্ত ও উপাখ্যান প্রভৃতি সাত্ত্বিক আমোদ দ্বারা চিত্ত প্রফুল্ল রাখিবে। যে সকল উদাত্ত বিষয় পর্য্যালোচনে মন বিকসিত ও বিস্ফারিত এবং চমৎকাররস উচ্ছলিত হয়, তাহাতেও মনোনিবেশ করিবে। একেবারেই ঔষধ পরিবর্জ্জন করিও না, তাহা হইলে নিতান্ত আবশ্যক হইলেও ঔষধ খাটিবে না। আবার চিরকাল ঔষধ খাওয়া অভ্যাস করিলে পীড়ার সময় ঔষধে কিছু ফলোদয় হইবে না। ঔষধসেবনের অভ্যাস না রাখিয়া আহারের ব্যবস্থাবিষয়ে সবিশেষ সাবধান থাকা উচিত। পথ্যাশনে প্রাচীন রোগের যেরূপ উপশম হয়, ঔষধে সেরূপ নয়।

শরীরে কোন আকস্মিক বৈগুণ্য দেখিলে তুচ্ছ জ্ঞান করিও না, তদ্বিষয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তির মত অনুসন্ধান করিবে। পীড়ার সময় শুদ্ধ আরোগ্য লাভই পরমার্থ মনে করিবে, তখন ক্ষণিক সুখানুরোধে অপথ্য বিষয়ে লোভ করিও না। সুস্থদশায় শ্রমে বিমুখ হইও না। শরীর কষ্টসহ হইলে কোন রোগেই কাবু করিতে পারে না।

স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইবে, কিন্তু রাত্রিজাগরণেরও অভ্যাস রাখিবে। পর্য্যাপ্ত ভোজন করিবে, কিন্তু লঙ্ঘনেও কাতর হইবে না। প্রতিদিনই শ্রম করিবে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে বিরামেরও

অভ্যাস রাখিবে। এইরূপ দ্বন্দ্ব আচরণই আয়ুষ্য ও স্বাস্থ্যকর। অনেক চিকিৎসক আরোগ্যের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া শুদ্ধ রোগীর রুচির অনুবৃত্তি করে। আবার কেহ কেহ রোগীর ধাতু ও প্রকৃতি-বিশেষের অনুরোধে শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতির রেখামাত্রও অতিক্রম করে না। উভয়েই নিন্দনীয় ও অকর্ম্মণ্য। একজন মধ্যবৃত্তি চিকিৎসক বাছিয়া লও। যদি একজন না মিলে, তবে দুই প্রকার দুইজন মনোনীত কর। চিকিৎসক মনোনীত করিবার সময় হাতযশের গৌরব করিও না। তোমার ধাতুবিশেষ বুঝিতে অসমর্থ হইলে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরিও কিছু করিতে পারিবেন না।

সন্তান।

সন্তানে নানাপ্রকার সুখ আছে বটে, কিন্তু অসুখও বিস্তর। আত্মবিম্বস্বরূপ কতিপয় কুলতন্তু সংবেষ্টিত হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে অন্তঃকরণে একপ্রকার স্বসংবেদ্য সন্তোষ সন্তানিত হয়। কিন্তু আবার সন্তান রুগ্ন দুর্বৃত্ত বা অবশ্য হইলে সংসার ক্লেশাগার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অতি গুণবান ও প্রিয়ম্বদ হইলে নানা অস্বস্তিশঙ্কায় সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত থাকিতে হয়, কখন্ কি হয় এরূপ উদ্বেগ অনুক্ষণ অন্তঃকরণে জাগরূক থাকে। সন্তান থাকিলে সাংসারিক ব্যাপারে পরিশ্রম করিতে কষ্টবোধ হয় না, কিন্তু দুঃখের দশায় সন্তানের দুঃখ দেখিলে নিজ দুঃখ বিগুণতর বোধ হয়। সন্তান থাকিলে সাংসারিক চিন্তা ও উদ্বেগ অনেক পরিবর্দ্ধিত হয়, আবার সন্তান জীবিতবান

রাখিয়া মরিতে পারিলে মৃত্যুভয় অনেক লঘূকৃত হয়। সন্তানবান অপেক্ষা নিঃসন্তান লোকদিগকে অনেকমহৎকর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহাদিগের বাহ্য শরীরের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় নাই, অধিকাংশ তাঁহারাই অন্তঃকরণের প্রতিবিম্বস্বরূপ যশ অনুষ্ঠানে চিরস্মরণীয় চিহ্ন দেদীপ্যমান রাখিয়া লোকান্তরিত হয়েন। নিরপত্যেরা প্রায় দেবালয় বিদ্যালয় আবসথ আরোগ্যশালা প্রভৃতি পরমার্থানুষ্ঠানার্থ বিত্ত বিনিয়োগ করেন।

বহুসন্তান স্থলে পিতা মাতা সকলকে সমান স্নেহ করেন না। বিশেষতঃ মাতা সন্তানবিশেষে অন্যায় পক্ষপাত প্রকাশ করেন। পিতার প্রযত্নে পুত্র শ্রুতশালী হয়, এবং মাতার আদরেই দুর্ললিত ও দুর্ব্যসনাসক্ত হয়। বহুসন্তান স্থলে দুই তিনটী মাত্র জনয়িতৃজনের বহুমানভাজন হয়। অবরজগুলি একান্ত দুর্ললিত ও অবিধেয় হয়, কিন্তু অনতিলালিত ও উপেক্ষিতপ্রায় সন্তানগুলি বড় হইয়া পরিণামে লোকসমাজে গণনীয় হইয়া থাকে।

সকল স্থলেই সন্তানের আব্দার শুনা অপরামর্শ বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ে নিতান্ত কার্পণ্য প্রকাশ করাও উচিত নহে, তাহা হইলে নীচের সহিত সংসর্গ, অপহরণে আসক্তি ও নানা কুস্থিতিকল্পনায় প্রবৃত্তি জন্মে। বাল্যকাল অতি কৃচ্ছ্রে অতিবাহিত হইলে পর যৌবনে বিষয় হস্তগত হইলে অত্যন্ত উশৃঙ্খলতা জন্মে, তখন চিরনিরুদ্ধ ভোগেচ্ছা উদ্দামরূপে বিজৃম্ভিত হইয়া একেবারে নানা দোষ আসিয়া ধরে। অতএব বালস্বভাবসুলভ কোন

কোন মনোরথ সাধন করা বিধি। যে পিতা মাতা, যে সেবক, বা যে শিক্ষক, বিনয়নোদ্দেশে ভ্রাতৃগণের মধ্যে অন্যোন্যজিগীষা বা স্পর্দ্ধা উত্তেজিত করে, তাহারা অতি নির্ব্বোধ। উহাতে তৎকালে সৌভ্রাত্র উন্মূলিত হইয়া উত্তরকালে গৃহবিচ্ছেদের বীজ বিক্ষিপ্ত হয়। পিতার উচিত, পুত্রের বাল্যাবস্থায় আয়তি আলোচনাপূর্ব্বক অভিমত বৃত্তি বা ব্যবসায় মনোনীত করেন, এবং তখনই তদনুরূপ শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করেন। তখন প্রকৃতি অতি কোমল থাকে, অক্লেশেই অভীষ্ট বিষয়ে লওয়াইতে পারা যায়। তখন বালকের অভিরুচি, বা প্রকৃতিবিশেষের ঐকান্তিক অনুরোধ রক্ষা করা অকর্ত্তব্য। তৎকালে এমত মনে করা উচিত নয় যে, বালকের রুচি যে দিকে নিসর্গতঃ প্রধাবিত হয়, সে তাহা অনায়াসে পরিপক্করূপে শিক্ষা করিবে। বালকের স্বভাব অতি চঞ্চল, কোন বিষয়ে নিশ্চল বা দৃঢ় অভিনিবেশ থাকে না, সুতরাং তখন কোন বিষয়ে ক্ষণিক অভিনিবেশবিশেষদর্শনে প্রকৃতিবিশেষ অনুমান করিয়া তাহার পরকালে জলাঞ্জলি দেওয়া অতি মূঢ়ের কর্ম্ম। কিন্তু যদি স্থলবিশেষে অসন্দিগ্ধ লিঙ্গ দ্বারা তাহার প্রবৃত্তিবিশেষ অতি উল্বণ বোধ হয়, সেখানে তাহার কোনরূপ প্রতিরোধ করা বিধেয় নহে। কিন্তু সামান্যাকারে এরূপ নিয়ম নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, যে বৃত্তি অবলম্বন করিলে উত্তরকালে বিপুল বিভব ও মানসম্ভ্রম উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে, অতি যত্নপূর্ব্বক সন্তানকে তাহাতেই নিয়োজিত করা উচিত, উহা প্রথমে তাহার কষ্টসাধ্য হইলেও অভ্যাসবশতঃ ক্রমে সুসাধ্য ও সহজ হইবে।

লিস্‌বনের ভূমিকম্প।

লিস্‌বন নগরে, ১৭৫৫ অব্দের ১ লা নবেম্বরের পূর্ব্বাহ্নের ন্যায় মনোহর পূর্ব্বাহ্ন আর কখনই নয়নগোচর হয় নাই। আকাশমণ্ডল সম্পূর্ণস্থিরভাবাপন্ন ও নির্ম্মল। অংশুমালী অতি উজ্জ্বল প্রভায় অংশুজাল বিস্তার করিতেছিলেন। দুর্ঘটনার কোন লক্ষণই নাই; কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই এই সুবিস্তৃত জনপূর্ণ সমৃদ্ধ নগর এককালে ভীষণ সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিল।

ঐ দিন বেলা নয় ঘটিকার পর, আমি একখানি পত্র লিখিতেছিলাম। পত্র লেখা সমাপ্ত হইবামাত্র সহসা আমার সম্মুখস্থ টেবিলটী বিলক্ষণ কম্পিত হইতে লাগিল দেখিয়া বিস্মিত হইয়া উঠিলাম। তৎকালে বায়ুর কিছুমাত্র সঞ্চার ছিল না; তবে কি কারণে এরূপ ঘটনা উপস্থিত হইল চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে আমার আবাসবাটীর মূল অবধি অগ্রভাগ পর্য্যন্ত কম্পিত হইতে লাগিল। আমি প্রথমে স্থির করিলাম যে, বাটীর পার্শ্বস্থ পথে যে সকল শকটশ্রেণী চালিত হইতেছে, তাহাদেরই চক্রধ্বনি দ্বারা এরূপ কম্প উপস্থিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, দূরস্থবজ্রধ্বনিসদৃশ এক ভীষণ শব্দ ভূমির অভ্যন্তর হইতে উত্থিত হইতেছে। প্রায় তিন পল অতীত হইল, তথাপি উহার নিবৃত্তি হইল না। তখন আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, উহা ভূমিকম্পেরই সম্পূর্ণ লক্ষণ।

অনন্তর হস্তস্থিত লেখনী টেবিলের উপর রাখিলাম। আমার সমুদায় শরীর চকিত হইয়া উঠিল। তখন আমি, এই গৃহমধ্যেই অবস্থিতি করি, কি বহির্গত হইয়া পথের দিকে ধাবমান হই, এইরূপ চিন্তা করিতেছিলাম, এমন সময়ে এক অত্যন্ত ভয়ানক শব্দ উত্থিত হইল। উহাতে আমি এক কালে নিস্তব্ধ হইলাম; ভাবিলাম যেন, নগরস্থ যাবতীয় অট্টালিকাই যুগপৎ ভূমিসাৎ হইল। আমার আবাসবাটী এরূপ ভীষণবেগে দোলায়িত হইতে লাগিল যে, প্রতিক্ষণেই উহার উপরিস্থ তলের অচিরপাতের আশঙ্কা করিতে লাগিলাম। আমি ঐ বাটীর সর্ব্বনিম্নস্থ তলে বাস করিতাম, সুতরাং উহার তাদৃশ শীঘ্রপতনের শঙ্কা উপস্থিত হইল না। কিন্তু আমার গৃহস্থিত সমুদায় সামগ্রীই স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। পদতল কোন ক্রমেই ভূতলে স্থিরভাবে রহিল না।

যখন গৃহের ভিত্তিসকল ভয়ানকভাবে ইতস্ততঃ দোলায়মান হইতে লাগিল; যখন ভিত্তির অনেক স্থান বিদীর্ণ ও সেই সমস্ত বিদীর্ণ স্থান হইতে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সকল স্খলিত হইতে লাগিল, যখন অধিকাংশ বরগার প্রান্তভাগ ভিত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, তখন, এখনই আমায় চূর্ণীভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে, কেবল ইহাই স্থির করিলাম। ক্ষণকালমধ্যে বিপর্য্যস্ত সৌধোত্থিত ধূলিরাশি নিবিড় ঘনঘটার ন্যায় গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। দিগ্বলয় এরূপ অন্ধতমসে আবৃত হইল যে, আর কোন বস্তুই স্পষ্ট দৃষ্ট হয় না। ভূতল

হইতে এত অধিক গন্ধকের বাষ্প উঠিতে লাগিল যে, প্রায় অর্দ্ধ দণ্ড কাল আমার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে যখন ক্রমশঃ ভূকম্পের ভীষণতার অনেক হ্রাস হইয়া আসিল, এবং ঘনতর তিমিররাশি অল্পে অল্পে বিরল হইয়া পড়িল, তখন দেখি যে, ধূলিধূসরিত, ভয়বিবর্ণ ও কম্পান্বিতকলেবর এক স্ত্রী একটী শিশুসন্তান ক্রোড়ে লইয়া আমার গৃহতলে উপবিষ্ট রহিয়াছে। দেখিবামাত্র আমি বিস্মিত হইয়া উঠিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কে? কিরূপে এখানে উপস্থিত হইয়াছ? সে ভয়ে এমনই অভিভূত, যে, আমার প্রশ্নের কোন উত্তরই প্রদান করিতে পারিল না; কেবল অতি কাতরস্বরে কথঞ্চিৎ আমাকে এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়! আপনি কি বোধ করেন আজি পৃথিবীর প্রলয় কাল উপস্থিত?" এই কথা বলিতে বলিতেই আবার বলিয়া উঠিল, মহাশয়! এ কি, আর যে নিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পারি না, তৃষ্ণায় হৃদয় বিদীর্ণপ্রায়, যদি আপনি কৃপা করিয়া কিঞ্চিৎ জল প্রদান করেন, তবেই রক্ষা। তখন আমি জল কোথায় পাইব, সুতরাং তাহাকে কহিলাম, ইহা পিপাসাশান্তিচিন্তার সময় নহে, জীবনরক্ষার উপায়চিন্তনে তৎপর হও, এই বাটী আমাদের মস্তকে পতিত হইয়াছে বলিলেই হয়, দ্বিতীয় বার কম্পন উপস্থিত হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে ভূমধ্যে প্রোথিত করিবে, আইস এখান হইতে পলায়ন করি।

এই কথা বলিয়া আমি সত্বর সিঁড়ীর নীচে ধাবমান হইলাম,

সেই ভয়বিহ্বল অবলাও আমার বাহু অবলম্বন করিয়া অনুগমন করিতে লাগিল। যে পথটী বাটী হইতে সরল ভাবে টেগস্ নদীতীরে মিলিত হইয়াছে, আমরা সেই পথই অবলম্বন করিয়া চলিলাম। কিয়দ্দূর যাইয়া দেখি যে, রাশীকৃত পতিত গৃহের ভগ্নাবশেষে উহা একবারে রুদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং আমাদিগকে অগ্রসরণে বিরত ও পশ্চাদ্গমনে প্রবৃত্ত হইতে হইল। যাইতে যাইতে এক প্রকাণ্ড ভগ্নাবশেষ স্তূপের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম, তখন আমাকে আত্মরক্ষা অপেক্ষা সেই শিশু-সন্তান-ধারিণী অবলার জীবনরক্ষার্থ সমধিক যত্নশালী হইতে হইল। বহুকষ্টে তাহাকে স্তূপ অতিক্রম করাইলাম, এবং পূর্ব্ব-বৎ সমভিব্যাহারে লইয়া চলিলাম। কিয়দ্দূর যাইয়া এমন এক স্থানে উত্তীর্ণ হইলাম, যে, যুগপৎ হস্ত ও পদ উভয়েরই সাহায্য ব্যতিরেকে উহা অতিক্রম করিতে পারা যায় না। তখন আমি অনুযায়ী স্ত্রীলোকটীকে কহিলাম, তোমাকে এই স্থানেই রুদ্ধ থাকিতে হইল, ইহা হইতে তোমার উদ্ধারসাধন আমার সাধ্যা-য়ত্ত নহে। এই বলিয়া আমি অগ্রে গমন করিতে লাগিলাম, সুতরাং সেই অবলাকে তথায় থাকিতে হইল। আমি হস্তদ্বয়-পরিমিত স্থান অতিক্রম করিতে না করিতে একটী দোলায়মান ভিত্তি হইতে এক প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড পতিত হইয়া ঐ দুর্ভাগ্য নারী ও তাহার শিশু সন্তান উভয়কেই চূর্ণীভূত করিল।

অনন্তর আমি এক সঙ্কীর্ণ দীর্ঘ পথে উপনীত হইলাম। দেখিলাম, উহার উভয় পার্শ্বস্থ সকল অট্টালিকাই চতুস্তল বা

পঞ্চতল পরিমিত উন্নত; সমুদায় গুলিই অতি পুরাতন, তন্মধ্যে অধিকাংশই পতিত দেখিলাম; কতকগুলি পতিত হইতে হইতে পথিকদিগের প্রতিপদেই মৃত্যুভয় প্রদর্শন করিতেছে; সম্মুখে অনেকগুলি পথিকের শব পতিত দেখিলাম; আহা! আহা! আর কতকগুলি পথিক এরূপ শোচনীয়ভাবে পিষ্ট ও ক্ষত-বিক্ষতশরীর হইয়াছে যে, তাহারা কোন ক্রমেই উপস্থিত সাক্ষাৎ কালান্তকের হস্ত অতিক্রম করিবার নিমিত্ত এক পদও চলিতে পারিতেছে না।

যাহা হউক, আত্মরক্ষাই প্রকৃতির প্রথম নিয়ম, সুতরাং আমি যথাশক্তি দ্রুত গমন করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে সেণ্টপলের গির্জার সম্মুখস্থ এক প্রশস্ত ভূভাগে উত্তীর্ণ হইয়া এক প্রকার নিরাপদ হইলাম। আমার উপস্থিতির কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে গির্জাটী ভূতলশায়ী হইয়া বহুসংখ্যক জীবের জীবনসংহার করিয়াছে। আমি অল্পক্ষণ মাত্র তথায় দণ্ডায়মান হইয়া অতঃপর কি কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলাম। নদীতীরই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান স্থির করিয়া গির্জার পশ্চিমপার্শ্বস্থ রাশীকৃত ভগ্নাবশেষের উপর দিয়া কথঞ্চিৎ তটিনীতটে উত্তীর্ণ হইলাম, দেখিলাম, নানাশ্রেণীস্থ অসংখ্য স্ত্রীপুরুষ তথায় সমবেত হইয়াছে; সকলেরই মুখ মৃত্যুভয়ে বিবর্ণ; প্রত্যেকেই জানুপাত পূর্ব্বক বক্ষস্তাড়ন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে পরমেশ্বরের নিকট রক্ষা প্রার্থনা করিতেছে।

জীবিতরক্ষায় হতাশ্বাস হইয়া সকলেই এইরূপ কাতরধ্বনি

করিতেছে, এমন সময়ে দ্বিতীয়বার ভূকম্প আরম্ভ হইল। যদিও ঐ কম্পন অপেক্ষাকৃত অল্প ভীষণভাবে আবির্ভূত হইল, তথাপি উহার আঘাতদ্বারা পতিতাবশিষ্ট যাবতীয় দোলায়মান অট্টালিকাই এককালে উন্মূলিত হইয়া পড়িল, নগরের চতুর্দ্দিকেই করুণ কোলাহল উত্থিত হইল। ঐ সময়েই আবার একটী পল্লীস্থ গির্জা পতিত হইয়া বহুসংখ্যক হতভাগ্যের অপমৃত্যু সাধন করিল। ঐ কম্পনের বেগ এরূপ তীব্র যে, কোনক্রমেই স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকা যায় নাই।

"ঐ সমুদ্রজল আসিতেছে, আর রক্ষা নাই, এখনই সকলকে বারিপ্রবাহে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে," হঠাৎ এইরূপ ভয়ঙ্কর কাতরধ্বনি শুনিতে পাইলাম। আমি নদীকূলের যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিলাম, তথায় স্বভাবতঃ নদীর বিস্তার প্রায় দুই ক্রোশ। ঐ সময়ে নদীর আকার দেখিয়া বোধ হইল যে, উহার জল অত্যন্ত স্ফীত হইয়াছে। কিন্তু তখন তথায় কিছুমাত্র বায়ুসঞ্চার ছিল না, অনতিদূরে দেখিতে পাইলাম, এক প্রকাণ্ড পর্ব্বতাকার উত্তুঙ্গ সলিলরাশি ভীষণ শব্দ ও প্রভূত ফেনোদ্গিরণ করিতে করিতে অতি তীব্রবেগে তীরাভিমুখে ধাবমান হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ আমরা সকলেই প্রাণপণে পলাইতে আরম্ভ করিলাম। অতি অল্প দূর যাইতে না যাইতেই ঐ বারিপ্রবাহ আমাদিগের উপর পতিত হইল, এবং ক্ষণ মধ্যেই অনেক হতভাগ্যকে সমভিব্যাহারে লইয়া ঐরূপ বেগেই স্বস্থানে প্রস্থান করিল। আমি ভাগ্যক্রমে একখানি কড়িকাঠ পাইয়া-

ছিলাম। প্রবাহের আগমন পর্য্যন্ত দৃঢ়রূপে উহা আলিঙ্গন করিয়া অবশ্যম্ভাব্য অপমৃত্যুর হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা পাই-লাম।

অনন্তর জল ও স্থল সর্ব্বস্থানেই সমান বিপদ উপস্থিত দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইলাম, এবং জীবনরক্ষার্থ কোথায় যাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। পরিশেষে সেণ্টপলের গির্জাপ্রাঙ্গণে ফিরিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিয়া তৎ-ক্ষণাৎ তদভিমুখে সত্বর প্রস্থান করিলাম। উপস্থিত হইয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সেই স্থানেই রহিলাম। দেখিলাম, সম্মুখবর্ত্তী নদীমধ্যে যাবতীয় পোত প্রচণ্ডবাত্যাহতের ন্যায় নিরন্তর উৎক্ষিপ্ত ও নিক্ষিপ্ত হইতেছে, কতকগুলি পোত ছিন্নবন্ধন হইয়া নদীর অপর পারে ভাসিয়া যাইতেছে; কতকগুলি প্রবল-বেগে ঘূর্ণিত হইতেছে; আর কতকগুলি বৃহৎ পোত এককালে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তখন তথায় কিছুমাত্র বায়ুর প্রবলতা লক্ষিত হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে কতকগুলি পোতা-ধ্যক্ষের মুখে শুনিলাম যে, যে সময়ে আমি পোতশ্রেণীর উক্ত-রূপ দুর্গতি দেখিতেছিলাম, সেই সময়ে তথা হইতে প্রায় আধ পুয়া দূরে একটী নূতন প্রস্তরবদ্ধ সুদৃঢ় তীরভূমি এককালে জলসাৎ হইয়াছিল। নিরাপদ ভাবিয়া বহুসংখ্যক লোক ঐ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তিও জলরূপী কালের করালগ্রাস হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। ঐ সময়ে আরও কতকগুলি লোক জীবনরক্ষার্থ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ

নানাপ্রকার নৌকায় আরোহণ করিয়াছিল; কিন্তু সেই সমস্ত হতভাগ্যজীবপূর্ণ যাবতীয় নৌকাই ভীষণ আবর্ত্ততুল্য প্রবল জলস্রোতে নিমগ্ন হয়। পোতাধ্যক্ষগণের মধ্যে এক ব্যক্তি কহিলেন যে, দ্বিতীয় কম্পনকালে বাত্যাহত সমুদ্রের ন্যায় সমুদায় নগরটী এক এক বার পশ্চাৎ ও এক একবার সম্মুখে চালিত হইয়াছিল, এবং নদীগর্ভে ভূকম্পের এরূপ প্রাদুর্ভাব উপস্থিত হইয়াছিল যে, যাবতীয় নোঙ্গর এককালে ভাসিয়া উঠিল, আর সেই সময়েই নদীর জল সহসা প্রায় ১৩।১৪ হাত স্ফীত হইয়া ক্ষণমধ্যেই পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ হইল।

যে স্থানে উক্তরূপ ঘটনাগুলি উপস্থিত হয়, আমি অল্পদিন পরে তথায় যাইয়া দেখি যে, কয়েকদিন পূর্ব্বে যেস্থানে পাদচারণ করিয়া পরম সুখানুভব করিয়াছিলাম, তাহার কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। সমুদয় স্থানই জলময় হইয়াছে, বিশেষতঃ কোন কোন স্থানে জলের গভীরতা এত অধিক যে, তাহার পরিমাণ করাই দুঃসাধ্য।

আমার সেণ্টপলের গির্জাপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবার অল্পক্ষণ পরেই তৃতীয় বার ভূকম্প উপস্থিত হয়! ঐ কম্পন পূর্ব্ব পূর্ব্ব কম্পন অপেক্ষা অতি অল্পই প্রবল বোধ হইল; তথাপি অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইলাম যে, ঐ কম্পন দ্বারা সমুদ্রজল অতি তীব্রবেগে তীরে উত্থিত হইয়া ঐরূপেই অধঃপতিত হইয়াছিল। তাহাতে যে সকল পোত প্রভৃত জলের উপরিভাগে ভাসমান ছিল, তৎসমুদায় এক কালে শুষ্ক ভূমির উপর উত্থাপিত হয়।

পাঠকগণ! আপনারা এই যৎসামান্য প্রস্তাব পাঠ করিয়া উল্লিখিত সংহারদিনের যাবতীয় দুর্ঘটনার বর্ণনা শেষ হইল এমন মনে করিবেন না। বস্তুতঃ উক্ত দিনের সমুদায় বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণন করিতে হইলে এক খানি গ্রন্থ লিখিতে হয়। যাহা হউক আমরা আর একটী অতি বিস্ময়কর ব্যাপারের উল্লেখ না করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতে পারিতেছি না।

উক্ত দিন প্রদোষকালে, বিরল তিমিরজাল যেমন অল্পে অল্পে দিগ্‌বলয় আবরণ করিল, অমনি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য আমাদের নয়নপথে পতিত হইল। সমুদায় নগর এককালে অতি উজ্জ্বল আলোকমালায় আকীর্ণ হইয়া উঠিল। এমন কি ঐ আলোকে অনায়াসে পুস্তকাদি পাঠ করিতে পারা যাইত। দেখিতে দেখিতে নগরের শত শত স্থান হইতে যুগপৎ শত শত অগ্নিশিখা সমুত্থিত হইল। হতাবশিষ্ট হতভাগ্য নগরবাসীরা উপর্য্যুপরি আকস্মিক বিপৎপাত দর্শনে ভয়ে এরূপ অভিভূত হইয়া পড়িল, যে উহার নির্ব্বাপণার্থ কিছুমাত্র চেষ্টা করিতে পারিল না। সুতরাং ঐ অব্যাহত হুতাশন ক্রমাগত ছয় দিবস কাল সমভাবে জ্বলিতে লাগিল। এক দিন এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও উহার বিরাম ছিল না। ঐ অনিবার্য্য অগ্নি ছয় দিনে নগরের যাবতীয় পতিতাবশিষ্ট গৃহ সকল একবারে ভস্মীভূত করিল।

আমি প্রথমে মনে করিলাম, ভূকম্পকালসুলভ ভৌমাগ্নি উত্থিত হইয়াই এই সর্ব্বনাশ সাধন করিল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইলাম যে, নরেশ্বর

মাসের প্রথম দিন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের এক অতি পুণ্য পর্ব্বাহ। ঐ দিবস সন্ধ্যাকালে নগরবাসিগণ যাবতীয় দেবালয়ে আলোক প্রদান করে, তন্মধ্যে একটি গির্জ্জার ২০টী দীপ প্রদত্ত হয়; সন্ধ্যার পূর্ব্বে যে তৃতীয় ভূকম্পন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারই আঘাতে শেষোক্ত গির্জ্জাস্থিত মশারি, যবনিকা, গবাক্ষ প্রভৃতি দাহ্য পদার্থে অগ্নি সংলগ্ন হয়, সুতরাং তৎসমুদায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। অনন্তর ঐ দহ্যমান দেবালয় হইতে প্রবলতর অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া সন্নিহিত গৃহান্তরে সংলগ্ন হয়। এই রূপে ক্রমে ক্রমে পতিতাবশিষ্ট যাবতীয় অট্টালিকাই ভস্মীভূত হইয়া যায়।

উল্লিখিত ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতে ষষ্টি সহস্রেরও অধিক লোক দগ্ধ ও ভূমধ্যে প্রোথিত হইয়াছিল। এই ভয়ঙ্কর ভূকম্পন দ্বারা অতি বিস্তৃত সমৃদ্ধ লিস্‌বন নগর এক কালে ভগ্নাবশেষে পরিণত হয়। আহা! তখন আর তথায় ধনী ও দরিদ্রের কিছুমাত্র বিভিন্নতা ছিল না, যে সকল সম্পন্ন পরিবার এই দুর্ঘটনার পূর্ব্ব দিন পরম সুখে কালযাপন করিয়াছিলেন, পর দিনই সেই সকল পরিবারকে একবারে প্রান্তরচারী হইতে হইয়াছিল, তখন তথায় এমন কেহই ছিল না যে,তাঁহাদিগকে কোন রূপ সাহায্য প্রদান করিতে পারে।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

প্রাকৃত ভূগোল।

মনুষ্য।

যদ্যপি সকল মনুষ্য একপ্রকার সভ্য নহে, তথাপি তাহারা পৃথিবীস্থ অন্য সকল প্রাণী হইতে আপনাদের উৎকৃষ্টত্ব সংস্থাপিত করিয়া আসিতেছে। মনোগত ভাব বাক্যদ্বারা অন্যকে জ্ঞাত করিবার ক্ষমতা, বিচারশক্তি, ঈশ্বরনিরূপকজ্ঞান প্রভৃতি গুণ মনুষ্য ভিন্ন আর কোন প্রাণীর নাই। অপর, একত্র বাসাদিরূপ সভ্যতার সম্পূর্ণ ফলও মনুষ্যব্যতীত কোন প্রাণী প্রাপ্ত হয় না; তথা, স্ব স্ব পরীক্ষাদ্বারা উপলব্ধ জ্ঞান স্ব স্ব পুত্রপৌত্রাদিকে প্রদান করাও মনুষ্যেরই অসাধারণ ধর্ম্ম। এই সকল অসামান্য ধর্ম্মদ্বারা, বিশেষতঃ সম্প্রদায়ভুক্ত থাকিয়া, মনুষ্য পশুসকলকে আপনাদের অধীনে ও ব্যবহারে আনিয়া তাহাদিগের উপর প্রভুত্ব স্থির রাখিয়াছে। অধিকন্তু, মনুষ্য স্বভাবতঃ দুর্ব্বল ও কঠোর শীত গ্রীষ্ম সহ্য করিতে অক্ষম হইয়াও ঐ ক্ষমতাবলে পরীক্ষালব্ধ উপায়দ্বারা সকল আপদ নিরাকৃত করিয়া পৃথিবীর সকল স্থানে আধিপত্য করিতেছে।

পশুরা স্বাভাবিক সংস্কার অর্থাৎ পরীক্ষাদ্বারা অনর্জ্জিত স্বভাবদত্ত জ্ঞানশক্তির সহকারে আপন আপন দেহযাত্রা নির্ব্বাহিত করে। মনুষ্য কেবল স্বাভাবিক সংস্কারের অধীন নহে; এবং ঐ সংস্কার ও মনুষ্যেতে উত্তমরূপে ব্যক্ত হয় না। মনুষ্যের জ্ঞান ও শিক্ষা পরীক্ষার ফল। পরের শিক্ষা কিম্বা আপনার

পরীক্ষা ভিন্ন অন্যোপায়ে মনুষ্য ভাষা ও লিপিদ্বারা এককালের প্রকাশিত সুনিয়মসকল অপর কালে অনায়াসে জানিতে পারাতে, পরীক্ষা না করিয়া তত্তন্নিয়মের ফলভোগ করিতে সক্ষম হওয়াতে ক্রমশঃ অতি উত্তমরূপে উন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে। পশুরা কেবল স্বাভাবিক সংস্কারদ্বারা চালিত ও স্ব স্ব পরীক্ষার ফল প্রচার করিতে অক্ষম হওয়াতে সর্ব্বদা একাবস্থায় থাকে, তাহাদিগের বুদ্ধির হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। প্রথম সৃষ্ট মৌমাছী যে প্রকার নিপুণতার সহিত চাক বানাইয়াছিল, এইক্ষণকার মৌমাছীরাও তন্নির্ম্মাণে তাহা হইতে অধিক নৈপুণ্য প্রকাশ করে না। ঐ নৈপুণ্য ও তাহাদের পরীক্ষার ফল হইতে সমুৎপন্ন নহে;—কেবল স্বভাবদত্তজ্ঞানসম্ভূত। পরীক্ষার ফল হইলে তাহার ক্রমশঃ উন্নতি হইত, তাহা না হইয়া মৌচাকের দোষ গুণ সর্ব্বদা সমভাবে আছে। মনুষ্যের রীতি তদ্রূপ নহে। দেখ, প্রাচীন অসভ্য ব্রিটনদিগের কুটীর হইতে এইক্ষণকার সভ্য ইংরাজদিগের অট্টালিকা কত সহস্র গুণে উত্তম।

মনুষ্য সর্ব্বত্র উন্নতীচ্ছু হইবাতে স্থানভেদে সভ্যতার তারতম্য হইয়া থাকে। আদৌ মনুষ্য বনে মৃগয়াদ্বারা মাংস ও তদ্রত্য বৃক্ষের ফল আহরণ করিয়া তদবলম্বনেই কালযাপন করে; এবং সর্ব্বদা পশুর অন্বেষণে ব্যস্ত থাকিয়া আপন আপন অপত্যদিগকে শিক্ষা দিবার ও বিদ্যার অনুশীলন করিবার সময় না থাকা প্রযুক্ত তৎকর্ম্মে মনোযোগ করে না। আপনারাও যৎসামান্য কুটীর ও দ্রোণী নির্ম্মাণ ব্যতীত অন্য কোন শিল্পকর্ম্ম

শিক্ষা, কিম্বা পরিচ্ছদ কারণ পশু চর্ম্ম এবং বল্কল ব্যতীত অন্য কোন বস্তু সংগ্রহ করে না।" তৎপরে গো অশ্ব ও মেষাদিকে প্রাপ্ত হইলে তাহাদিগের দুগ্ধে ও মাংসে অক্লেশে পুষ্ট হইবার এবং তাহাদিগকে চারণ করিতেও অধিক কালব্যয় না হইবায় মনুষ্যের যথেষ্ট অবকাশ হয়। ঐ অবকাশে স্বভাবতঃ কর্ম্মেচ্ছু ব্যক্তিরা নিজ নিজ মেষাদির লোমদ্বারা বস্ত্র-বয়ন করিতে নিযুক্ত হয়; এবং গৃহনির্ম্মাণ করিতেও যথেষ্ট অবকাশ পাইয়া অধিক কালব্যয়দ্বারা সমধিক পরিশ্রমে নৈপুণ্য প্রাপ্ত হয়।

এই প্রকার কর্ম্মে সকল মনুষ্য সম পরিশ্রম ও আগ্রহ প্রকাশ করে না, সুতরাং মনুষ্যের অবস্থার প্রভেদ হয়। যে ব্যক্তিরা বহুপরিশ্রম করত উত্তম গৃহ ও নানাপ্রকার বস্ত্রাদি প্রস্তুত করে, তাহারা অবশ্যই অন্য হইতে মান্য ও আদরণীয় হয়; এবং আপন আপন উত্তম গৃহ সকলের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধ্যর্থ তাহারা তত্রত্য স্থান পরিষ্কৃত করিয়া স্ব স্ব প্রয়োজনীয় ও মনোভিমত আদরণীয় ফল-পুষ্পের বৃক্ষ রোপিত করে। এই প্রকারে আদিম অসভ্যেরা প্রথমে রাখাল, পরে কৃষক হইয়া পূর্ব্বের ভ্রমণতৎপরাবস্থা ত্যাগ করত পরস্পর নিকটে নিকটে দলবদ্ধ থাকিয়া গ্রামস্থ হয়। তদনন্তর তাহারা কৃষিকর্ম্মে বিশেষ মনোযোগদ্বারা আপন আপন ক্ষেত্র হইতে অধিক ফলের লাভ করাতে উদ্বৃত্ত ফলে স্ব স্ব জ্ঞাতি-পরিজন-প্রতিপালনে উত্তমরূপে পারগ হয়। ঐ জ্ঞাতিপরিজনেরাও আপন আপন পরিশ্রমদ্বারা কেহ কৃষিকর্ম্মে, কেহ মেষাদি চারণে, কেহ বস্ত্রবপনে,

কেহ গৃহ-নির্ম্মাণাদি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া গৃহ-স্বামিদিগের সম্পত্তি তথা বল ও আধিপত্যের বৃদ্ধি করে। কেহ কেহ বা শিল্পবিদ্যা জ্যোতির্বিদ্যাদিতে মনোনিবেশ করত সভ্যতার বৃদ্ধি করিতে থাকে। তদনুরূপে এক জনের অনাবশ্যক কোন বস্তু অন্যের অন্য কোন বস্তুর সহিত পরিবর্ত্তন করাতে বাণিজ্যের অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, এবং পরে পরে বাণিজ্যের বৃদ্ধিতে এক দেশের বস্তু অন্যদেশে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত বৃহন্নৌকাদি প্রস্তুত করা হয়, এবং তাহাকে চালিত করিবার নিমিত্ত জল, বায়ু, নদী, সমুদ্র, আকাশ, নক্ষত্রাদির প্রভাব গতি ও ধর্ম্মের অনুসন্ধান হইতে থাকে। তদর্থে পরস্পর সুশীলতা ও নম্রতা ও শিষ্টতা ও সৌজন্যের প্রকাশ, ও বিদ্যার আলোচনা করিতে যাহাদিগের যে প্রকার আগ্রহ হইয়াছে, তাহারা সেই প্রকার সভ্যতা ও স্বচ্ছন্দতা ও সুখভোগ করিতেছে।

কালীপ্রসন্ন সিংহ।

ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপ।

যখন শুনিলাম, কুন্তীর সহিত পঞ্চ পাণ্ডব জতুগৃহের প্রজ্জ্বলিত হুতাশন হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, এবং অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন বিদুর তাহাদিগের অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত যত্নবান আছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি।

যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন ধনুর্গুণ আকর্ষণ করিয়া অসংখ্য রাজগণ সমক্ষে লক্ষ্যভেদ করত তাহা ভূতলে পাতিত ও দ্রৌপদীকে হরণ করিয়াছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি।

যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন দ্বারকায় স্ববিক্রম-প্রভাবে সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়াছে, তথাপি বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ বলরাম তাদৃশ ঘৃণিত ও নিন্দিত কর্ম্মে উপেক্ষা করিয়া পরম সখ্যভাবে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিয়াছেন, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি

যখন শুনিলাম, একবস্ত্রা, অশ্রুমুখী, দুঃখিতা, রজস্বলা দ্রৌপদীকে সনাথা হইলেও অনাথার ন্যায় সভায় আনয়ন ও নিতান্ত নির্ব্বোধ দুঃশাসন তাঁহার পরিধেয় বসন আকর্ষণ করিয়াছে, তথাপি ঐ দুষ্ট বিনষ্ট হয় নাই, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি।

যখন শুনিলাম, শকুনি পাশক্রীড়া করিয়া যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করিয়াছে, তথাপি শান্ত ও সুশীল ভ্রাতৃগণ তাঁহার অনুগতই আছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, বিরাট নগরীতে দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চপাণ্ডব প্রচ্ছন্ন-বেশে অজ্ঞাত-বাস অবলম্বন করিয়াছে, কিন্তু আমার পুত্রেরা কিছুতেই তাহাদের অনুসন্ধান করিতে পারিল না, তদবধি আর আমি জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, বিরাটরাজ স্বসুতা উত্তরাকে অলঙ্কৃতা করিয়া অর্জ্জুনকে সম্প্রদান করিয়াছেন, এবং অর্জ্জুনও আপনার পুত্রের নিমিত্ত তাহাকে প্রতিগ্রহ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, নির্জ্জিত, নির্ধন, নির্বাসিত ও স্বজনবহিষ্কৃত যুধিষ্ঠির সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ করিয়াছে, এবং বলিকে ছলিবার নিমিত্ত যিনি এক পদে এই সম্পূর্ণ পৃথিবী অধিকার করিয়াছেন, সেই ত্রিবিক্রম নারায়ণ, যাহার বহুবিধ উদ্দেশ্য সংসাধন করিতেছেন, তদবধি আমি জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন বিষণ্ণ ও মোহাচ্ছন্ন হইলে কৃষ্ণ স্বশরীরে চতুর্দ্দশ ভুবন দর্শন করাইয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীষ্ম প্রতিদিন রণক্ষেত্রে দশসহস্র লোকের প্রাণ সংহার করিলেও পাণ্ডবপক্ষীয় বিখ্যাত কোন এক ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিতে পারেন নাই, তখন আর জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, ভীষ্মদেব মৎপক্ষীয় অসংখ্য লোককে বিনষ্ট দেখিয়া ও অল্পাবশিষ্টকলেবর শত্রুপক্ষদিগের সুতীক্ষ্ণ শরজালে বিদ্ধকলেবর হইয়া শরশয্যায় শয়িত হইয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে নানাবিধ অস্ত্রপ্রয়োগনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া পাণ্ডবদিগের মধ্যে প্রধান এক ব্যক্তিকেও বিনষ্ট করিতে পারেন নাই, তখন আর আমি জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, সপ্তরথী অর্জ্জুনবিনাশে অসমর্থ হইয়া অল্প-বয়স্ক বালক অভিমন্যুকে বধ করত পরম সন্তোষলাভ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, অভিমন্যুকে বিনষ্ট করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা অতিশয় হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলে অর্জ্জুন রোষভরে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বিনাশ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তখন আমি জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন শত্রুসমক্ষে জয়দ্রথকে বধ করিয়া অনায়াসে প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, দ্রোণবধে ক্রোধে অধীর হইয়া অশ্বত্থামা নারায়ণাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াও পাণ্ডবদিগের প্রধান এক ব্যক্তির প্রাণ সংহার করিতে পারিলেন না, তখন আর জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, ভীমসেন যুদ্ধে দুঃশাসনের রুধির পান করি-য়াছে, এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি অনেকেই তথায় সমুপস্থিত থাকি-য়াও তাহা নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, দুর্য্যোধন হতসৈন্য ও সহায়শূন্য হইয়া

একাকী দ্বৈপায়ন হ্রদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত জলস্তম্ভ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে সবিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছিল, ইত্যবসরে ভীমসেন আপনার অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ করিয়া তাহাকে সমরশায়ী করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, অশ্বত্থামা প্রভৃতি কতিপয় বীর পুরুষেরা সমবেত হইয়া দ্রৌপদীর প্রসুপ্ত পুত্রপঞ্চক বিনাশ করত অতি-ঘৃণিত ও নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দুর্গেশনন্দিনী।

দেবমন্দির।

নিদাঘশেষে এক দিন এক জন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে জাহানাবাদের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচলগমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেননা সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর; কি জানি যদি কালধর্ম্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবেক। প্রান্তর পার হইতে না হইতে সূর্য্যাস্ত হইল, ক্রমে নৈশ গগন নীল নীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমত ঘোরতর অন্ধকার দিগন্ত-সংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্তিপ্রদর্শিত পথে কোন মতে চলিতে লাগিলেন।

অল্পকাল মধ্যে মহারবে নৈদাঘ ঝটিকা প্রধাবিত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল। ঘোটকারূঢ় ব্যক্তি গন্তব্য পথের আর কিছুমাত্র স্থিরতা পাইলেন না। অশ্ব-রজ্জু শ্লথ করাতে অশ্ব যথেচ্ছ গমন করিতে লাগিল। এইরূপ কিয়দ্দূর গমন করিয়া ঘোটকচরণে কোন কঠিন দ্রব্য সংঘাতে ঘোটকের পদস্খলন হইল। ঐ সময় একবার বিদ্যুৎ প্রকাশ হওয়াতে পথিক সম্মুখে প্রকাণ্ড ধবলাকার কোন পদার্থ চকিত-

মাত্র দেখিতে পাইলেন। ঐ ধবলাকার স্তূপ অট্টালিকা হইবে এই বিবেচনায় অশ্বারোহী লম্ফত্যাগে ভূতলে অবতরণ করিলেন। অবতরণমাত্র জানিতে পারিলেন যে, প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলির সংস্রবে ঘোটকের চরণ স্খলিত হইয়াছিল; অতএব নিকটে আশ্রয়স্থান আছে জানিয়া অশ্বকে যথেচ্ছ স্থানে যাইতে দিলেন। নিজে অন্ধকারে সাবধানে সোপানমার্গে পদক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ তাড়িতালোকে জানিতে পারিলেন যে, সম্মুখস্থ অট্টালিকা এক দেবমন্দির। কৌশলে মন্দিরের ক্ষুদ্র দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে দ্বার রুদ্ধ; হস্তমার্জ্জনে জানিলেন দ্বার বহির্দ্দিক হইতে রুদ্ধ হয় নাই। এই জনহীন প্রান্তরস্থিত মন্দিরে এমত সময়ে কে ভিতর হইতে অর্গল আবদ্ধ করিল, এই চিন্তায় পথিক কিঞ্চিৎ বিস্মিত ও কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন। শিরোপরে প্রবল বেগে ধারাপাত হইতেছিল, সুতরাং যে কোন ব্যক্তি দেহালয়-মধ্যবাসী হউক, পথিক দ্বারে ভূয়োভূয়ঃ বলদর্পিত করাঘাত করিতে লাগিলেন, কেহই দ্বার উন্মোচন করিতে আসিল না। ইচ্ছা, পদাঘাতে কবাট মুক্ত করেন, কিন্তু দেবালয়ের পাছে অমর্য্যাদা হয়, এই আশঙ্কায় পথিক তত দূর করিলেন না। তথাপি তিনি কবাটে যে দারুণ করপ্রহার করিতেছিলেন, কাষ্ঠের কবাট তাহা অধিক ক্ষণ সহিতে পারিল না, অল্পকালেই অর্গলচ্যুত হইল। দ্বার খুলিয়া যাইবামাত্র যুবা যেমন মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, অমনি মন্দিরমধ্যে অস্ফুট চীৎকার ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ

করিল ও তন্মুহূর্ত্তে মুক্ত দ্বারপথে ঝটিকাবেগ প্রবাহিত হওয়াতে তথায় যে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহা নির্ব্বাণ হইয়া গেল। মন্দিরমধ্যে মনুষ্যই বা কে আছে, দেবই বা কি মূর্ত্তি, প্রবেষ্টা তাহার কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আপনার অবস্থা এইরূপ দেখিয়া নির্ভীক যুবাপুরুষ কেবল ঈষৎ হাস্য করিয়া প্রথমতঃ ভক্তিভাবে মন্দিরমধ্যস্থ অদৃশ্য দেব-মূর্ত্তির উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। পরে গাত্রোত্থান করিয়া অন্ধকার মধ্যে ডাকিয়া কহিলেন, "মন্দির মধ্যে কে আছ?" কেহই প্রশ্নের উত্তর করিল না; কিন্তু অলঙ্কারঝঙ্কার শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল। পথিক তখন বৃথা বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া বৃষ্টিধারা ও ঝটিকা প্রবেশ রোধার্থ দ্বার যোজিত করিলেন, এবং ভগ্নার্গলের পরিবর্ত্তে আত্মশরীর দ্বারে নিবিষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "যে কেহ মন্দির মধ্যে থাক, শ্রবণ কর; এই আমি সশস্ত্র দ্বারদেশে বসিলাম, আমার বিশ্রামের বিঘ্ন করিও না। বিঘ্ন করিলে যদি পুরুষ হও, তবে ফলভোগ করিবে; আর যদি স্ত্রীলোক হও, তবে নিশ্চিন্ত নিদ্রা যাও, রাজপুত-হস্তে অসিচর্ম্ম থাকিতে তোমাদিগের পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধিবে না।

বঙ্গদর্শন।

একান্নবর্ত্তী পরিবার।

যেমন জ্যোতিষ্কসকল মাধ্যাকর্ষণশক্তির প্রভাবে, পৃথক অথচ সংযুক্তরূপে নভোমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছে, তদ্রূপ

মনুষ্যগণ পরস্পরের সহিত বিভিন্ন হইলেও কোন অদ্ভুত কারণে আকৃষ্ট হইয়া একত্র সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। অনেকেই সময়ে সময়ে মনে করে যে, "একাকী আসিয়াছি, একাকী মরিতে হইবেক," অতএব "পার্থিব সম্পর্ক নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।" পরন্তু এতাদৃশ বৈরাগ্যভাব কেবল ভাবুকদিগের কল্পনা মাত্র। যদ্যপি পার্থিবসম্পর্ক বৃথাই হয়, এবং মৃত্যুকর্ত্তৃক তাহা একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, তবে বিয়োগযন্ত্রণা এত অসহ্য এবং দীর্ঘকালস্থায়ী হয় কেন? মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, পশু পক্ষী আদি নিকৃষ্ট জন্তু এবং নদী বৃক্ষ গৃহ পুষ্করিণী প্রভৃতি নির্জীব পদার্থের উপরেও মায়া সংস্থাপিত হয়। বহুদিন হইল পিতৃমাতৃহীন হইয়াছি, তথাপি "মাতা এই স্থানে বসিয়া আমাকে আদর করিয়াছিলেন, পিতা এইখানে একবার ভৎসনা করিয়াছিলেন, এবং এইথানে বসিয়া তাঁহাদিগের অন্তিমকালে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছি।" এইরূপ কথা মনে হইলে কত সময়ে চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠে। অতএব কিরূপে বলিব যে, তাঁহাদিগের সহিত এখন আর সম্পর্ক নাই। সদ্যঃপ্রসূত সন্তানই হউক, অথবা অতি দীন দুঃখী কিম্বা নিতান্ত দুর্বৃত্ত দুরাচারই হউক, কেহই মৃত্যুমাত্র সংসার হইতে সর্ব্বতোভাবে অপসারিত হইতে পারে না। দেহ পঞ্চত্ব পায়, জীবাত্মা কোথায় থাকেন, তদ্বিষয়ে অনেকের মত স্থির নাই, কিন্তু কোন না কোন জীবিত ব্যক্তির অন্তঃকরণে যে কিছুকাল থাকিতে হইবেক, তাহাতে কেহই সন্দেহ করেন না। এমন মনুষ্য নাই, যে কোন মৃত

ব্যক্তিকেই স্মরণ করে না, অথবা আপনি মরিলে স্মরণ করিবার লোক নাই বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। এই অদ্ভুত মায়াজাল কেহই ত্যাগ করিতে পারে না, কাহারও ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না, এবং পণ্ডিতেরা যাহাই বলুন, আমাদিগের বিবেচনায় ইহা ত্যাগ করা কর্ত্তব্যও নহে। অতএব ইহা হইতে যে প্রকারে সমাজের মঙ্গল হয়, সেইরূপ বিধান করাই শ্রেয়ঃ। যাঁহারা ইহাকে ভাল মনে করেন, তাঁহাদিগের দ্বারা এই মায়াজাল বর্দ্ধিত হওয়াই উচিত, এবং যাঁহারা ইহাকে মন্দ মনে করেন, তাঁহাদিগের পক্ষেও অগত্যা ইহার আনুষঙ্গিক দোষ দূরীকরণ পূর্ব্বক লোকের হিত চেষ্টা করা নিতান্ত বিধেয়।

মনুষ্যজাতি যে পশুগণের ন্যায় যথেচ্ছ বিচরণ না করিয়া একত্র বসবাস করেন, তাহার আদিকারণ, বিবাহসংস্কার। শুদ্ধ নিজের আহারাচ্ছাদন লোকের উদ্দেশ্য হইলে, অতি অল্প আয়াসেই তাহা সম্পন্ন হইতে পারিত। কিন্তু মনুষ্য পরের ভরণপোষণ, এবং সন্ততিগণের ভাবী অবস্থা সকলের মনেই নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন কেহ অন্যান্য আত্মীয়দিগের মঙ্গল, এবং কেহ বা স্বদেশবাসীদিগের হিত অথবা সমগ্র মনুষ্যসম্প্রদায়ের শুভানুধ্যানে সর্ব্বদা মগ্ন থাকেন, জনসমাজে বিবাহপ্রথা না থাকিলে ইহার কিছুই মনুষ্যের মনে উদয় হইত না। বিবাহ হইলেই স্ত্রীপুরুষের পূর্ব্বকালীন স্বাধীনভাব নির্ম্মূল হইয়া যায়, এবং উভয়ের মনেই আত্মচিন্তার পার্শ্বে পরচিন্তা আসিয়া আবির্ভূত হয়। তখন নিজের সম্বন্ধে যতই ঔদাসীন্য

থাকুক, পতিপত্নীর মঙ্গলকামনা বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠে। এইরূপ চিন্তা উপস্থিত না হইলে, কেহ কোন সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। অতএব পরিবারের ভরণপোষণ নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া যে ব্যক্তি কোন কুকর্ম্ম করে, তাহার জন্য মহা-মায়াকে নিন্দা না করিয়া তাহার দারিদ্র্যনিবারণের উপায়চেষ্টা করাই যুক্তিসঙ্গত।

আবার বিবাহের পর সন্তান উৎপন্ন হইলে, পতিপত্নীর মধ্যে নূতন একটী শৃঙ্খল নিবদ্ধ হয়। যে দেশে বিবাহপ্রথা নাই, এবং স্ত্রীপুরুষেরা সকলেই স্বেচ্ছাচারী, সেখানে কেহ সন্তানলাভের সম্পূর্ণ সুখ অনুভব করিতে পারে না। জন্ম-দাতার সেই সন্তানে কোন অধিকার বর্ত্তে না, মাতাও তাহার জন্য আপনার ভিন্ন অন্যের প্রতি নির্ভর করেন না; সুতরাং সন্তান স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়বৃদ্ধিকারী না হইয়া বরং বিচ্ছেদের হেতু হয়। বিবাহসংস্কারকে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে চুক্তিবিশেষ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে বটে, কিন্তু সন্তানের সহিত সম্পর্ক কখনই সেরূপ বোধ হয় না; অতএব ইহার প্রতি লক্ষ্য করিলেই নিগূঢ় মর্ম্মবোধ হইবেক। মহাভারতে লিখিত আছে যে, শ্বেতকেতু পিতৃসমক্ষে আপন মাতাকে কোন অপরিচিত পুরুষের সহিত গমন করিতে দেখিয়া, এই নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন যে, স্ত্রীজাতি পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের সেবা করিতে পারিবে না। এই গল্পটী বিবাহপ্রথা সংস্থাপনের রূপকমাত্র। ইহার প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, পুত্রই মাতার স্বেচ্ছাচার নিবারণ করেন,

এবং পিতাকে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত করিয়া রাখেন। অতএব পতিপত্নীসম্বন্ধ শিথিল করা কর্ত্তব্য নহে, বরং যত প্রগাঢ় হয়, ততই উভয় এবং পুত্রের পক্ষে মঙ্গল। আর এই মঙ্গলে সমস্ত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালেরই মঙ্গল।

পতিপত্নীর চিরকাল একত্র থাকাই শ্রেয়ঃ। একথা স্বীকার করিলেও আর একটী পৃথক মীমাংসার প্রয়োজন হইতেছে যে, পুত্রকন্যারাও পিতৃসংসারে মাতার ন্যায় সংযুক্ত থাকিবেন কি না? কিন্তু যখন ভ্রাতা-ভগিনীতে বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন বিবাহান্তে পুত্র কন্যা উভয়েই কখন পিতৃ আবাসে থাকিতে পারেন না; হয় কন্যাকে পতিগৃহে যাইতে হইবেক, নতুবা পুত্র পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া আপন শ্বশুরালয়ে থাকিতে বাধ্য হইবেন। আমাদিগের দেশে কেবল কন্যাই পিতৃগৃহ ত্যাগ করেন। কিন্তু ইউরোপীয়দিগের মধ্যে পুত্র কন্যা উভয়েই বিবাহিত হইলে স্বাধীনভাবে কালযাপন করেন। এই নিয়মে সমাজের মঙ্গল কি অমঙ্গল বৃদ্ধি হয়, তাহা স্থির করা কর্ত্তব্য। ফলতঃ ইহাই একান্নবর্ত্তী পরিবার বিষয়ক বিচারের মূল কথা।

বিবাহের সময়ে পৃথগন্ন হইলে গৃহত্যাগজনিত কোন দোষ বোধ হয় না। কিন্তু বিবাহ করিবার পরে পিতৃভবনে বাস করিলে স্বভাবতঃ পিতা পুত্রে এবং ভ্রাতৃগণের মধ্যে একান্নবর্ত্তী পরিবার নিবদ্ধ হইয়া যায়। তদনন্তর যাঁহারা পৃথক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ন্যায্যমতে গৃহবিচ্ছেদের নিমিত্ত বলিয়া

গণ্য হয়েন। অতএব যদ্যপি পৃথগন্ন হওয়াই বাঞ্ছনীয় হয়, তবে বিবাহের সময়েই তাহার বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য।

১। একান্নে থাকার এক মহৎ গুণ এই যে, গৃহস্বামীর মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা, তদভাবে পুত্র অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র, কেহ না কেহ পরিবাররক্ষার ভারগ্রহণ করিতে পারেন। ইহাঁরা পৃথগালয়ে বাস করিলে, তাহার অনেক অসুবিধা জন্মে। বাঙ্গালীর সংসারে পুরুষ অভিভাবক না থাকিলে নানা ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, কারণ ইউরোপীয়দিগের ন্যায় আমাদিগের মহিলারা সকলের সঙ্গে কথা কহিতে ও ইচ্ছামত সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পারেন না।

একান্নে থাকিলে সকলেই সময়ে সময়ে বা ঘটনাবিশেষে পরস্পরের সাহায্য করিতে বাধ্য হয়েন। ইহাতে ইচ্ছা না থাকিলেও কার্য্যগতিকে এক জনের দ্বারা অন্যের হিতসাধন হয়, এবং তাহা হইতে লোকের মনে প্রকৃত ভক্তি, স্নেহ ও দয়ার উদ্রেক হইয়া থাকে। পিতা মাতার ত কথাই নাই, একান্নবর্ত্তী পরিবারে অন্যের প্রতিও কখন কখন এতাদৃশ মমতা জন্মে যে,পৃথগন্নে থাকিলে মনোমধ্যে তাহার উদয় হইতেই পারে না। এতদ্ভিন্ন, তৃণনির্ম্মিত রজ্জুর ন্যায়, একান্নবর্ত্তী পরিবারের বল তুল্যসংখ্যক পৃথক সংসারের সমষ্টি অপেক্ষা অধিকতর হইবার সম্ভাবনা, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক।

কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে একান্নবর্ত্তী পরিবারের অনেকগুলি দোষও স্পষ্ট দেখা যায়। বহুপরিবারের অভিভাবকেরা কেহই স্বীয়

কর্ত্তব্য সম্যক্ সম্পাদন করিতে পারেননা। একান্নবর্ত্তী পরিবার-দিগের পরস্পরের প্রতি মায়ার যেমন বৃদ্ধি, তেমনি হ্রাস হইবার সম্ভাবনাও অপেক্ষাকৃত অধিক। পিতা মাতার প্রতি পুত্রের ভক্তি সহজে বিনষ্ট হয় না বটে, কিন্তু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্যান্য পরিবারের মধ্যে গাঢ় প্রণয় না হইয়া বরং অসাধারণ বৈরিতা এবং ভয়ানক জ্ঞাতিবিরোধ জন্মে। পূর্ব্বকালে জ্যেষ্ঠ সহোদরকে কনিষ্ঠেরা পিতৃতুল্য মান্য করিতেন, সুতরাং সকল কার্য্যেই পরস্পরের মধ্যে আনুগত্য এবং মঙ্গলানুষ্ঠানের লক্ষণ দৃষ্ট হইত, এবং কোন বিষয়ে কাহারও মনে দ্বিধা উপস্থিত হইত না। কিন্তু এক্ষণে সকল লোকের ইচ্ছা পূর্ব্বাপেক্ষা এতাদৃশ নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে যে, জ্যেষ্ঠেরা কোন মতেই পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের মনের ভাব বুঝিয়া উঠিতে অথবা তদনুসারে কার্য্য করিতে পারেন না। অধিকন্তু কনিষ্ঠেরা তাহা প্রকাশ করিলে জ্যেষ্ঠের মনে বিরক্তি জন্মে। পূর্ব্বে স্ত্রীকে তাচ্ছীল্য করাই স্বামীর সচ্চরিত্রতার লক্ষণ ছিল; এক্ষণে পতি-পত্নীর প্রণয় দেখিলে কেহই দোষ দিতে পারেন না; অথচ এরূপ প্রণয় হইতে যে সকল কার্য্য উদ্ভাবিত হয়, তাহা প্রকাশ হইলে সামান্য লোকে পরিহাস করেন, আর গৃহস্থের মনোবেদনা হয়। সকলেই জানেন, পুত্র কি কনিষ্ঠ সহোদর বিদেশযাত্রা-কালীন সস্ত্রীক গমনেচ্ছা প্রকাশ করিলে, গৃহস্বামী কিঞ্চিৎ অসুখী হয়েন। ইহা অভিভাবকের পক্ষে উচিত ব্যবহার নহে।

একান্নবর্ত্তী পরিবারের ভ্রাতাদিগের মধ্যে বয়োধিকতা মতে প্রাধান্য জন্মে, কিন্তু সন্তানগণের পক্ষে পিতাই কর্ত্তা। গৃহস্বামী কনিষ্ঠদিগের সেই কর্ত্তৃত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। ইহাতে একটী গুরুতর হানি হয়। বালকবালিকারা একজনের দ্বারা শাসিত হইলে অন্যের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে, সুতরাং এক দিকে পিতা, অন্য দিকে গৃহস্বামী আংশিকরূপে তাহাদিগের অভিভাবক হওয়াতে উভয়ের কেহই আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন না, এবং উহারাও মস্তকহীনের ন্যায় আচরণ করে।

পূর্ব্বকালে বধূগণ কেবল গৃহস্বামীকেই সর্ব্বাচ্ছাদক বলিয়া জানিতেন, এক্ষণে দাম্পত্যপ্রণয়ের আধিক্যবশতঃ তাঁহারাও পতি এবং শ্বশুর অথবা ভাসুর, দুই জন কর্ত্তার অধীন হইয়া অনেক স্থলে নিতান্ত স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় ব্যবহার করেন।

ভ্রাতৃস্নেহ অতি অমূল্য পদার্থ; কিন্তু একবার ভ্রাতার যত্ন বাহ্য বলিয়া সন্দেহ হইলে সে ক্ষোভ কদাচ নিবৃত্ত হয় না। অপর ব্যক্তি মৌখিক স্নেহ প্রকাশ করিলেও সুখোৎপত্তি হয়, কিন্তু আত্মীয়গণের বিন্দুমাত্র ত্রুটি হইলেই অসহ্য বোধ হয়। ফলতঃ, মনুষ্যের মনে একটী প্রবৃত্তি বলপ্রাপ্ত হইলে অন্যগুলি সহজেই খর্ব্ব হইয়া যায়। পতি পত্নীর মধ্যে প্রগাঢ় স্নেহ এবং গুরুজনের প্রতি অবিচলিত ভক্তি, উভয় রক্ষা করা অসাধ্য। অতএব একান্নবর্ত্তী পরিবারে বিশৃঙ্খলা স্বভাবসিদ্ধ বলিতে হইবেক।

রাধারমণ গুপ্ত।

বেকন্ সন্দর্ভ।

সন্দেহ।

পাখীর মধ্যে বাদুড় যেরূপ, চিন্তার মধ্যে সন্দেহ সেইরূপ। বাদুড় সন্ধ্যাকালের অন্ধকারে উড়িয়া বেড়ায়, সেইরূপ যে বিষয় আমরা ভাল জানি না, সেই বিষয়েই সন্দেহ উপস্থিত হয়। সন্দেহ থামাইয়া রাখা ভাল, অন্ততঃ তদ্বিষয়ে সতর্ক হওয়াও চাহি।

সন্দেহে মন মেঘাচ্ছন্নের ন্যায় হইয়া উঠে, বন্ধু বান্ধবের সহিত বিচ্ছেদ এবং কার্য্যেরও অনেক ব্যাঘাত জন্মে, সুতরাং কাজকর্ম্ম স্থির ও সমভাবে চলিতে পারে না। ইহাতে রাজা যথেচ্ছাচার ও স্বামী স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বাসী হয়; বিজ্ঞ লোকদিগেরও বুদ্ধির স্থিরতা ও মনের প্রফুল্লতা থাকে না।

সন্দেহ হৃদয়ের দোষে উৎপন্ন হয় না, বুদ্ধির দোষে হইয়া থাকে। কারণ দৃঢ়প্রকৃতি লোককেও সন্দিগ্ধচিত্ত দেখা যায়। ইংলণ্ডের সপ্তম হেনরী এইরূপ ছিলেন, তাঁহার মত সন্দিহান অথচ দৃঢ়প্রকৃতি লোক দেখা যায় না। এরূপ প্রকৃতিতে অল্প অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। কারণ ইহারা সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা করিয়া সন্দিগ্ধচিত্ত হয় না। কিন্তু ভীরুপ্রকৃতি লোকে শীঘ্রই সন্দিহান হয়।

অল্পজ্ঞান লোকে যেরূপ সন্দিগ্ধচিত্ত হয়, সেরূপ আর কিছু-

তেই হয় না। সুতরাং অধিক জ্ঞান লাভ করা ও সন্দেহকে মনে মনে স্তম্ভিত না রাখাই ইহার প্রকৃত ঔষধ।

মানুষে কি চায়? তাহারা মনে করে যে, তাহারা যে সকল লোককে কার্য্যে নিযুক্ত করে ও যাহাদের সহিত ব্যবহার করে, তাহারা ঋষি? তাহারা কি ইহা বিবেচনা করে না, যে উহাদের নিজের অভিসন্ধি আছে, এবং নিজ অভিসন্ধির প্রতিই উহাদের সম্পূর্ণ দৃষ্টি? সুতরাং সন্দেহকে সত্য বলিয়া উহার ফলাফল বিবেচনা কর; এবং মিথ্যা বলিয়া থামাইয়া রাখ, ইহা হইতে সন্দেহকে সুস্থির রাখিবার আর উৎকৃষ্ট উপায় নাই। বিপদ্ নিবারণের জন্য মানুষের যে বিষয়ে সন্দেহ, তাহা সত্য বলিয়া জ্ঞান করা ভাল, তাহাতে তাদৃশ অনিষ্ট ঘটে না। যে সন্দেহ আপনা হইতে মনের মধ্যে উদিত হয়, তাহা কেবল মধুমক্ষিকার শব্দ মাত্র; কিন্তু যাহা নিপুণতার সহিত পরিপোষিত হইয়া আখ্যান ও কথাচ্ছলে লোকের মনে বিন্যস্ত হয়, তাহা মধুমক্ষিকার হুলস্বরূপ।

যে ব্যক্তির উপর সন্দেহ হয়, স্পষ্টরূপে তাহাকে সন্দেহের কারণ বলাই সন্দেহকাননচ্ছেদের উপযুক্ত কুঠার নিশ্চয় জানিবে। তদ্দ্বারা শীঘ্রই সত্য মিথ্যা নিশ্চয় জানা যায়, এবং সন্দিগ্ধ ব্যক্তিও পাছে আবার সন্দেহের কোন কারণ উপস্থিত হয়, বলিয়া সাবধান হইয়া চলে। কিন্তু নীচপ্রকৃতি লোকের সহিত এরূপ ব্যবহার ভাল নয়, কারণ যদি তাহারা একবার জানিতে পারে, তাহাদের উপর সন্দেহ জন্মিয়াছে, তাহারা আর

কখন বিশ্বাসী হইতে চেষ্টা করিবে না। একজন ইটালিদেশীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, "সন্দেহ বিশ্বাসকে একেবারে জবাব দেয়।" বোধ হয় ইহাতে বিশ্বাস উত্তেজিত হওয়াই উচিত।

ধন।

ধনকে পুণ্যের পক্ষে রসদের বোঝা বই আর কিছুই বলিতে পারা যায় না। সৈন্যের পক্ষে রসদ যেরূপ, পুণ্যের পক্ষে ধন সেইরূপ। ইহা ব্যতীত কাজও চলে না, এবং ফেলিয়া যাইবারও যো নাই; কিন্তু ইহাতে গমনের অতিশয় ব্যাঘাত জন্মে। ইহার জন্য কখন কখন জয়শ্রী হারাইতে হয়, বা উহা লাভ করিবার পক্ষে অনেক গোলযোগ ঘটে। দানব্যতীত অধিক ধনের আর কোন প্রকৃত ব্যবহার দেখিতে পাই না, অন্যান্য সব কেবল বৃথা কল্পনা মাত্র। সলোমন্ বলেন, "যেখানে ধন অধিক, সেখানে ভোগের লোকও বিস্তর, এবং ধনীর কেবল চক্ষে দেখা মাত্রই ফল।" শুদ্ধ নিজে ধন ভোগ করায় অধিক ধনের আস্বাদগ্রহ হয় না, তাহাতে কেবল ধনরক্ষা, ধনবিভাগ, ও ধনদানের ক্ষমতা আছে, এবং ধনী বলিয়া খ্যাতি ও হইয়া হইয়া থাকে, কিন্তু ধনীর পক্ষে প্রকৃত উপকার কিছুই নাই। তুমি দেখিতেছ না যে, সর্ব্বসাধারণকে ধনের একটা প্রকৃত ব্যবহার হইতেছে ইহা দেখাইবার জন্য দুষ্প্রাপ্য বস্তু সকল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর ও কত মহার্ঘ্য হইয়া উঠিয়াছে এবং কত কত বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ কাজ

হইতেছে। তুমি ইহা বলিতে পার, ধন মানুষকে অনেক বিপদ হইতে উদ্ধার করে। সলোমন্‌ও বলিয়াছেন, "ধনীর বিবেচনায় ধন দুর্ভেদ্য দুর্গের স্বরূপ।" তিনি উহা ভালই বলিয়াছেন, কারণ ইহা কেবল ধনীর বিবেচনাতেই মাত্র, কাজের নহে। দেখ ধনে লোক নানা বিপদে পড়িয়া থাকে, উহা হইতে উদ্ধার হওয়া অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়।

কেবল বাহ্যাড়ম্বরের জন্য ধন চাহিও না। যাহা তুমি সদুপায়ে পাও, শান্ত হইয়া ব্যবহার করিতে পার, আহ্লাদপূর্ব্বক বিভাগ করিতে পার, এবং সন্তোষের সহিত রাখিয়া যাইতে পার, তাহাই ভাল; কিন্তু যোগী ঋষির মত ধনকে ঘৃণা করিও না। সিসিরো একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বিষয় যেরূপ বলিয়াছেন, সেইরূপ ধন চিনিয়া লও। তিনি বলিয়াছেন, উক্ত মহাশয় অর্থপিপাশাশান্তির জন্য ধনকামনা করেন নাই; কেবল উদার পরোপকারের জন্যই করিয়াছিলেন। সলোমন্ যাহা বলিয়াছেন, তাহাও শুন এবং ব্যস্ত হইয়া ধনসংগ্রহ করিও না। তিনি বলেন, "যে ধনোপার্জ্জনে অতিশয় ব্যগ্র, সে কখন সদুপায়ে ধনসংগ্রহ করিতে পারে না।"

কবিরা বলিয়া থাকেন, "দেবরাজ যে ধন দেন, তাহা অতিশয় মন্দগামী, কিন্তু যাহা মৃত্যুর নিকট হইতে আইসে, তাহা দ্রুতগামী," ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সদুপায়ে ও সৎপরিশ্রমে যাহা উপার্জ্জন করা যায়, তাহাতে অধিক কালবিলম্ব হয়, এবং যাহা অন্যের মৃত্যুর দরুণ (অর্থাৎ উত্তরাধিকারী হইয়া)

পাওয়া যায়, তাহা একেবারে আসিয়া পড়ে, অথবা যখন প্রতারণা, উৎপীড়ন ও অন্যান্য অন্যায় উপায় দ্বারা ধন আইসে, তখন উহা যেন দৌড়িয়াই আইসে।

ধনী হওয়ার অনেক পথ আছে, কিন্তু তাহার অধিকই পাপপূর্ণ। কৃপণতা একটী উৎকৃষ্ট উপায় বটে, কিন্তু দোষশূন্য নহে। ইহাতে লোককে উদারাশয় ও বদান্য হইতে দেয় না। ভূমির উর্ব্বরতা দ্বারা ধনোপার্জ্জন করা অতি উৎকৃষ্ট। ইহা লোকমাতা বসুন্ধরার প্রসাদস্বরূপ; কিন্তু উহা বহুকালসাধ্য। ধনী লোকে কৃষি আরম্ভ করিলে অতি অল্পকালমধ্যেই বিপুল অর্থাগম হয়। আমি ইংলণ্ডের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে জানিতাম; আমাদের সময়ে তাঁহার যত মোকাম ছিল, এত আর কাহারও ছিল না। তিনি একজন প্রধান পশুপালক, প্রধান মেষরক্ষক এবং প্রধান কাষ্ঠব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার পাথরিয়া কয়লা, ভূসী জিনিস, সীসা, লৌহ প্রভৃতি নানাবিধ বস্তুর কারবারও অতিশয় কলাও ছিল; সুতরাং নিরন্তর আমদানীর পক্ষে পৃথিবী তাঁহার নিকট সমুদ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

একজন বলিয়াছেন, "তিনি অতিকষ্টে অত্যল্পমাত্র ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।" কারণ যখন মানুষের মূলধন এরূপ হইয়া উঠে যে, বাজারের সুবিধার অপেক্ষা করিতে পারে, এবং অন্যের যাহা পুঁজির বাহির এরূপ সওদা ও করিতে পারে, অথচ খুচরা ব্যপারীদিগের পরিশ্রমের অংশভাগী হয়, তখন সে অবশ্যই অতুলধনশালী হইবে সন্দেহ নাই।

সাধারণ বাণিজ্যে অতিসৎ উপায়েই উপার্জ্জন হয়। পরিশ্রম ও সুখ্যাতি দ্বারা তাহার উন্নতিও হইয়া থাকে। কিন্তু চুক্তির কারবারে যাহা লাভ হয়, তাহা সর্ব্বাংশে সৎ নহে। উহাতে অন্যের দরকারের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়, চাকরদের নিকট ঘুসও লওয়া হয়, এবং চাতুরী করিয়া অন্য খরিদ্দারকেও তাড়াইতে হয়। এরূপ কার্য্যে ধূর্ত্ততার বিশেষ সংস্রব আছে।

সওদা বদল করার বিষয়,—যখন কোন ব্যক্তি কেবল বিক্রয়ের জন্য জিনিস খরিদ করে, তখন ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই ক্ষতি সহ্য করিতে হয়, বখরার কারবারে বিস্তর মুনফা হয়, কিন্তু যাহাদের উপর ভার থাকে, তাহারা বিশ্বাসী হওয়া চাহি।

সুদের কারবারে নিষ্কণ্টকে লাভ হয়, কিন্তু উহা অতিশয় কুৎসিত ব্যবসায়। সুদখোর অন্যের পরিশ্রম দ্বারা আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করে; অমাবস্যাতেও উহার লাঙ্গল কামাই যায় না, যদিও ইহা লাভের নিষ্কণ্টক পথ বটে, কিন্তু ইহার কতকগুলি দোষেও আছে। সময়ে সময়ে দালালেরা আপন উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত দেউলেপড়া খাতককেও আনিয়া দেয়। যাহার অদৃষ্টে নূতন উদ্ভাবন বা বিশেষ স্বত্ব জুঠে, সময়ে সময়ে তাহার যথেষ্ট অর্থাগম ও হয়। ক্যানারি দ্বীপে যে প্রথম ইক্ষুর চাস করিয়াছিল, তাহার অদৃষ্টেও ঐরূপ ঘটিয়াছিল, অতএব যাহার উদ্ভাবনীশক্তি আছে, এবং বিবেচনার অপ্রতুল নাই, সেই যথার্থ তার্কিক। সময় বুঝিয়া চলিতে পারিলে সে গুরুতর কার্য্যও সাধন করিতে পারে।

যে নিশ্চিত লাভের উপর নির্ভর করে, সে কখন বড় মানুষ হইতে পারে না, এবং যে সর্ব্বস্ব কারবারে খাটায়, সে প্রায়ই দেউলে পড়ে ও দরিদ্র হইয়া যায়। অতএব নিশ্চিত লাভের আশাকে সাহসের উপর প্রহরী রাখা ভাল, তাহা হইলেই লোকসান সামালিতে পারিবে।

একচেটিয়া ও একেবারে বাজারের সমুদায় জিনিস খরিদ করা (যেখানে উহা আইনবিরুদ্ধ নয়) ধনী হইবার প্রধান উপায়। বিশেষতঃ লোকের কি অত্যন্ত দরকার, যদি তাহা ভাল জানা থাকে, ও সেই সেই জিনিস সর্ব্বাগ্রে খরিদ করিয়া গুদামজাত করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলেও যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা। চাকরী দ্বারা উপার্জ্জনে যদিও উন্নতি হইতে পারে বটে, কিন্তু খোসামুদি, মনযোগান, কিম্বা অন্যান্য কুৎসিত কার্য্য দ্বারা যদি চাকরী লইতে হয়, তবে উহা হইতে নীচ কাজ আর নাই। খোসামুদি করিয়া কাহারও উত্তরাধিকারপত্রে নাম লেখান বা ওছি সরবরাহকার হওয়ার বিষয় সেনেকার সম্বন্ধে উত্তম বলা আছে। "সেনেকা উত্তরাধিকার পত্র ও ওছাওতি যেন জাল ফেলিয়া ধরিতেন।" ইহা সকলের অধম; ইহাতে চাকরী অপেক্ষা নীচ লোকের সেবা করিতে হয়।

যাহারা ধনকে ঘৃণা করে, তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিও না; কারণ যাহারা ধনোপার্জ্জনে নিরাশ হইয়াছে, তাহারাই ধনকে ঘৃণা করিয়া থাকে; কিন্তু তাহারা যখন ধনী হয়, তখন তাহাদের মত অর্থপিশাচ হইতে আর কাহাকেও দেখা যায়না।

তোমাকে যেন সিকি পয়সা মা বাপ হয় না। ধনের পাখা আছে, উহা কখন কখন আপনা আপনি উড়িয়া যায়, কখন বা অধিক ধনের আশায় উড়াইয়া দিতে হয়।

কেহ কেহ আপন আত্মীয়গণকে ধন দিয়া যান, কেহবা সাধারণের উপকারার্থে দিয়া থাকেন, কিন্তু দুই দিকে পরিমিতরূপ দান করাই ভাল। যখন কোন ব্যক্তি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়, তখন যদি তাহার বয়স ও বিবেচনার পরিপাক না হইয়া থাকে, তাহা হইলে অনেক অর্থলোলুপ গৃধ্র আসিয়া তাহাকে ঘেরিয়া ফেলে।

অনাথনিবাস, অতিথিশালা প্রভৃতি যদি কেবল জাঁকজমকের জন্য স্থাপিত হয়, তাহা হইলে উহা কেবল ভক্তিহীন পূজামাত্র, অথবা বহিশ্চিত্রিত শবমাত্র বলিলেও বলা যায়; উহার ভিতর পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়াছে। অতএব পরিমাণ ধরিয়া তোমার দানশীলতার মাপ করিও না, উহা কতদূর কার্য্যের হইল, তাহা ধরিয়া মাপিয়া লও। মৃত্যুকালে দান করিব বলিয়া স্থির হইও না। যদি ভাল করিয়া বিবেচনা কর, তবে এরূপ করা কেবল অন্যের ধনে নবাবী মাত্র, নিজের ধনে নহে।

মানুষের স্বভাব।

লোকে প্রায়ই আপন স্বভাব গোপন করে; কখন কখন দমন করিয়াও রাখে; উহা কদাচিৎ একেবারে বিলুপ্ত হয়।

বলপ্রকাশ করিলে উহা ভয়ানক হইয়া উঠে, উপদেশ ও কথোপকথনে অনেক শান্ত হয়, এবং কেবল অভ্যাস দ্বারাই পরিবর্ত্তিত ও বশীভূত হইতে পারে।

যিনি আপন স্বভাব জয় করিতে চান, তিনি যেন একেবারেই বহ্বারম্ভ বা অল্পারম্ভ না হন; কারণ প্রথম পক্ষে, যদি তিনি কৃতকার্য্য না হইতে পারেন, তবে একেবারে দমিয়া যাইবেন। দ্বিতীয় পক্ষে, যদিও তিনি কৃতকার্য্য হয়েন, কিন্তু মন্থরগতি হইতে হইবে। অতএব প্রথম সাঁতার শিখিতে হইলে যেরূপ সোলার তাড়া বা বাতাসপোরা ভিস্তি লইতে হয়, সেইরূপ প্রথমে তাঁহাকেও কিছু কিছু সাহায্য লইতে হইবে। কিছু দিন পরে, যেরূপ নর্ত্তকেরা মোটা জুতা পরিয়া নাচ শিখে, সেইরূপ তাঁহাকেও কিছু অসুবিধা স্বীকার করিয়া স্বভাববশীকরণ অভ্যাস করিতে হইবে; কারণ সচরাচর কাজের জন্য যত দূর দরকার, অভ্যাস যদি তাহা অপেক্ষা কঠিনতর হয়, তাহা হইলে বিশেষ নৈপুণ্য জন্মে। যেখানে স্বভাব অতিশয় দুর্দ্দান্ত, সুতরাং তাহা জয় করাও কঠিন ব্যাপার, সেখানে ক্রমে ক্রমে চেষ্টা করা অত্যন্ত আবশ্যক। যেমন কেহ কেহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলে মাতৃকাক্ষর পাঠ করিয়া ক্রোধ সংবরণ করে, সেইরূপ প্রথমে অবসর বুঝিয়া স্বভাবকে থামাও। তদনন্তর যেমন সুরাপান ত্যাগ করিতে হইলে প্রথমে ভৈরবীচক্র ত্যাগ করিতে হয়, ও আহারের সময়ই কেবল যৎকিঞ্চিৎ ব্যবহারমাত্র থাকে, এবং শেষে অনায়াসে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারা যায়,

সেইরূপ স্বভাব দমন করিতে হইলেও ক্রমে ক্রমে বশীকরণের পরিমাণ বাড়াইয়া দাও। কিন্তু যাহার এরূপ সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় আছে যে, একেবারেই আপনাকে স্ববশে আনিতে পারে, তাহার একেবারেই স্বাধীন হওয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর।

"যে দুঃখ অন্তর খুলিয়া খায়, তাহা একেবারে হৃদয় হইতে দূর করিয়া দেওয়া ভাল; তাহা হইলে একটী প্রবল কষ্টভোগ করিয়াই যাবজ্জীবন একটা যন্ত্রণার হাত এড়াইতে পারা যায়।" যেরূপ একটী বাঁকা ছড়িকে সোজা করিতে হইলে বিপরীত দিকে নোয়াইতে হয়, সেইরূপ যেখানে সম্পূর্ণ বিপরীত পথে চলিলে কোন দোষস্পর্শ হয় না, সেস্থলে স্বভাবকে সৎপথে আনিবার জন্য বিপরীত দিকে লইয়া যাওয়া ভাল।" এই প্রাচীন নিয়মটী বড় অসঙ্গত নহে। নিরন্তর অনুশীলন দ্বারা কোন একটী সংস্কার বদ্ধমূল করিও না; মধ্যে মধ্যে উহার বিরাম রাখিও; তাহা হইলে আরও সরল হইয়া অগ্রসর হইতে পারিবে।

মানুষ সর্ব্বগুণান্বিত নহে। উহার কোন না কোন একটা দোষ আছেই আছে; সুতরাং যদি সে নিরন্তর কোন প্রকার স্বভাব অভ্যাস করে, তবে তাহার গুণও যেরূপ অভ্যাস পাইতে পারে, দোষও সেইরূপ বদ্ধমূল হইবার সম্ভাবনা। অতএব সময় বুঝিয়া বিরাম দেওয়া ব্যতীত ইহা হইতে পরিত্রাণের আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

কেহ যেন তাহার স্বভাবকে একেবারে জয় করিয়াছে বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করে না। স্বভাব স্তম্ভিত হইয়াও অনেক দিন থাকিতে পারে, এবং সময় পাইয়া বা কোন প্রলোভন দেখিয়া পুনরায় উত্তেজিত হয়। এ বিষয়ের উদাহরণস্বরূপ ঈসপ্‌রচিত একটী গল্প আছে, যথা, "কোন ব্যক্তি একটী বিড়ালকে পরমসুন্দরী যুবতী করিয়াছিল, তথাপি ঐ যুবতী, যেপর্য্যন্ত একটী ইন্দুর সম্মুখ দিয়া না যাইত, সে পর্য্যন্ত চৌকীর এক ধারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত।" অতএব প্রলোভনের সংসর্গ একেবারেই পরিত্যাগ করা ভাল, অথবা বারম্বার উহার সম্মুখে দাঁড়াও, তাহাতে চঞ্চল হইবার অত্যল্প সম্ভাবনা থাকিবে।

নির্জ্জনে মানুষের স্বভাব বিলক্ষণ প্রকাশ পায়; কারণ সেখানে আন্তরিক ভাব ঢাকা থাকে না,সে সময়ে লোকে আপন শাসনের বাহিরে থাকে। তখন সে নূতন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, সুতরাং পরিচিত অভ্যাসের ফল আর কিছুই খাটে না।

যাহাদের ব্যবসায় স্ব স্ব প্রকৃতির অনুরূপ, তাহারাই সুখী, অন্যথা তাহারা যে বিষয় ভাল বাসে না, তাহার চর্চ্চকালে বলিতে পারে,"আমাদের আত্মা অনেক দিন বিদেশী হইয়াছে।" শাস্ত্রচর্চ্চাবিষয়ে যে সকল পুস্তক না পড়িলে নয় বলিয়া পড়িতে হয়, তাহার জন্য সময় নিরূপণ করা ভাল; আর যাহা ভাল লাগে, তজ্জন্য সময় নির্দ্ধারণের প্রয়োজন নাই; মন সেদিকে আপনা হইতেই দৌড়িবে; অন্যান্য কার্য্যের সময় নির্দ্ধারণ করিলেই যথেষ্ট হইল।

মানুষের স্বভাব হয় শস্যপূর্ণ হইবে, নয় নিবিড়তৃণাচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে। অতএব সময়মত শস্যে জলসেক কর এবং ঘাস উঠাইয়া দাও।

পৌল ও বর্জ্জিনী।

উপসংহার।

মৃত্যুর কথা কি বলিব বৎস! মৃত্যু সকলের পক্ষেই পরম প্রার্থনীয় শুভস্বরূপ। জীবন যেন একটী ক্লেশময় দিন, মৃত্যু তাহার রজনীস্বরূপ। রোগ শোক পরীতাপ বিপত্তি ও ভয়, এবং আর যাহা কিছু জন্মীদিগকে নিরন্তর বিলোড়িত করে, সে সমুদায় মৃত্যুরূপ সুষুপ্তিতে বিলীন হইয়া যায়। যাহাদিগকে বড় সুখী মনে কর, তাহাদিগকেই পরীক্ষা কর, দেখিবে তাহাদিগের ভাক্ত সুখ ক্রয় করিতে অনেক দাম লাগিয়াছে। তাহারা গার্হস্থ্য সুখ পরিত্যাগ করিয়া যশের মুখ দেখিতে পায়, স্বাস্থ্য বলিদান দিয়া ধনসঞ্চয় করে, এবং অজস্র স্বার্থবিসর্জ্জন-পূর্ব্বক পরের প্রণয় ও তজ্জনিত দুর্লভ সুখ লাভ করে। অনেকে পরার্থসাধনে আয়ুঃ শেষ করিয়াও শেষ দশায় কপটী বান্ধব আর কৃতঘ্ন স্বজন ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায়না। কিন্তু বর্জ্জীনী চরম ক্ষণপর্য্যন্ত সুখেই কাটাইয়াছে। যাবৎ আমাদের নিকটে ছিল, তাবৎ প্রকৃতির বদান্যতা থাকাতে, তাহাকে কোন অপ্রতুল দেখিতে হয় নাই। আর যখন আমাদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইল, তখনও কি সে একেবারে সকল সুখ হারাইল, কখনই নহে। তাহার সদৃশ সাধুতা থাকিলে কোন অবস্থাতেই নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভাগী হইতে হয় না। তাহার ধর্ম্ম ও সদ্গুণসমূহ তাহার পক্ষে অক্ষয় সুখের ভাণ্ডারস্বরূপ ছিল। এমন কি মৃত্যুকালেও তাহার সুখের পরিসীমা ছিল না। তাই তাহার নিমিত্ত

রোরুদ্যমান দেশশুদ্ধ লোকের প্রতি নেত্রপাত করুক, চাই তাহার পরিত্রাণের নিমিত্ত ব্যাকুল ও অসমসাহসিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত তোমার প্রতিই দৃষ্টিনিক্ষেপ করুক, সে চারিদিকেই দেখিয়াছে যে, সকলে তাহাকে কত ভাল বাসে। তাহার জীবন যেরূপ পরিশুদ্ধভাবে অতিবাহিত হইয়াছে, তাহাতে কণামাত্র পারত্রিক শঙ্কা তাহার মনে স্থানলাভ করে নাই। বিধাতা ম্রিয়মাণ সাধুজনের হৃদয়কে সুস্থির করিবার নিমিত্ত যে অবিচলিত সাহস পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করেন, সেই সাহসে ভর করিয়া বিপদের প্রতি সে দৃক্‌পাতও করে নাই। সে মৃত্যুর করাল মূর্ত্তির নিকট বিকারশূন্য মুখশ্রী প্রদর্শন করিয়াছে।

সংসারে যে সকল অতি গুরু বিপত্তি আছে, সাধু জনদিগকেও যে তাহা সহ্য করিতে হয়, ইহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত। বিপদ উপস্থিত হইলে কিরূপ ভাব ধরিতে হয়, কিরূপ মাহাত্ম্য দেখাইতে হয়, তাহা সাধু জনেরাই জানেন। তাঁহারাই দুর্দৈবের তর্জনাতে ভয় পান না, বরং উহা ধিক্কার পূর্ব্বক অতুলকীর্ত্তি লাভ করেন, অনুপম ধীরতার দৃষ্টান্ত দেখান। এই উদ্দেশেই পরমেশ্বর সাধুদিগের উপর বিপদের সুব্যবহার ভার অর্পণ করেন, কারণ তাঁহারাই বিপদের সুব্যবহার করিতে সমর্থ। যখন অত্যুজ্জ্বল কীর্ত্তিমণ্ডলে সাধুজনকে মণ্ডিত করিতে বিধাতার ইচ্ছা হয়, তখন তিনি সাধুজনকে সংসাররূপ উদাত্ত নাট্যমন্দিরে দণ্ডায়মান করিয়া বিবিধ কষ্ট ও মৃত্যুপর্য্যন্ত সহ্য করান, তখন তাঁহাকে অবিচলিত দেখিয়া সকলে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা

জনের শিক্ষা পায়, তখন তাঁহার বিপত্তি স্মরণ করিয়া উত্তর পুরুষেরা চিরকাল অশ্রুধারা বর্ষণ করে। যে অবনীতে সকলই ক্ষণধ্বংসী, যথায় কত প্রাচীন মহীপালদিগের নাম নিত্য নিত্য বিস্মৃতিসাগরে বিলীন হইতেছে, সেই অবনীতে সাধুজনের কীর্ত্তিই চিরস্থায়িনী হয়। কিন্তু তা বলিয়া কি বজ্জীনীর কীর্ত্তি ব্যতীত আর কিছু নাই। নিঃসংশয় জানিও বৎস! যে, সে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাহার ধ্বংসদশা হয় নাই। দেখ দেখি, পৃথিবীতে কোন পদার্থের কি ধ্বংস হয়? সকলের কেবল পরিবর্ত্ত ও রূপান্তরমাত্র হইতেছে। মানুষ এমন কোন যন্ত্র উদ্ভাবন করেন নাই, যদ্দারা একটীমাত্র পরমাণু একবারে বিলোপিত হইতে পারে। যখন চতুর্দ্দিকের ভৌতিক পদার্থসমূহ অধ্বংসনীয়, তখন কি এমন হয় যে যাহার জ্ঞান ছিল, অনুভব ছিল, প্রীতি ছিল, ধর্ম্মবোধ ছিল, বিচার ছিল, সেই চিৎপদার্থ ধ্বংস হইয়া যাইবে? ও যদি আমাদিগের সহবাসে বজ্জীনীর সুখ হইয়া থাকে, তবে এখন তাহার কি অনির্ব্বচনীয় সুখই ভোগ হইতেছে! ঈশ্বর আছেন বাছা, তাহাতে সন্দেহমাত্রটী নাই। সকল পদার্থই সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে, তাহা প্রতিপাদন করিতে যুক্তি অপেক্ষা করে না। যাহারা আপন অপকর্ম্ম নিবন্ধন পারত্রিক বিচারের ভয় করে, সেই দুরাত্মারাই ঈশ্বর মানে না। যেমন তাঁহার কার্য্যসকল তোমার প্রত্যক্ষগোচর হয়, তেমনি জ্ঞানস্বরূপের জ্ঞানবীজ তোমার মনে রোপিত আছে। এখন বল দেখি, তোমার কি মনে হয় যে, তিনি বজ্জীনীকে

পুরস্কার দিবেন না ? তোমার কি মনে হয় যে, যে অচিন্ত্যশক্তি তাদৃশ উন্নতাশয় মনকে তেমন প্রিয়দর্শন শরীররূপ পরিচ্ছেদে পরিচ্ছন্ন করিয়াছিল, যে শক্তি সেই শরীরে অতি চমৎকার দিব্য নির্ম্মাণের সুস্পষ্ট প্রমাণ রাখিয়া দিয়াছিল, সেই শক্তি তরঙ্গ হইতে বঙ্গীনীকে তুলিবে না ? যিনি আমাদের অপরিজ্ঞেয় নিয়মাবলীদ্বারা ইহকালে মানববর্গের সুখের বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তিনি সেইরূপ অপরিজ্ঞেয় অন্যবিধ নিয়মাবলীদ্বারা পরকালে অন্যপ্রকার সুখ দিতে কি অসমর্থ ? সত্য বটে, পারত্রিক সুখের বিষয়ে আমরা কিছুই আকর্ণন করিতে পারি না, পরকাল যে কিপ্রকার তাহার কিছুই বুঝিতে পারি না, কিন্তু তা বলিয়া কি পরকাল নাই বলা যায় ? যখন ভূমিষ্ঠ হইলাম, তখন কি এই পৃথিবীর স্বরূপ চিন্তা করিতে পারিয়াছিলাম, তখন কি সংসারের ভাব বিন্দুবিসর্গ বুঝিতে পারিয়াছিলাম ? যাহা কিছু আমাদের বুদ্ধির অগম্য ও চিন্তাশক্তির অগোচর, তাহাই অলীক ও অবাস্তবিক ইহা কি কাজের কথা ? আমরা এমন যে অন্ধকারময় ক্ষণধ্বংসী অবস্থায় বর্ত্তমান আছি, তথা হইতে পরকালের ভাব কিরূপে কল্পনা করিব ? ইহা কি সম্ভব যে পরমেশ্বর ভূমণ্ডলব্যতীত আর কুত্রাপি আপন করুণা ও জ্ঞানের প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই ? যে বিশাল অবকাশ মৃত্যুর ছায়াতে আচ্ছন্ন আছে, তন্মধ্যে কি তিনি মনুষ্যজাতির সৃষ্টি করিতে পারেন নাই ? সমুদ্রের প্রত্যেক জলবিন্দুতে অসংখ্য সূক্ষ্মশরীর প্রাণী বাস করে, তবে উপরে পরিবর্ত্তমান অসংখ্য

গ্রহ নক্ষত্রাদি একেবারে শূন্য হইয়া আছে, ইহা বিশ্বাস করা যায় কি? কেবল আমাদের নিবাসভূমি পৃথিবী ব্যতীত আর কোথাও অচিন্ত্য শক্তি ও অপার জ্ঞানের কি প্রসব নাই? ঐ সকল উজ্জ্বল অসংখ্য মণ্ডলসমূহ, ঝটিকা বা মহানিশার অগম্য,ঐ সকল জ্যোতির্ম্ময় স্থানসমূহ কি কেবল অনর্থক নির্ম্মিত হইয়াছে এবং মরুভূমি হইয়াছে? যদি ঈশ্বরের শক্তির সীমা থাকিত, যদি শত সহস্র প্রমাণদ্বারা তাঁহার ক্ষমতা অসীম বলিয়া প্রতিপন্ন না হইত, তবে বলিতে পারিতাম বটে যে, এই যে পৃথিবী দেখিতেছ, যথায় ধর্ম্ম ও পাপের যুদ্ধ হইতেছে, যথায় জীবন ও মরণের দ্বন্দ্ব চলিতেছে, সেই পৃথিবীই ঈশ্বরের রাজত্বের সীমাভূমি।

নিঃসংশয়ই এমন স্থান আছে, যথায় ধর্ম্মের পুরস্কার হয় এবং সাধুগণের পরমসুখ লাভ হয়। আহা, যদি সেই দিব্যলোক হইতে বর্জীনী অদ্য তোমার সহিত কথা কহিতে পারিত, তাহা হইলে সে অবশ্যই এই ভাবে সম্ভাষণ করিত। 'পোল হে! জীবন কেবল পরীক্ষামাত্র, পৃথিবী কেবল পরীক্ষার স্থলমাত্র। যত দিন সেই পরীক্ষাস্থলে ছিলাম, তত দিন আমি ধর্ম্মের কোন সেতুভঙ্গ করি নাই, প্রকৃতির উপদিষ্ট কোন আচার পরিত্যাগ করি নাই, এবং প্রণয় কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত কোন পথ উল্লঙ্ঘন করি নাই। আমি মাতৃ-আজ্ঞা পালনার্থ সমুদ্র পার হইয়াছি, আমি ঐশ্বর্য্য পরি-ত্যাগ করিয়া চারিত্র রক্ষা করিয়াছি, আমি কৌমারব্রতভঙ্গ

অপেক্ষা প্রাণনাশ করিয়াছি। বিধাতা দেখিলেন যে, আমার জীবনযাত্রাতে যাহা কিছু কর্ত্তব্য ছিল, তাহা সম্পূর্ণ হইল, অতএব দয়াদৃষ্টি করিয়া ক্লেশময় জীবনযাত্রা সাঙ্গ করিয়া দিলেন। দারিদ্র্য, কিম্বা কুৎসা, কিম্বা অসূয়া, কিম্বা উদ্বেগজাল, কিম্বা পরের বিপত্তিদর্শন ইত্যাদি যে সকল যন্ত্রণা সংসারে সর্ব্বদা আক্রমণ করে, তাহাদিগের হাত আমি এখন একেবারে এড়াইয়াছি! মানুষ যে সকল কষ্টদ্বারা পীড়িত হয়, তাহাদিগের একটীও আর আমাকে আক্রমণ করিতে পারে না। তুমি কি না আমার ঈদৃশ দশাতে শোক করিতেছ! আমি জ্যোতিঃকণার ন্যায় নির্ম্মল ও নিত্য হইয়াছি, তুমি কি না আমাকে জীবনের অন্ধকারে প্রত্যাহ্বান করিতেছ! হে চিরমিত্র পৌল! সেই সব দিনের কথা কি তোমার মনে পড়ে, যখন আমরা উভয়ে সূর্য্যকিরণের শৈলশিখরে আরোহণসময়ে তদীয় রশ্মিজালের সহিত বনভূমিতে বিস্তৃত হইয়া নভোমণ্ডলের রমণীয় রূপ দর্শন করিতাম? কি কারণে যে তেমন চমৎকার আহ্লাদ অনুভব হইত, বুঝিতে পারিতাম না, কেবল বালস্বভাববশতঃ এই অভিলাষ হইত যে, শুদ্ধ নেত্রময় হইয়া উষার সুসমৃদ্ধ শোভা নিরীক্ষণ করি, কর্ণময় হইয়া বিহঙ্গমকুলে সংসক্ত সংগীত শ্রবণ করি, ঘ্রাণময় হইয়া উদ্যানের সৌরভ সম্ভোগ করি, এবং হৃদয়ময় হইয়া এই সকল আনন্দের পরিচয় রক্ষা করি! কিন্তু যে সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ হইতে পৃথিবীর সমুদয় সৌন্দর্য্য প্রবাহিত হইতেছে, আমি এখন তাহার নিকটে স্থান

পাইয়াছি। অন্তরাত্মা পূর্ব্বে যাহা সঙ্কুচিত কতিপয় ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিত ও তৃপ্তি পাইত না, এখন তাহা সাক্ষাৎ দর্শন, আস্বাদন, ঘ্রাণ, শ্রবণ, ও স্পর্শ করিতেছে। আমি এখন যে জ্যোতির্ম্ময় উপকূলে অধিষ্ঠান পাইয়াছি, কি বাক্যে তোমার নিকট তাহার বর্ণনা করিব, বুঝিতে পারিতেছি না! অচিন্ত্য-শক্তি পরম পুরুষ জীবের দুঃখশান্তির নিমিত্ত যাহা কিছু সৃষ্টি করিতে পারিতেন, আমার সে সমুদয় ভোগ হইতেছে! আমারই মত অতুলসুখভোগী অসংখ্যজীবের সহিত মিত্রতা হইলে যত প্রমোদলাভ হয়, তাহা আমার লাভ হইতেছে! অতএব হে বান্ধব! তোমার পরীক্ষার যতটুকু অবশিষ্ট আছে, তাহা ধীরচিত্তে সহ্য কর, তাহা হইলেই এক সময়ে অবিনাশী প্রীতি দ্বারা তোমার প্রিয়তমা বজ্জীনীর সুখ অনন্তগুণ করিতে পারিবে! তখন আমি তোমার সকল দুঃখ শান্ত করিয়া দিব, সমুদয় বাষ্পজল পুঁছাইয়া দিব। হে মিত্র! হে প্রিয়তম বর! তোমার মনকে সেই নিত্য দশার আশাতে উন্নত করিয়া বর্ত্তমান কালের ক্ষণিক যন্ত্রণা সহ্য কর।'

আপন আন্তরিক ভাবভরে আমার কণ্ঠরোধ হইল। পৌল একদৃষ্টিতে কতক্ষণ আমার প্রতি চাহিয়া কহিল। 'সে আর নাই! হায় সে আর নাই!' এই হৃদয়বেদনাদায়ী কথার পরই সুদীর্ঘ মূর্চ্ছা উপস্থিত হইল। চেতনা হইলে বলিল, 'আচ্ছা, তবে ত মরণ এক প্রকার শুভ বলিতে হইবে। তবে আমিও যত শীঘ্র পারি মরিয়া বজ্জীনীর কাছে যাইব।' এইরূপে আমার

সান্ত্বনাচেষ্টা বিপরীত ফলে পরিণত হইল, এবং তাহার নৈরাশ্য কেবল বাড়িতে লাগিল। যেমন বন্ধুকে নদীতে নিমগ্ন হইতে দেখিলে তাঁহার সুহৃৎ সাঁতার জানেন না, অথচ উদ্ধার করিতে গিয়া বন্ধুকে আরও বিপদে ফেলেন, আমিও তদ্রূপ হইলাম। হায়! পোল ছেলেমানুষ, কখন দুর্দ্দশা ভোগ করে নাই, লোকে পাঁচ বার সহিয়াই বড় বড় দুঃখ সহ্য করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু পোলের একেবারে সর্ব্বনাশ ঘটিল।

অতঃপর তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিলাম। তখন বিবি দিলাতুর এবং পোলের জননী অত্যন্ত শীর্ণ হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ,মার্গারেট স্বভাবতঃ প্রফুল্লস্বভাব ছিলেন বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে বড় শক্ত আঘাত লাগিয়াছিল, তিনি মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। বাস্তবিকও আমোদী লোকে ক্ষুদ্র দুঃখ অনায়াসে বহন করে বটে, কিন্তু নিদারুণ দুর্দ্দশাতে একেবারে অবসন্ন হয়। তিনি আমাকে কহিলেন, 'মহাশয় গো! কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম যে; বর্জ্জীনী শ্বেত বসন পরিধানপূর্ব্বক পরম রমণীয় একটী উদ্যানে পরিক্রমণ করিতেছে। আমাকে কহিল, 'আমি যে সুখ ভোগ করিতেছি, তাহা সকলের প্রার্থনীয়।' পরে স্মিতমুখে পোলের কাছে গিয়া তাহাকে আকাশে তুলিয়া লইল। আমি আপন পুত্রকে ধরিব এই চেষ্টা করিতে গিয়া তাহাদের সঙ্গেই উঠিতে লাগিলাম। তখন যেন অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব হইল। সখীকে সম্ভাষণ করিবার নিমিত্ত মুখ ফিরাইয়া দেখি যে, তিনি দমিঙ্গ ও মেরীকে সঙ্গে লইয়া পশ্চাৎ

পশ্চাৎ আসিতেছেন। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, সখীও কালি রাত্রে ঠিক এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছেন। আমি কহিলাম ঈশ্বরের ইচ্ছাব্যতীত কোন কিছুই ঘটে না। আর, স্বপ্নের কথাও অনেক স্থলে ফলিয়া যায়।'

বিবি দিলাতুরও আমাকে সেইরূপ স্বপ্নের বিবরণ বলিলেন। এই দুই মহিলা কিছুমাত্র কল্পনাপরতন্ত্র ছিলেন না, তাঁহাদিগের কোন কুসংস্কারে শ্রদ্ধা ছিল না, অতএব উভয়ের স্বপ্নসৌসাদৃশ্য দেখিয়া আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল। মনে মনেও প্রতীতি জন্মিল যে, স্বপ্নের কথা শীঘ্রই ফলিবে। স্বপ্ন যে অনেক স্থলে সত্য হয়, এ প্রত্যয় সর্ব্বজাতির মধ্যেই প্রচলিত আছে। প্রাচীন কালে মহান্ মহান্ পুরুষেরা এ প্রত্যয়ে শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহারা যে কাল্পনিক শঙ্কার পরবশ ছিলেন, ইহা কে বিশ্বাস করিবে? বাইবলেও অনেক স্বপ্ন সত্য হইবার বৃত্তান্ত আছে। আমি নিজেও অনেক স্থলে ভাবী ঘটনা স্বপ্ন দ্বারা প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছি। আর যতই কেন বিচার কর না, এ সকল বিষয় নিতান্ত দুরূহ ও দুর্ব্বোধ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ফলে, যদি আমাদের বুদ্ধি পরম পুরুষের বুদ্ধির ক্ষুদ্র প্রতিবিম্বস্বরূপ হয়, তবে বিশ্বনিয়ন্তা কি গূঢ়রূপে আমাদের বুদ্ধিতে কখন কিছু উদ্বোধ করিতে পারেন না? কত সমুদ্র পার হইয়া, কত সংগ্রামপ্রবৃত্ত দেশ অতিক্রমপূর্ব্বক কোন ব্যক্তির হস্তলিপি তাঁহার বন্ধুর হস্তে উপস্থিত হইয়া আনন্দসঞ্চার করে, ইহা নিত্য দেখিতে পাই। তবে যিনি ধর্ম্মের একমাত্র শরণ্য,

তিনি কি ঈশ্বরপরায়ণ ভক্তদিগের চিত্তখেদনিবারণের নিমিত্ত কোন বিষয় জানাইতে পারেন না? অন্তর্যামী অন্তরেই ভাবোদয় করিয়া সুমতি প্রদান করেন, তবে ভবিষ্যৎ বিষয় বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত বাহ্য উপায় অবলম্বন না করিলে কি তাঁহার চলে না? আর স্বপ্নের কথা এত অলীক মনে করিবার বিষয়ই বা কি? সুখদুঃখাদি ব্যাপারপূর্ণ সংসার স্বপ্ন নয় ত আর কি?

সে যাহা হউক, সখীদিগের স্বপ্ন ফলিতে বড় বিলম্ব হইল না। দুই মাস পরে পোলের মৃত্যু হইল, তখন পর্য্যন্ত তাহার মুখে বর্জ্জীনীর নাম। তাহার জননী ইহার আট দিন পরে প্রাণত্যাগ করিলেন। অন্তকালে ধাম্মিক ব্যক্তির যেরূপ আহ্লাদ হয়, তাঁহারও সেইরূপ দেখা গেল। মৃত্যুশয্যায় বিবি দিলাতুরের নিকট বারম্বার সস্নেহে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন সখি, এইবার যে দেখা হইবে, তাহাতে আর বিচ্ছেদ নাই। আহা, মৃত্যু কি প্রার্থনীয় বস্তু! ইহার মত শুভ আর নাই। জীবন কেবল যন্ত্রণাভোগ মাত্র, ইহা শেষ হইলেই ভাল। যখন পরীক্ষা দিবার নিমিত্তই পৃথিবীতলে আসা, তখন পরীক্ষা যত সংক্ষিপ্ত হয়, ততই সুখের কথা। দমিঙ্গ ও মেরী কর্ম্মের বাহির হইয়া গিয়াছিল। দয়ালু গবর্ণর রাজকোষ হইতে তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন বিধান করিলেন, আর বেচারা গৃহকুক্কুরটী পোলের মৃত্যুর পরেই শোকে মরিয়া গেল।

রামগতি ন্যায়রত্ন।

রামমোহনরায়ের কৃত পুস্তক সকল।

বাঙ্গালাভাষার উন্নতিচিকীর্ষু উল্লিখিত ইংরেজমহোদয়দিগের সমকালেই মহাত্মা রামমোহন রায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহাদ্বারা বাঙ্গালাভাষার অনেক উন্নতি হইয়াছে। ১৬৯৬ শকে (১৭৭৪ খৃঃ অব্দে) হুগলী জিলার অন্তর্গত খানাকুলকৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রাধানগরনামক গ্রামে রামকান্ত রায়ের ঔরসে ইঁহার জন্ম হয়। রামমোহন শৈশবকালে গ্রাম্য গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালায় তৎকালপ্রচলিত রীতি অনুসারে বাঙ্গালাভাষায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি পাটনানগরীতে গমনপূর্ব্বক পারসী ও আরবী অধ্যয়ন করেন। এই ভিন্নদেশীয় ভাষার অনুশীলনকালেই হিন্দুদিগের দেবদেবী প্রভৃতি সমস্তই কাল্পনিক বলিয়া তাঁহার প্রথম উদ্বোধ হয়। তৎপরে তিনি বারাণসীগমনপূর্ব্বক সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিয়া বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করেন। সংস্কৃতশাস্ত্রের প্রগাঢ় অনুশীলনদ্বারা তাঁহার প্রথমোদ্বুদ্ধ হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার প্রতি বিদ্বেষভাব বিচ্ছিন্ন না হইয়া বরং দৃঢ়বদ্ধ হইয়া উঠিল। তদনুসারে তিনি পুরাণপ্রতিপাদ্য হিন্দুধর্ম্ম যাহাতে সকলের মন হইতে অপনীত হয়, এবং "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বচনানুসারে অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনা দেশমধ্যে প্রচারিত হয়, তদর্থ যত্নবান হইলেন, এবং তদুপায়স্বরূপ ১৬ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়েই "হিন্দুগণের পৌত্তলিক ধর্ম্ম-

প্রণালী" নামক একখানি বাঙ্গালাগ্রন্থ রচনা করিলেন। গ্রন্থ-দর্শনে তাঁহার পিতা বড়ই বিরক্ত ও কুপিত হইলেন; তাহাতে রামমোহন দুঃখিত হইয়া পিতৃভবনপরিত্যাগপূর্ব্বক ভারতবর্ষের নানাস্থানের প্রচলিত ধর্ম্মপ্রণালীর অবগতির জন্য অনেকদেশ পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে বৌদ্ধধর্ম্ম উত্তমরূপে শিক্ষা করিবার অভিলাষে তিব্বৎ দেশে গিয়া ৩ বৎসরকাল বাস করিলেন, এবং তথা হইতে পুনর্ব্বার বাটী আসিয়া শাস্ত্রানুশীলন ও "ব্রাহ্মধর্ম্ম" প্রচারের চেষ্টাতেই সতত উদ্যত রহিলেন।

২২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি ইংরেজি শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং ক্রমাগত ৬।৭ বৎসর পরিশ্রম করিয়া ইহাতেও বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়াছিলেন—এরূপ পারদর্শী যে, ইংরাজি ভাষায় অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে অনুশীলন করিয়া ক্রমে ক্রমে হিব্রু, লাটিন, গ্রীক, ফরাসী প্রভৃতি সমুদয়ে ১০ টী প্রধান প্রধান ভাষায় লব্ধাধিকার হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে তিনি রঙ্গপুরের কালেক্টরের নিকট প্রথমে কেরাণীগিরি ও পরে দেওয়ানিপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জনরব এই যে, ঐ স্থানে কর্ম্ম করিয়া তিনি বার্ষিক ১০,০০০ টাকা আয়ের এক জমীদারী ক্রয় করিতে পারিয়াছিলেন। রঙ্গপুর ভিন্ন ভাগলপুর এবং রামগড়েও তিনি কয়েক বৎসর কর্ম্ম করিয়াছিলেন। অনন্তর ১৭৩৬ শকে (১৮১৪ খৃঃ অব্দে) কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ৪০ বৎসর

হইয়াছিল। কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি কেবল শাস্ত্রালোচনা, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারদ্বারা কুসংস্কারাবিষ্ট অজ্ঞানাচ্ছন্ন লোকদিগকে উৎকৃষ্টপথে আনয়ন, এই দুই কার্য্যের চেষ্টাতেই সর্ব্বদা অভিনিবিষ্ট থাকিতেন। এই প্রসঙ্গে দেশীয় বিদেশীয় অনেকানেক পণ্ডিতের সহিত তাঁহাকে সর্ব্বদাই বিচার করিতে হইত। সেই সকল বিচার প্রায় বাচনিক হইত না—লিখিত হইত। এইজন্য তাঁহাকে ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই বেদান্ত উপনিষদ্ প্রভৃতি অনেক শাস্ত্রের অনুবাদ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক গ্রন্থ রচনা করিতে হইয়াছিল। তাঁহার বিপক্ষেরাও 'পাষণ্ডপীড়ন' ও অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করিয়া তাঁহার মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা কেবল তাহা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, এমত নহে—রামমোহন রায়কে ধর্ম্মনাশকারী বলিয়া পথিমধ্যে প্রহার করিবার চেষ্টা করিতেও ক্রটি করেন নাই। ঐ প্রহারের ভয়ে তাঁহাকে সর্ব্বদা রক্ষিবেষ্টিত হইয়া গমনাগমন করিতে হইত। কিন্তু তিনি এসমস্ত অক্ষুব্ধচিত্তে সহ্য করিয়া নিজ উদ্দেশ্যসাধন বিষয়ে ক্ষণমাত্র ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন নাই। যে সকল লোক তাঁহার ঘোরতর বিদ্বেষী হইয়াছিলেন, তাঁহারাও তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ও ক্ষমতার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন। তিনি "ধর্ম্মতলা ইউনিটেরিয়ান্ যন্ত্রালয়" নামক একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে নিজ মতানুসারী গ্রন্থ এবং বিপক্ষদিগের প্রদত্ত দূষণার উত্তর সকল মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

কলিকাতার বর্ত্তমান 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রধানতঃ তাঁহা কর্ত্তৃকই ১৭৫০ শকে (১৮১৮ খৃঃ অব্দে) প্রথম স্থাপিত হয়। ১৭৫১ শকে (১৮২৯ খৃঃ অব্দে) রাজবিধি দ্বারা যে, হিন্দুজাতীয় সতীদিগের মৃতপতির সহিত সহমরণপ্রথা নিবারিত হয়, রামমোহন রায় তদ্বিষয়েও একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। প্রাচীন হিন্দু-সম্প্রদায় রামমোহন রায়ের এই সকল কার্য্যকলাপ সন্দর্শনে মহাদুঃখিত, ভীত ও কুপিত হইলেন, এবং হিন্দুধর্ম্মের সংরক্ষণার্থ "ধর্ম্মসভা" নামে এক সভা সংস্থাপন করিলেন। কিছুকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্ম্মসভায় নানারূপ তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। এক্ষণে সে ধর্ম্মসভা আর জীবিত নাই।

রামমোহন রায় বহুদিন হইতে বিলাত যাইবার জন্য বড়ই অভিলাষী ছিলেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহার সুযোগ হইয়া উঠে নাই। এক্ষণে দিল্লীর বাদসাহ তাঁহার নিজের কোন কার্য্য-সাধনের উদ্দেশে, তাঁহাকে 'রাজা' উপাধি প্রদান পূর্ব্বক বিলাত পাঠাইতে প্রস্তুত হইলেন, তদনুসারে তিনি ১৮৩০ খৃঃ অব্দের ১৫ই নবেম্বরে অপর তিনজন দেশীয় লোক সমভিব্যাহারে লইয়া বিলাতযাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে বোধ হয় কোন হিন্দুই বিলাতগমন করেন নাই। বিলাতে যাইবার সময়ে জাহাজে তিনি কেবল শাস্ত্রানুশীলন, ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়াই পরমানন্দে কালযাপন করিতেন। ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলে তত্রত্য প্রধান প্রধান লোকেরা তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্মানুরাগ ও বাক্‌পটুতা প্রভৃতির আধিক্য দেখিয়া তাঁহার পরম

সমাদর ও মহাসম্ভ্রম করিয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ডে কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়াই ফ্রান্সে গমন করেন এবং তথা হইতেই রুগ্ন হইয়া পুনর্ব্বার ইংলণ্ডে যান, এবং সেই স্থানেই ১৮৩৩ খৃঃ অব্দের ২৭ শে সেপ্টেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৬০ বৎসর হইয়াছিল। ব্রিষ্টল নগরের সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার শব সমাহিত হইয়াছে।

শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

রামের রাজ্যাভিষেক।

রাম ও পরশুরামের সাক্ষাৎকার।

এদিকে হরচাপভঙ্গবার্ত্তাশ্রবণে, রোষরসে কলুষিত হইয়া ভগবান ভৃগুনন্দন, রামের অযোধ্যাগমনপথ অবরোধপূর্ব্বক, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অহো! দুরাত্মা ক্ষত্রিয়শিশুর কি প্রগল্‌ভতা! যিনি ত্রিভুবনের অধীশ্বর, আমি যাঁহার প্রিয়শিষ্য, সেই ত্রিপুরবিজয়ী দেবদেব মহাদেবের শরাসন স্পর্শ করিতেও ভূমণ্ডলে কেহ সাহসী হয় না, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! দুরাশয় দশরথপুত্র অশংসয়িতচিত্তে সেই হরধনু ভগ্ন করিল। দুর্ব্বিনীত দশরথতনয়ের কি দুঃসাহস! যাহার ভুজবলপ্রভাবে রণপণ্ডিত ক্ষত্রিয়গণ কৃতান্তের করালকবলে নিপতিত হইয়াছে, এবং যুদ্ধবার্ত্তা একবারে তিরোহিত হওয়াতে ধরিত্রী অপূর্ব্ব শান্তিসুখ লাভ করিতেছে, সেইব্যক্তি ত্রিপুরান্তকারীর প্রিয়শিষ্য হইয়া যে, গুরুর ঈদৃশ অভিনব অবমাননা অবলোকন করিয়া, কাপুরুষের ন্যায় উদাসীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিবে, ইহা কথনই সম্ভব নহে। আমি যে মুহূর্ত্তে হরশরাসনভঙ্গবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াছি, সেই মুহূর্ত্তেই আমার হৃদয়ে ক্রোধাগ্নি পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে দুর্ব্বৃত্ত রামকে সমুচিত শাস্তিপ্রদান করিয়া ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাণ করিব।

এইরূপ স্থির করিয়া ভৃগুনন্দন রোষভরে কুঠার ভুজদণ্ড বারংবার কম্পিত করিয়া, গর্ব্বিতবচনে উচ্চৈঃস্বরে সৈনিকগণকে কহিতে লাগিলেন, "ওরে সৈনিকগণ! তোদের রাজার পুত্র রামকে সংবাদ দে, যে ব্যক্তি একবিংশতিবার ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়ের শোণিতস্রোতে পিতৃলোকের তর্পণ ক্রিয়া সমাপন করিয়া, ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাণ করিয়াছে, যাহার খরধার কুঠার ভুজ-সহস্রসম্পন্ন অর্জ্জুনের রুধিরপানে পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, অদ্য সেই পরশুরামের করাল কুঠার তব্ তু রামের শোণিতপানে লোলুপ হইয়াছে। অতএব কোথায় সেই নরাধম, শীঘ্র আমাকে দেখাইয়া দে।"

সাগরের ন্যায় গম্ভীরপ্রকৃতি, মতিমান রামচন্দ্র দূর হইতে ভৃগুনন্দনকে রোষান্ধচিত্ত দেখিয়া, কিছুমাত্র বিকলচিত্ত হইলেন না; বরং সহর্ষে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যিনি সমরক্ষেত্রে দুর্দম হৈহয়পতিকে সংহার করিয়া জয়শ্রী লাভ করিয়াছেন, যাঁহার নিকট অজেয় সেনানীও সম্মুখসংগ্রামে পরাভূত হইয়াছিলেন, অদ্য সৌভাগ্যক্রমে সেই অসামান্যপ্রতাপশালী ত্রিভুবন-বিজয়ী ভগবান্ ভৃগুনন্দনকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাইলাম। আহা! কি মুনি-বীর-ব্রতাচারী প্রশান্ত গম্ভীর কলেবর!! দেখিলেই বোধ হয়, যেন ইনি সাক্ষাৎ তেজোরাশি, মূর্ত্তিমান তপঃপ্রভাব, এবং প্রচণ্ড বীররসের আশ্রয়। ইঁহার মস্তকে আপিঙ্গল জটাজাল, পৃষ্ঠদেশে তূণীর, বামহস্তে ধনু, দক্ষিণকরে কুঠার, প্রকোষ্ঠে রৌদ্রাক্ষবলয়, স্কন্ধদেশে এণচর্ম্ম, বক্ষঃস্থলে অক্ষসূত্র,

গলদেশে যজ্ঞোপবীত এবং কটিদেশে বল্কলবাস। বস্তুতঃ এরূপ সুন্দর অথচ ভয়ঙ্কর আকৃতি ত কখন নয়নগোচর হয় নাই। যাহা হউক, ইনি যখন ব্রাহ্মণ-স্বভাবসুলভ রোষপরবশ হইয়া, আমাকে অন্বেষণ করিতেছেন, তখন আর অধিক বিলম্ব না করিয়া স্বয়ংই ইহাঁর নিকটে গমন করা যাউক। এইরূপ বিবেচনা করিয়া, তিনি সসম্ভ্রমে রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং জামদগ্ন্যসমীপে উপস্থিত হইয়া, নতশিরে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।

ভৃগুনন্দন, প্রিয়দর্শন রামচন্দ্রকে অবলোকন করিয়া, স্মিতমুখে সভ্রূভঙ্গে কহিলেন, পূর্ব্বে ইহার যেরূপ গুণানুবাদের কথা শুনিয়াছিলাম, ইহার আকার প্রকারও দেখিতেছি সেইরূপ। শরীর যেমন সামর্থ্যসারময়, তেমনি রমণীয়; কিন্তু এই দুষ্টকৃত অবমাননা স্মৃতিপথারূঢ় হইলে, আমার অন্তঃকরণে অনিবার্য্য ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হয়, কিছুতেই চিত্তের স্থৈর্য্য থাকে না। যাহা হউক, অদ্য দুরাত্মার শৌর্য্যসীমা স্বচক্ষে অবলোকন করা যাইবে।

মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভৃগুনন্দন রোষপরুষবাক্যে রামকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, "রে ক্ষত্রিয়শিশু! তুই সামান্য মৃগশিশু হইয়া, কিরূপে কেশরীর কেশাকর্ষণে উদ্যত হইয়াছিস্! যে চন্দ্রশেখরের শরাসন আকর্ষণ করিতে সুরাসুরমধ্যে কেহই সাহসী হয় না, তুই সামান্য ক্ষত্রিয়শিশু হইয়া সেই হরধনু ভগ্ন করিলি! অতএব তোর এ অপরাধ কখনই

উপেক্ষণীয় নহে। এক্ষণে তুই আমার ক্ষত্রিয়কুলসংহারকারী কোপানলে অচিরে পতঙ্গবৃত্তি প্রাপ্ত হইবি। যদি সামর্থ্য থাকে, প্রতিবিধানের চেষ্টা কর।”

পরশুরামের ঈদৃশ দর্পোদ্ধত বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাম প্রশান্ত-গম্ভীরস্বরে বিনয় করিয়া কহিলেন, “ভগবন্! আমি আর্য্য বিশ্বামিত্রের নিদেশানুবর্ত্তী হইয়া, রাজর্ষি জনকের প্রতিজ্ঞাপাশ-চ্ছেদনমানসে, বৈদেহীর পরিণয়-পরিপন্থী হরকার্ম্মুক ভগ্ন করিয়াছি। ত্রিপুরান্তকারী বা কার্ত্তবীর্য্যজেতার অবমাননা করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। অতএব আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।”

জামদগ্ন্য, রামমুখনিঃসৃত পৌরুষগর্ব্ব বিনয়বাক্যশ্রবণে উচ্চৈহাস্য করিয়া কহিলেন, “ওরে রণভীরু! যে ব্যক্তি বারংবার ধরিত্রীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াও তৃপ্তিলাভ করে নাই, অদ্য যে তাহার কোপশান্তি হইবে, কখনই সম্ভব নহে। তুই যখন বীরমদে প্রমত্ত হইয়া অপথে পদার্পণ করিয়াছিস, তখন তোকে অবশ্যই উহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। অদ্য আমি এই পরশুদ্বারা তোর শিরশ্ছেদন করিব।”

যেমন নির্ব্বাত স্থির জলাশয়ে শিলাখণ্ড নিক্ষিপ্ত হইলে উহার জল চঞ্চল হইয়া উঠে, তদ্রূপ পরশুরামের এবম্ভূত আত্মশ্লাঘা-মিশ্রিত পরুষবাক্যে, রামের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি ভৃগুনন্দনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘ভার্গব! বারংবার আপনার এরূপ বাগ্‌বিভীষিকায় আমার চিত্ত অতিমাত্র ব্যথিত হইতেছে। আপনি শ্রেষ্ঠবর্ণসম্ভূত ব্রাহ্মণ, জাতিতে পূজ্য। আমি দ্বিতীয়বর্ণজাত ক্ষত্রিয়। আপনার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া মাদৃশ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।’

ভৃগুনন্দন, রামবাক্য শেষ না হইতে হইতেই, অধিকতর রোষ প্রকাশ পূর্ব্বক, কম্পিতকলেবর হইয়া কহিলেন, “ওরে

মূঢ়! আমি কি কেবল জাতিতেই পূজ্য, আর কিছুতেই নহি। আঃ পাপ! জীর্ণ হরধনু ভাঙ্গিয়া তোর এরূপ বিসদৃশ অহঙ্কার বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। রে মূঢ়! সম্মুখে কালের করাল কবল দেখিয়াও কি দেখিতেছিস না। এই মুহূর্ত্তেই তোর দর্প খর্ব্ব করিতেছি; তুই অস্ত্রগ্রহণ কর। অথবা অস্ত্রগ্রহণের আবশ্যকতা নাই। তোর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, লোকে আমার অপযশ ঘোষণা করিবে। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তুই যদি আমার এই ধনুকে মৌর্ব্বীযোজনা করিতে পারিস, তাহা হইলে আমি ত্বৎকৃত যাবতীয় অপরাধ মার্জ্জনা করিব। নতুবা আমার এই কুঠার তোর গলদেশ দ্বিখণ্ড করিবে।”

পরশুরামের ঈদৃশ শ্রবণকটু বচনবিন্যাস শ্রবণে, রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র, পাদদলিত ভুজঙ্গের ন্যায়, তিরস্কৃত মাতঙ্গের ন্যায়, মেঘান্তরিত পতঙ্গের ন্যায়, প্রবল রোষপ্রকাশ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে বামকরে ভার্গবধনু গ্রহণ করিয়া, উহাতে [illegible] পূর্ব্বক, যোজনা করিলেন। অনন্তর অধিজ্যশরাসনে শরসন্ধান [illegible]ত গুণভার্গবের স্বর্গগমনপথ অবরোধ করিলেন। জা[illegible] করিয়া, তাঁর দর্প একেবারে খর্ব্ব হইল। চতুর্দ্দিক [illegible] রামজয়’শব্দে কোলাহল করিতে [illegible] হইতে সৈনিকগণ যৎপরোনাস্তি অপমানিত [illegible] লাগিল। জামদগ্ন্য নবপরাভবে [illegible] প্রস্থান করিলেন [illegible] হইয়া, লজ্জাবনতমুখে তথা হইতে